

প্রথম সংস্করণ
কবিপক্ষ—১৩৬৩

প্রকাশক :
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

শ্রদ্ধেয়া কনক মুখোপাধ্যায়কে

ভূমিকা

শ্রীমতী অনুশীলা দাশগুপ্ত তাঁর এই প্রবন্ধ সংগ্রহে আমাকে একটি ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করেছেন। একাজে বরাবরই আমি বেশ একটু কুণ্ঠা বোধ করি। আমার ধারণা, রচনা নিজেই তার পরিচয় বহন করে। মননশীল পাঠক পাঠিকা তার অন্তর্লোকে প্রবেশ করলে নিজেরাই সে পরিচিতির সন্ধান পান। আলো ফেলে তার গুণপণা ব্যাখ্যা করতে হয় না। সেই বিখ্যাত বিদেশী প্রবচনের দোহাই দিয়ে বলতে পারি, চেনা পানীয়কে তার গাছ দেখিয়ে গ্রহণীয় করতে হয় না। তথাপি একাজে অগ্রসর হলাম, তার একমাত্র কারণ, বয়সে ও সাহিত্যকর্মে আমি শ্রীমতী অনুশীলার অগ্রজ। অনুজা যখন সহযাত্রীরূপে চলতি পথে এসে আমার সঙ্গ ধরেছেন, তখন তাঁর দিকে আমি কি সাগ্রহ মনোযোগ না দিয়ে পারি? বাহুল্য বুঝেও তাই আমি দু'কথা লেখার জন্যে কলম ধরেছি। লেখিকার স্বীকৃতি ও সম্মান তাঁর জন্যে যখন ইতিহাসের পাকা দলিলে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন আজকের এই সৌহার্দ্যের ক্ষুদ্র ঘটনাটি হয়ত তাঁর স্মৃতিতে মধুর হয়ে বেঁচে থাকবে।

নবীন লেখক লেখিকারা সাহিত্য সাধনার সূচনায় সাধারণত কবিতা ও গল্প লেখাতেই হাত মক্স করেন। স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে একটু সময় লাগে। তার আগেই তৈরি হতে হয় এবং সেজন্যে ধুনি জ্বালিয়ে রাখার প্রয়াস হিসাবে এটাই প্রশস্ত। নিশ্চয় এই বইয়ের লেখিকা শ্রীমতী অনুশীলা দাশগুপ্তও তাই করেছেন। কারণ তাঁর এই প্রবন্ধ সংগ্রহের কোথাও নবীন অধ্যবসায়ীর অপটু হাত চোখে পড়ল না। বরং প্রাজ্ঞ ও পরিণতমনা এক বিদগ্ধ প্রাবন্ধিকের সঙ্গেই বার বার পরিচয় হল রচনাগুলির ছত্রে ছত্রে। রাজনীতি সমাজশিক্ষা সাহিত্য শিল্পকলা, কত দিকে না চোখ দিয়েছেন তিনি এবং তাঁর দৃষ্টি শুধু বিষয়ের চৌহদ্দিতেই সীমিত থাকে নি। তিনি সর্বত্র যথাসম্ভব গভীরে প্রবেশ করেছেন এবং যা শ্রেয় বা সুষ্ঠু বলে মনে করেছেন, তা অসংকোচে ও অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যক্ত করেছেন। ইংগিতে বা সংকেতে কোন কথা বলা বা জটিলতার জায়গায় পাশ কাটান তাঁর অভ্যাস নয়। এই স্বচ্ছন্দ ঋজুতাই প্রবন্ধের প্রধান গুণ এবং এ গুণ শ্রীমতী অনুশীলা এত কম বয়সে আয়ত্তে এনেছেন, এজন্যে তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

প্রবন্ধ অভিধাটি আজ যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, অতীতে তার গণ্ডী অতটা সীমিত ছিল না। তখন ওতে বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য কর্ম ছাড়াও আরো অনেক কিছু বোঝাত। পঞ্চতন্ত্রে আছে, ফলিতং তাবৎ অস্মাকম কপট প্রবন্ধ। এখানে প্রবন্ধ হল মতলব। ভোজ প্রবন্ধ পুস্তকে ভোজের কাহিনীই প্রবন্ধ নামে অভিহিত হয়েছে। কাশীরাম লিখেছেন, পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস। এখানে প্রবন্ধ হয়েছে গানের প্রতিশব্দ। মোটের উপর বাংলা ভাষায় ওটা ইংরেজী এসের প্রতিশব্দ রূপেই উনিশ শতক থেকে চলছে। অক্ষয় কুমার দত্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু দিয়ে যাত্রা শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্রে এসে আমাদের প্রবন্ধ সাহিত্য একই সংগে ঐশ্বর্যবান ও দ্যুতিমান হয়েছে। বঙ্কিম সহযাত্রীদের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয় চন্দ্র সরকার, বহু কুশলী প্রাবন্ধিক ওঠেন। তারপর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। সাম্প্রতিককালে একান্তভাবে প্রবন্ধ রচয়িতা হিসাবে গণনীয় নাম বিশেষ চোখে পড়ে না, এক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নারায়ণ চৌধুরী ছাড়া। তবে অন্নদাশংকর রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বুদ্ধদেব বসু অন্যান্য সাহিত্যকর্মের সঙ্গেই কিছু সংখ্যক উল্লেখনী প্রবন্ধ লিখেছেন।

পূর্বগামীদের এই নাতিবৃহৎ মিছিলে সর্বকনিষ্ঠ সদস্যা হিসাবে যুক্ত হলেন আজ শ্রীমতী অনুশীলা। তাঁর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখে যাবার সুযোগ হবে না হয়ত আমার। কিন্তু অরুণোদয় মুহূর্তেই আজ যে সম্ভাব্যতার নিদর্শন পেলাম এই প্রবন্ধমালার মধ্যে, তা যথেষ্ট পরিণতির স্বাক্ষর বহন করে। আগেই বলেছি, সমাজ, সংস্কৃতি সাহিত্য, শিল্প, কলাকৃষ্টির বিচিত্র বিভাগে বিচরণ করেছেন তিনি। সর্বত্র তাঁর দৃষ্টি সমান সজাগ, লেখনী সমান সচল। সবগুলি লেখাই সানন্দে পড়েছি। তবু বিশেষভাবে নারীদের সমস্যা নিয়ে লেখাগুলি বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে। দেশে প্রবন্ধ লেখকের সংখ্যাই আজ কম। তার মধ্যে মহিলা প্রাবন্ধিক প্রায় নেই বললেই হয়। সেই শূন্যতা পূর্ণ করে সার্থক হবেন শ্রীমতী অনুশীলা, এই আশা নিয়েই বক্তব্য শেষ করছি।

লেখকের কথা

সুদীর্ঘকাল ধরে প্রকৃত সাহিত্য বা সংস্কৃতি কি তা নিয়ে অনেক লেখালেখি, বিতর্ক, সভা সমাবেশ হয়েছে, নারীর জীবনের সমস্যা-যন্ত্রণার দিক-গুলোর রকমফের হলেও, চিন্তা ভাবনাগত পার্থক্য থাকলেও বিষয়টি যুগ যুগ ধরে, বহু আলোচিত বহু বিতর্কিত। জনসংখ্যার অর্দ্ধেক সংখ্যক হল নারীজাতি, নারীর জীবনের সমস্যাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ করা সম্ভব নয় কিছুতেই, বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ অর্ধ্যে দাঁড়িয়ে আজ আধা-সামন্তবাদী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোতে মানুষ জীবন যন্ত্রণায় অনেক সময়ই দিশেহারা, নারী জাতি পুরুষের সমান মর্যাদা থেকে বঞ্চিত, পরিবারে, সমাজে, দেশে লাঞ্ছিত। স্বভাবতই সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে উক্ত অশুভ দিকগুলির প্রতিফলন ঘটে। অপসংস্কৃতির কালো ছায়া সমাজকে ঘিরে ধরতে উদ্যত। সমাজকে, দেশকে এই অশুভ শক্তির হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রামী আদর্শে বিশ্বাসী, রাজনৈতিক সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ, সুস্থ চিন্তাশক্তিসম্পন্ন একদল কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সংস্কৃতি কর্মীরা এগিয়ে এলেন, সুস্থ-সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্ভার জনগণের সামনে মেলে ধরা ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। এই প্রগতি শিবিরের আঙিনাতলে দাঁড়িয়ে সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে এবং সাহিত্য সংস্কৃতির আলোকে নারী জীবনের সমস্যাকে যেটুকু উপলব্ধি করেছি সেটুকুই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি 'সাহিত্য-সংস্কৃতি ও নারী সমাজ' নামক প্রবন্ধ সংকলনে।

২৬টি প্রবন্ধ সম্বলিত পুস্তকখানির অধিকাংশ প্রবন্ধগুলোই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে, উক্ত ২৬টি প্রবন্ধের সময়সীমা হলো প্রায় দশ বৎসর। লিখতে আরম্ভ করার প্রায় শুরু থেকেই বলা চলে যিনি উৎসাহ, প্রেরণা দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন কখনও কখনও সম্পাদনাও করেছেন তিনি হলেন সাহিত্যিক, কবি, সমালোচক, সম্পাদিকা (একসাথে) ও দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের নেত্রী শ্রদ্ধেয়া কনক মুখোপাধ্যায়। যাঁর কাছে হাতে খড়ি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা ধন্যবাদ জানানোর মতো আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রদ্ধেয় শ্রীনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত পুস্তকটির ভূমিকা লিখে দেওয়ায় আমি ধন্য হয়েছি এবং আন্তরিকভাবে খুশি হয়েছি।

বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে সঠিক অভিমত প্রকাশে, পরামর্শদানে ও আরও নানাভাবে এ কাজে সহায়তা করেছেন অগ্রজপ্রতীম সাহিত্যিক শ্রীঅনুনয় চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার সহকর্মী বন্ধু গবেষক সাহিত্যিক শ্রীদিব্যজ্যোতি মজুমদার বিষয় নির্বাচন ছাড়াও বহুভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর এই আন্তরিক সক্রিয় সহযোগিতা প্রকৃতই অভিনন্দনযোগ্য।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আবৃত্তিকার শ্রীদীপঙ্কর মজুমদার লেখাগুলোর পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য সর্বপ্রথম আমাকে উৎসাহ দেন। তাঁকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্বল্প সময়ের মধ্যে আগ্রহভরে পুস্তকটি প্রকাশ করার জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্থির প্রত্যয়, অল্পদিনের অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনকে সম্বল করেই এই কাজে প্রয়াসী হয়েছি, সাধারণ পাঠকবর্গ যদি সামান্যমাত্রও উপকৃত হন—তাহলেই নিজেকে ধন্য মনে করব।

সূচীপত্র

* প্রাচীন লোকসাহিত্যের আলোকে নারীর সামাজিক অবস্থান ... ৯
* প্রবাদে নারী ... ১৮
* রূপকথা : শিশুসাহিত্য অথবা কথাসাহিত্য ... ২৫
* প্রাচীন লোকসাহিত্যের আঙিনায় শিশু বিষয়ক ছড়া .. ২৯
* শিল্প-সংস্কৃতি ও রাজনীতি ... ৩৪
* সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিক সংস্কৃতি কর্মীদের ভূমিকা ... ৪১
* অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে মহিলাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা ... ৪৫
* শিল্প-সংস্কৃতি ও তরুণ সম্প্রদায় ... ৫১
* আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে শ্রেণী-চেতনা ... ৫৯
* সাম্প্রতিক গল্প-কাহিনীর গতি-প্রকৃতি ... ৬৬
* কর্মময় জীবনে কাব্য ও সঙ্গীত ... ৭৪
* প্রগতি সাহিত্যের আঙিনায় মহিলা লেখকদের ভূমিকা ... ৮৩
* জাতীয় সংহতির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ ... ৯৪
* ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ... ৯৯
* রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে নারীচরিত্র ... ১০৭
* শরৎ সাহিত্যে মুক্তি ও অনুভূতি ... ১১৪
* মানুষ নজরুল ... ১১৮
* কবি, গীতিকার ও সুরকার নজরুল ... ১২২
* বর্তমান সমাজ কাঠামোতে নারীর অবস্থান ... ১২৯
* শিশুশিক্ষা ও মধ্যবিত্ত ঘরের মায়েরা ... ১৩৫
* ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নারীর ভূমিকা ... ১৪১
* আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারীদিবস প্রসঙ্গে ... ১৪৬
* জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে নারীসমাজ ... ১৫০
* পণপ্রথা ... ১৬০
* বাংলা সাহিত্যে নারীর স্বরূপ ... ১৬৭
* নারীর সামাজিক অবস্থান : শোষণ-নিপীড়নের নানা কৌশল ... ১৮০

প্রাচীন লোকসাহিত্যের আলোকে নারীর সামাজিক অবস্থান

মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর জীবনের শোষণ-নিপীড়ন, বঞ্চনা, অন্তর্জ্বালা সমস্ত কিছুই প্রাচীন লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ছড়া, সঙ্গীত, প্রবাদ-প্রবচন, আঞ্চলিক উৎসবাদির মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। পরিবারে নারীর অস্তিত্বের মানবিক মূল্য সমকালীন সমাজে নারীর মর্যাদা যে কত ঠুনকো ছিল তার নিখুঁত চিত্র মেলে প্রাচীন লোকসাহিত্যের মধ্যে। নারীকে দুঃসহ অমর্যাদা-পূর্ণ ও ব্যক্তিত্বহীন অবস্থায় যাবজ্জীবন কিভাবে সংসারের ঘানি টেনে চলতে হয়েছে যুগ যুগ ধরে, তারই সহজ সরল অভিব্যক্তি ঘটেছে লোকসাহিত্যের মধ্যে। যে নারী-জীবনকে মানবিক মূল্যবোধে ভাবা হয়নি, অবলা নারী বলে অনুকম্পা করা হয়েছে সৌজন্য রক্ষার্থে, সেই নারীকেই সকলের মনোরঞ্জনার্থে সেবিকা অথবা দাসীরূপে জীবন উৎসর্গ করতে হয়েছে; শিশুকাল থেকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার কোন কিছুতেই অধিকার নেই, পছন্দ-অপছন্দের মূল্য নেই, পুরুষের তুলনায় সে নির্বোধ। পিতা-ভ্রাতা, স্বামী-শ্বশুর, ভাসুর, আত্মীয়-পরিজন—এদের সেবা করা, দাসীর মত জীবনযাপন করার মধ্যেই নারীজীবনের একমাত্র সার্থকতা ও পুণ্যিলাভ।

সমাজের অনুশাসনে মেয়ে-জন্ম তো পিতৃগৃহের ভারবোঝা। যেমন মেয়ের ওপরে মা-বাবার প্রকৃতপক্ষে কোন অধিকার নেই, তেমনি মেয়েরও শৈশব অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে পতিগৃহে যেতে না পারলে সমাজচ্যুতির নিশ্চিত সম্ভাবনা। শিশু কন্যার বুদ্ধি হ'বার পর থেকেই মায়ের মনে এক বিরাট আতঙ্ক, তথাপি এটা যত কঠিন হোক মেনে নিতেই হবে। কন্যার তো শ্বশুর বাড়িতেই প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। সব কিছু জেনে বুঝেও মা কান্নাকাটি করেন, শিশুকন্যাও অপারগ হয়ে অসহায়ের মতো মাকে বোঝায়,—

"মা বড় নির্বুদ্ধি কেঁদে কেন মর
আপনি ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর"॥

মেয়েকে কত সুখে শান্তিতে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো যায় তার জন্য মাতৃহৃদয়ের কত জল্পনা-কল্পনা, শাশুড়ির কাছেও যাতে মেয়েকে গঞ্জনা শুনতে না হয় তার জন্যও কত প্রাণান্ত চেষ্টা,—

"আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায়-ছায়ায় যেতে।
চার মিন্‌সে কাহার দেব পাল্কি বহাতে॥
সরুধানের চিঁড়ে দেব পথে জল খেতে।
চার মাগি দাসী দেবো পায়ে তেল দিতে॥
উড়কি ধানের মুড়কি দেব শাশুড়ি ভুলাতে॥

উক্ত ছড়াটির মধ্যে দিয়ে সমাজের যৌতুক প্রথা, দাসত্ব প্রথা, শাশুড়ী-আতঙ্ক সব কিছুই জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। শাশুড়ী-পুত্রবধূর সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা, স্নেহ-মমতার যেন লেশমাত্র চিহ্ন নেই, শুধুমাত্র কর্তব্য-অকর্তব্য বা লাভ-ক্ষতির পাল্লা কষা চলছে অনবরত, শ্বশুরালয়ে পুত্রবধূর প্রধান আতঙ্কের বস্তু শাশুড়ী, এই নিষ্ঠুর সমাজে একজন নারীর ভয়ের বস্তু একজন নারী, আজ যিনি পুত্রবধূ কাল তো তিনিই শাশুড়ী। পচা-গলা অবক্ষয়িত সমাজ ব্যবস্থায় নিয়মের চাকা তো এমনভাবেই ঘুরে চলেছে যুগ যুগ ধরে, যেন উন্নততর কিছু ভাববারই অবকাশ নেই। অপর দিকে মা তার মেয়ের সুখের কথা ভেবে তাকে দেখাশুনো করবার জন্য যে মহিলাদের সঙ্গে দিচ্ছেন তাদের 'মাগি' 'দাসী' বলে অভিহিত করছেন, যেন তাদের জন্মই হয়েছে ধনীর দুলালীর দাসত্ব বৃত্তির জন্য। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শোষিতশ্রেণী ও নারীর কি মূল্য ছিল উপরোক্ত ছোট ছড়াটিতেই একেবারে পরিষ্কার।

শৈশব অবস্থাতেই শিশু কন্যাটি জানে, তাকে অদূর ভবিষ্যতেই পতিগৃহ নামক জেলখানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে। পরের ছেলে বীরের মত আসবে লোকজন, পাইকপেয়াদা, বাজনদার সহ পরের মেয়েকে 'বিবাহিত স্ত্রী' বলে গ্রহণ করতে অথচ যার পেছনে লুকায়িত থাকে এক নিষ্ঠুর সত্য—তা হ'ল মেয়েটিকে চিরকালের জন্য দাসী করে নিয়ে যাওয়ার মত এক বিশ্রী মানসিকতা। শিশু-কন্যাটি বিবাহের পূর্বমুহূর্তে বর সহ বরযাত্রীর আগমনী ধ্বনিতে আতঙ্কিত, ভীত, সন্ত্রস্ত; আর সেই সঙ্গে তার কি আকুল আর্তি,—

"ঢোল বাজে গামুর গুমুর সানাই বাজে রইয়া,
পরার পুত নিতে আইছে ঢোল বাড়ি দিয়া
আয়লো খেলার সই, খেলার সাজু লইয়া
আর তো খেলুম না পরের ঘরে গিয়া"

কাশ্মীরী লোকসঙ্গীতের মধ্যেও কন্যা বিদায়ের বেদনা বড়ই মর্মস্পর্শী,

দুয়ারে পাল্কি এসেছে কনেকে পতিগৃহে নিয়ে যাবার জন্যে, পিতৃগৃহের আত্মীয়-পরিজন, প্রতিবেশী, মা-মাসীরা আশীর্বাদ করে বেদনার্ত কণ্ঠে বলেন,

ও কন্যে ছিলে তুমি এতকাল
আমার ঘরের কর্ত্রী,
মায়ের ভালবাসা তুমি, যাচ্ছ নিজের
বাড়ি সত্যি—
বারো বছর ধরে দিলাম তোমায়
কতো দান,
এখন বুঝেছি ছিলে আমার অতিথি সমান,
বাপের ঘরের চাবিটা দাও
মায়ের হাতে তুলে
কোথায় কে যে ডাকলো তোমায়
মোদের যাবে ভুলে।"

পৃথিবীর সর্বত্রই সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থায় চিন্তাধারা একই থাকে, স্বাভাবিকভাবেই নারী শোষণ-বঞ্চনার শিকার। রাশিয়ার প্রাচীন লোকসঙ্গীতেও দেখা যায় পতিগৃহ বালিকা বধূর নিকট অত্যন্ত নিষ্প্রাণ বলে মনে হত, যেমন শিশুকন্যা বিবাহের পূর্ব মুহূর্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলছে,—

"বসে থাকার আরাম আর চলবে না
গালগল্পের শেষ হল
কাজের সময় এলো
সর্বক্ষণ যে গেল।"

স্নেহের আঙিনা ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবে কনের কি করুণ অবস্থা! অতি-পরিচিত খেলার সাথীদের ফেলে শ্বশুরবাড়ি নামক এক বিভীষিকাময় আস্তানায় গিয়ে উঠতে হবে যাবজ্জীবনের জন্যে; কনে সেই আশঙ্কায় আতঙ্কিত।

তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কন্যার উপযুক্ততা অনুযায়ী পাত্রপক্ষ থেকে টাকা দাবী করতেন, অর্থের লালসায় নাবালিকা কন্যাকে বহু দূরে পাঠাতেও দ্বিধা করতেন না। অসহায় কন্যার বুকফাটা ক্রন্দন মানুষ মাত্রেরই মনে নাড়া দিতে বাধ্য, যেমন,

"এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে,
এখন কেন কাঁদ বাবা গামছা মুখে দিয়ে,

আমরা যাব পরের ঘরে পর অধীন হয়ে,
পরের বেটী মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে,
দুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা দিয়ে।

পরের বেটী বলতে এখানে শাশুড়ীকেই বলা হচ্ছে, নববধূর কাছে শাশুড়ী যেন এক ভয়াবহ জীব। স্বামী সেও যেন তার নিজের নয়—কাজে কর্মে সামান্য ত্রুটি হলেই ভয় পাচ্ছে, 'পরের বেটায় মারবে চড় / ঘুর‍্যা ঘুর‍্যা কাম কর।' শ্বশুর-ভাসুর, স্বামী-শাশুড়ী সকলেই যেন হাঁ করে আছেন নতুন বধূ নামক দাসীটি তাদের সুখে রাখবার জন্য জীবন উৎসর্গ করবে। তাকে শোষণ করে নিংড়ে নেওয়া, শাশুড়ীও পদাধিকার বলে সুদে-আসলে তুলে নিতে চান। সখ-আহ্লাদ্ দূরে থাকুক, বধূটির ক্ষুধা-তৃষ্ণার দিকেও যেন কারুর নজর নেই, আর তার তো দাসত্ব ছাড়া কোন কিছুতেই অধিকার নেই, এমনি এক দুঃসহ জীবনপাত সে করে চলে দিনের পর দিন, তারই একটা চিত্র ছড়ায় ফুটে উঠেছে,—

"একখান চিড়া মুখে দিলাম শাশুড়ী মাইল ঠোকা,
ঘরের পাছে কানতে গেলাম ভাউরে মাইল চাক্কা।"

নববধূর জীবনের এক গভীর বেদনা ও বঞ্চনার ছবি ছড়াটিতে প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

শ্বশুর বাড়ির অত্যাচারে শোষণে-নিপীড়নে বালিকা বধূর মন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, পিতৃগৃহের স্নেহ-ভালবাসা বিজড়িত গাছপালা, বাগান, পুকুরঘাট—সব কিছুর জন্যই তার মন কেমন করে। ফেলে-আসা অপিরিচিত স্নেহ-ভালবাসার আঙিনায় অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য ফিরে যেতে মন উতলা হয়ে উঠে। ছড়ায় তার একটা স্পষ্ট রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে :

"ও পাড়েতে কালো রঙ, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্,
এ পাড়েতে লংকা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে,
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে,
এ মাসটা থাক দিদি, কেঁদে ককিয়ে,
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্কি সাজিয়ে
হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।"

বাঙালী নারীর দুঃখ বেদনার্ত গার্হস্থ্য জীবনের অন্তর্বেদনা ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দরদী ও অন্তস্পর্শী অভিব্যক্তি স্মরণযোগ্য—"এই

অন্তর্ব্যথা, এই রুদ্ধ সঞ্চিত অশ্রুজলোচ্ছ্বাস কোন কালে কোন গোপন গৃহকোণ হইতে কোন অজ্ঞাত অখ্যাত বিস্মৃত নববধূর কোমল হৃদয়খানি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছিল—এখন সেই স্নেহ স্মৃতিহীন সুখহীন পরের ঘরে হঠাৎ একদিন তাহার পিতৃগৃহের চিরপরিচিত ব্যথার ব্যথী ভাই আপন ভগিনীটির তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে—হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চিত নিগূঢ় অশ্রুরাশি সেদিন আর কি বাধা মানিতে পারে।" অন্যত্র তিনি বলেছেন, "আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো, অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়। সেই জন্য বাঙ্গালী কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে।"

শোষণ-বঞ্চনার বলি হয়ে নারীর তো সব সময়ই মনের মধ্যে হারাবার ভয়, আর সেই হারাবার ভীতি স্বামী, পুত্র, ভ্রাতাকে কেন্দ্র করে, আর তার চূড়ান্ত পরিণতির বিষোদগার হয় পুত্রবধূর ওপরে। সেতো পরের মেয়ে, পুত্র তো মায়ের এবং সেই সঙ্গে নিজেরও দাসী করেই এনেছে, তাই সব সময় তীক্ষ্ণ নজর পুত্রের যেন পুত্রবধূর জন্যে মন না গলে। ক্রমশই শাশুড়ী-বধূর সম্পর্কের মধ্যে একটা শত্রুতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে। আজকের পুত্রবধূ যখন অত্যাচার অবিচারের বলি হয় তখনই সে দিন গুণতে থাকে তার 'শাশুড়ী' নামক পদমর্যাদা বৃদ্ধি কবে হবে, সেদিন সুদে-আসলে তুলে নেবে। এই সামাজিক কাঠামোতে নারী কিভাবে নারীর শত্রু হয়, শোষিত হয়, তার একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত শাশুড়ী-বধূর সম্পর্কের মধ্যে। বধূ প্রতি মুহূর্তেই শাশুড়ীর মৃত্যু কামনা করে, তাই তার মনোভাব হল,—

"শাশুড়ী মলো সকালে
খেয়ে দেয়ে যদি সময় থাকে
কাঁদব বিকেলে।"

নারী যেখানে ভোগ্যপণ্য মাত্র, শোষিত, নিপীড়িত সেখানেই দেখা যাচ্ছে নারী নারীর কাছেও ভয়ের পাত্রী। বাঙালী বধূর মত অন্যান্য দেশের শাশুড়ী-বধূর সম্পর্ক কিরকম তিক্ত হতে পারে তারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন,—

১) Happy is she who marries the son of a dead mother (English)

২) The Husband's mother is the wife's devil (German)

৩) Give up all hopes of peace so long as your mother-in-law lives (Latin)

৪) The mother-in-law remembers not that she was a daughter-in-law (Spanish)

সমাজে পুরুষজাতির মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, সতীনের ঘর করতে মেয়েদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠত—কিন্তু ঘরে ঘরেই এই চিত্র ছিল। সতীনের হাত থেকে মুক্তির জন্য নানারকম জল্পনা-কল্পনা :

"অশথ তলায় বসত করি,
সতীন কেটে আলতা পরি ॥
সাত সতীনের সাত কৌটো,
তার মাঝে আমার এক অভ্রের কৌটো
অভ্রের কৌটা নাড়ি চাড়ি।
সাত সতীনকে পুড়িয়ে মারি।"

লৌকিক ছড়ায় সামাজিক তত্ত্বের সন্ধান মেলে। অর্থের বিনিময়ে কন্যা বিক্রয়ও এদেশে প্রচলিত ছিল, একজন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে বলতে শোনা গেল,—

"নারগিস্‌কে বিয়া দিব উজানতলীর দেশে,
তারা গাই বলদে চষে,
তারা পায়ে টাকা ঘষে ॥
এত টাকা নিমুনা,
নারগিসকে বিয়া দিমুনা।"

শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় পিতামাতা কৌলিন্য রক্ষার জন্য, ঐশ্বর্য দেখে শিশুকন্যাকে অশীতিতর বৃদ্ধের হাতে সঁপে দিতেও পিছপা হতেন না সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায়। বালিকাবধূর অন্তর্জ্বালা অহরহ ধিক্ ধিক্ করে জ্বলতে থাকে, তার অসহনীয় অবস্থাও ছড়ায় পাই,—

"চোখ খাওগো বাপ-মা, চোখ খাওগো খুড়ো
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক খেগো বুড়ো।"

প্রাচীনকালে নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানকে কেন্দ্র করেই মূলত প্রবাদ-প্রবচনের উদ্ভব। প্রবাদের মধ্যে সামাজিক প্রথা ও ইতিহাস জীবন্ত হয়ে থাকে।

লক্ষণীয় দিক হল সেগুলোতে সুখী নারীজীবনের কথা তেমন নেই যতটা আছে যন্ত্রণাকাতর চিত্তের ঝাঁঝাঁলো সংলাপ, দুঃসহ জীবনের অভিব্যক্তি, সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে অসহায় অবস্থার ক্ষোভ-জ্বালা-যন্ত্রণার প্রকাশ। পুরুষের বহু বিবাহ করার সামাজিক অধিকার ছিল, বহু বিবাহিত ব্যক্তিটি শ্রেষ্ঠ কুলীন বলে মর্যাদার আসনেও প্রতিষ্ঠিত হতেন, বাল্য বিবাহিতা নারীরা সেই সমাজের বলি হয়ে পরিবার ও সমাজের গলগ্রহরূপে দিনাতিপাত করতেন। স্বামী দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে গেলে প্রথমা স্ত্রীর দীর্ঘশ্বাস—"সোনার সিংহাসনে ভাগ বসল"। ঘরে দুই সতীন—স্বভাবতই ভাগাভাগির প্রশ্ন, শাশুড়িকে দুই সতীনের কলহে বহু সময়ই উপবাসে কাটাতে হয়—প্রতিবেশিনীর কণ্ঠে শোনা গেল, "দুই সতীনের রান্না, গিন্নি ভাত পান না।" পিতৃগৃহ ত্যাগ করে পতিগৃহে পদার্পণ করা মাত্রই শুরু হয়ে গেল মহিলামহলে বিভিন্নভাবে পরখ করার পালা। শাশুড়ী ও বয়িয়সী মহিলারা নব বিবাহিত বাল্য বধূটিকে পরীক্ষা করতে থাকেন কাজ করতে জানে কী না—এক শাশুড়ী বললেন,—"অকেজো বউ লাউ কুটতে দড়।" বউয়ের চাল-চলন সব কিছুতেই খুঁত ধরার চেষ্টা, "লাজে বউ ভাত খান না, চালতা হেন গ্রাস।" শাশুড়ী পুত্রবধূকে সহ্য করতে পারেন না, পাছে মায়ের প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা-ভালবাসায় টান পড়ে, অধিকার বিচ্যুতি ঘটে, ক্রোধে-ক্ষোভে বলেন,—"মায়ের গলায় দড়ি, বউয়ের ঢাকাই শাড়ি"। বধু অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় আনন্দে প্রতিবেশীরা বাড়িতে আনাগোনা করলে শাশুড়ী ঈর্ষান্বিতা হয়ে বলেন "যা ভাব তা নয়, বউয়ের পেটে পিলে।"

ঘর-জামাইয়ের কিরকম অবস্থা হত তারও চিত্র নারীর মুখে মুখেই ঘুরত—"বাইরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মেধো", আশ-পাশের মেয়েরা একত্রিত হয়ে ঘর জামাইকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলত, "যাচলে জামাই খান না, শেষে আমানিও পান না।"

শোষণ জর্জরিত ক্ষয়িষ্ণু সমাজ কাঠামোতে নারীর কোন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকে না, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকে, নিপীড়িত বঞ্চিত নারী হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুই অবদমিত, এমতাবস্থায় আবদ্ধ জীবনে ঘটে তারই তীব্র প্রতিক্রিয়া, যার ফলশ্রুতি হিসেবে পাওয়া যায় প্রবাদ-প্রবচনগুলো।

কদর্য রুচির পরিচয়ও মেলে লোকসঙ্গীতের মধ্যে। নারীদেহ ও যৌনলালসাকে প্রয়োজনীয় কাজে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটা নগ্ন চিত্র তুলে

ধরা যেতে পারে। অমাবস্যা তিথিতে চাষী মেয়েরা উলঙ্গ হয়ে বৃষ্টির উপাসনা করে, লাঙল কাঁধে নিয়ে অন্য মেয়েরা গান গেয়ে নেচে বেড়ায়,—

"হিল হিলাইছে কমড়টা মোর শির শিরাইছে গাও,
কুন্টেক না গেলে এলা হুদমার দেখা পাও,
আইস করে হুদমা দেও
তোর বাদে মুই আছয়ে বসিয়া।
ডিশোল শাল কমড়টা,
তাতে নাই মোর ভাতারটা,
কর কি মুই কায়বা কয়,
কোটে গেইলে দেখা হয়,
দেখা হইলে দ্যাহটা জুড়ায়।—" (উত্তরবঙ্গ)

উত্তবঙ্গে কিছু প্রাচীন লোকগীতি আছে যা অত্যন্ত মর্মান্তিক অথচ নিষ্ঠুর বাস্তব চিত্র। স্বামী পরনারীর প্রতি আসক্ত কিন্তু স্ত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবেই সতীত্বের পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। কাজেই তখন তার বিলাপ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই অস্ফুট কান্নার সুরে মর্মবেদনার সঙ্গে বলে,—

"মন সজনী কার কাছে কব দুঃখের কথা
কিসের মোর রান্ধন, কিসের মোর বারণ
কিসের মোর হলদি বাঁটা।
আমার বধুয়া আন বাড়ী যায় মোর-এ
আংগিয়া দিয়া ঘাটা।
আর যদি শুনং আর যদি দেখং অন্য জনার সংগে কথা,
এহেন্ যৌবন সাগরে ভাসাব, পাষাণে ভাঙিবো মাথা।"

মানভুম, পশ্চিম বাঁকুড়া, বর্ধমান ও দক্ষিণ রাঢ়ভুম অঞ্চলে ভাদ্রমাসে কুমারী মেয়েরা গৃহে মৃন্ময়ী নারী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে আগমনী গান গায়,—'আদরিণী এল আজ ঘরকে'। কুমারী মেয়েরা তাদের সুখ-দুঃখের কথা ভাদুর উদ্দেশে বলে,—

"হলুদ বনের ভাদু গো, হলুদ কেন মাখনা?
শাশুড়ী ননদীর ঘরে হলুদ মাখা সাজেনা।"

বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলে টুসুগান প্রচলিত, টুসুগানে নারীর অন্তরের হাহাকারই সুরেও রূপ পেয়েছে,—

"এত বড় পৌষপর্বে রাখিল মা পরের ঘরে
আমার মন কেমন করে।"

বাংলা দেশের তুষু ও ভাদুগানের মতো রাশিয়ায় সেমিক-গান নামে এক ধরনের লোকসংগীত কুমারী মেয়েদের কণ্ঠে শোনা যেত, সেমিক-গানে পর্যায় বিভাগ আছে। একধরনের সেমিক-গানের কুমারী মেয়ের পতিগৃহের প্রতি ভীতিই ফুটে ওঠে। তাই মাকে কাকুতি মিনতি করে বলে,—

"ও মাগো, জননীগো (রদিমায়া মাতুস্কা)
মোমের বাতি জ্বেলোনা,
দেবঈশ্বরে পুজোনা
সোনার মেয়ে হারিও না (ক্রাসাদেভিচা)।

ছোট নাগপুরের মালভূমি পশ্চিমভারতের গড়জাতি অধ্যুষিত অঞ্চল পর্যন্ত দ্রাবিড় মুণ্ডাভাষী উপজাতিদের মধ্যে ভাদু গানের মতো অবিবাহিত মেয়েরা করম (কদম্ব) গান করে। বর্ষায় কদম্ব বৃক্ষের ডালকে কেটে এনে তাকে কেন্দ্র করে কুমারী মেয়েরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, ওরাওরা গান গায়,—

"To day come the Karam
And was grand in the Stream
Karam, tomorrow you will go
To the banks of the Ganges."

একটা জিনিষ পরিষ্কার যে, পৃথিবীর সর্বত্রই সামন্ততান্ত্রিক-শ্রেণী বিভক্ত সামাজিক কাঠামোতে শোষণের শিকার নারী ও দাস, প্রাচীনকালে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা শিক্ষার স্বাধীনতা ছিল না। জমিদার-মহাজন আর্থিক প্রতিপত্তি দ্বারাই কিনে নিয়েছে নারীর অস্তিত্বকে, ভোগলালসার পরিতৃপ্তি ঘটিয়েছে, অসহায় নারী তো এই সামাজিক কাঠামোতে পুরুষের উপার্জনের ওপরেরই নির্ভরশীল, তাদের বিত্ত-বুদ্ধির বলেই বেঁচে থাকতে হয়, তার তো মুক্তির পথ খোলা নেই। যুগ যুগ ধরেই নারীকে এই নিষ্পেষণ সহ্য করতে হয়েছে। নারীর বিড়ম্বিত জীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তিরই ছন্দময় রূপ ধরা পড়েছে প্রাচীন লোকসাহিত্যে যার সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট।

প্রবাদে নারী

বহু বহুকাল ধরেই নারী ছিল সমাজের, পরিবারের ভারবোঝাস্বরূপ, সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী সমাজকাঠামোর এই রূপটাই তো প্রকট, পুরুষশাসিত সমাজকাঠামোর এই তো রীতি !—এটাই যেন স্বাভাবিক প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যুগ যুগ ধরে নারীরা সমাজের এই বিষময় দিকগুলোকে প্রবাদের মধ্যে ধরে রেখেছেন।

প্রবাদ হচ্ছে সমাজের দর্পণ। সাহিত্যের কারবার যদি হয় প্রধানত নরনারী ও সমাজকে নিয়ে, তাহলে প্রবাদের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট ও নিঃসন্দেহে সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। একটা জাতির জীবন-অভিজ্ঞতার নানাদিক প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিভিন্ন সমস্যাবলীকে স্বল্প কথায় ছন্দবদ্ধভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বেকন সাহেবের উক্তি স্মরণযোগ্য: "The genius wit and spirit of a nation and discovered by their proverbs." দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে, সত্যতাকে মাত্র দু'টি একটি পংক্তির মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। প্রবাদ কল্পনাপ্রসূত কোন ব্যাপার নয়, অত্যন্ত বাস্তব সত্য। প্রবাদ সম্পর্কে ইংরাজীতে বলা হয়েছে, "Shortest expression of longest experience." বিভিন্ন দিক থেকেই নারী-জীবন যে কত বিড়ম্বিত ছিল—তার পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় প্রবাদের মধ্যে।

নারী চরিত্র, নারীর জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, দ্বন্দ্ব-কলহ—সবটাই প্রবাদে খুব পরিষ্কার রূপ নিয়েছে। শোষণ-জর্জরিত সমাজকাঠামোর চাবিকাঠিটি এমনই যে, নারী কর্তৃক নারী শোষিত হয়েছে—নারীর কাছেই নারী ভীত-সন্ত্রস্ত-আতঙ্কগ্রস্ত। শুধু বাঙালী সমাজেই নয়, পৃথিবীর বহু জায়গাতেই এই চিত্র দেখা গেছে। একই প্রবাদ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় পরিস্ফুট হয়েছে। বাঙালীর ঘরের পুত্রবধূ শাশুড়ীর অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছে,—দিন গুণতে থাকতো কবে কখন শাশুড়ী ইহলোক ত্যাগ করবেন, তবে তার হাড়ে বাতাস লাগবে ; তাই শাশুড়ীর মৃত্যু পুত্রবধূর নিকট দুঃখজনক তো ছিলই না, বরঞ্চ আনন্দজনক, তাই শাশুড়ীর মৃত্যুতে কান্নাকাটি করা ছিল নিতান্তই লোক দেখানো ব্যাপার, মন-প্রাণের সম্পর্ক তাতে বিন্দুমাত্রও ছিল না, শাশুড়ী মরে

মাত্র ভবলীলা সাঙ্গ করেছেন, পুত্রবধূর হয়তো সেদিকে ভ্রুক্ষেপই নেই, সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো,—

"শাশুড়ী ম'ল সকালে,
খেয়ে দেয়ে যদি সময় থাকে কাঁদব বিকেলে।"

ইংরেজ রমণীরাও একদা ঐ একইভাবে মনের আকুতি প্রকাশ করেছে,— "Happy is she who marries the son of a dead mother."

ল্যাটিন ভাষায় বলা হয়েছে,—Give up all hopes of peace so long as your mother in lives."

জার্মান পুত্রবধূরাও বলেছে,—

"The husband's mother is the wife's devil."

স্প্যানিশ পুত্রবধূকে বলতে শোনা গেছে,—

"The mother-in-law remembers not that she was daughter-in-law".

প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় নারী সমাজশিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকায় চিন্তাধারাও অত্যন্ত সংকীর্ণ পথ ধরে চলাফেরা করতো, ঔচিত্য-বোধ, সমাজ-সচেতনতাবোধ জাগবার কোন উপায় ছিল না; আর ছিল না বলেই শাশুড়ী-বৌ-এর মতো এমন তিক্ত সম্পর্ক পরিবারে গড়ে উঠতো, সমাজে এর বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা যেত, কিন্তু শিক্ষার প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের মধ্যে আত্মসচেতনতা, সমাজসচেতনতাবোধ জাগ্রত হয়েছে, ঔচিত্য ও যৌক্তিকতার পথ খুঁজতে শুরু করেছে। স্বাভাবিকভাবেই উপরোক্ত ধরনের তিক্ততাও কমতে থাকে,—বর্তমানে এরূপ তিক্ততার প্রকটরূপ নেই বললেই চলে, আজকের শাশুড়ী বা বৌ—কেউই এ'রকম বিশ্রি মানসিকতা পোষণ করেন না বা এমন চিন্তাকে প্রশ্রয় দেন না কারণ আজ অধিকাংশ মেয়েরা ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় বিশ্বাসী, দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনে বদ্ধপরিকর। তারা বিশ্বাস করেন পারিবারিক তথা সামাজিক কুপ্রথা থেকে উদ্ধারের উপায় না খুঁজলে সমগ্র নারী সমাজের শৃঙ্খলমোচন সম্ভব নয়।

প্রবাদের মধ্যে দিয়ে একটা জাতিকে জানা যায়, বোঝা যায়, তার মানসিকতাকে উপলব্ধি করা যায়। সামাজিক চিন্তাধারা, জীবনযাত্রা ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনবোধে প্রবাদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। হাল আমলের মেয়েদের জানবার প্রয়োজন আছে কিছুকাল আগে পর্যন্ত সমাজে মেয়েদের স্থান কোথায় ছিল।

সামাজিক শাসন-অনুশাসনে নারীজীবন কত অবহেলিত-উৎপীড়িত-দুর্দশাগ্রস্ত-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল—তার পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশিত হয়েছে নারী কর্তৃক মুখে মুখে রচিত ও প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে, নারী চরিত্রই প্রবাদে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। কিছু পুরুষ প্রবাদের রচয়িতা আছেন বটে কিন্তু মহিলারা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে যতটা রসগ্রাহী করে তুলতে পেরেছেন, পুরুষ রচয়িতারা তা পারেননি। নারী মহলে রচিত ও প্রচলিত প্রবাদগুলো যেন প্রতিদিনের গল্পের আসরের বিশেষ উপাদান।

প্রবাদ রচনায় নারীর বিশেষ দক্ষতার কারণ হলো যতদূর মনে হয়, নারী-জীবনের সমস্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি জটিল যা নারীই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে পুরোপুরি। নারী যত অনায়াসে অন্য নারীর সুখ-দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা, ভাল লাগা, মন্দ লাগাকে উপলব্ধি করতে পারে, পুরুষ সেখানে অনেকটাই অপারগ বলা চলে। নারী জীবনের জটিলতা অধিকতর বলেই নারীরা তাদের জ্বালা-যন্ত্রণা-সুখ-দুঃখের কথাকে প্রবাদের আকারে বলে আনন্দ উপভোগ করতো —প্রবাদগুলোকে রসালাপের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেও দুঃখকে সাময়িক-ভাবে ভুলে থাকতে চাইতো। পুরুষের জীবনে ঐ ধরনের সমস্যা থাকে না, বহির্জগৎটাই পুরুষের জগৎ, কাজেই ঘরোয়া মৌখিক প্রবাদ পুরুষের জগতে নেই। পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা শিক্ষিত নারীর তুলনায় বহু বহু গুণ বেশি ছিল, তাই পুরুষ কর্তৃক রচিত প্রবাদ অধিকাংশই লিখিত প্রবাদ।

আমাদের এই সমাজ কাঠামোতে যেহেতু নারী ছিল সমাজের পরিবারের ভারবোঝাস্বরূপ, সেইহেতু জন্মের পর থেকে মৃত্যু অবধি পিতৃকুল, শ্বশুরকুল, সমাজ-সংসার, অত্যাচার-অবিচার মুখ বুজে নারীকে সহ্য করতে হয়েছে, সারা জীবন ধরে চোখের জল ফেলতে হয়েছে, সংসারের খুঁটিনাটি কাজকর্মের মধ্যে অশ্রুজলে সিক্তিত, ব্যাঙ্গরসে পরিপূর্ণ প্রবাদ মুখে উচ্চারণ করেও তারা আনন্দ উপভোগ করেছে, আর পরবর্তীকালের জন্যও এই প্রবাদগুলো বিশেষ নজিরস্বরূপ, গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ প্রবাদই মেয়েদের উদ্দেশে মেয়েদের মৌখিক রচনা, সুতরাং নারী-সমাজের প্রবাদ নারী-জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফসল, এখানে মিথ্যা বা ছলনা-কল্পনা-ভাবাবেগের কোন অবকাশ নেই, মেয়েলি ঢঙেই প্রবাদ-গুলো মানানসই,—পুরুষের মুখে বেমানান।

সমাজে পুরুষের আধিপত্য কায়েম রাখার জন্য নারীকে অবলা হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছিল, পৃথিবীর বহু জায়গাতেই বহুকাল পর্যন্ত পুরুষ-শাসিত সামাজিক

শোষণের বলি হতে হয়েছে নারীকে, নারী দীর্ঘকাল ধরে এই প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করেছে, তাই নারীকে শোষণ করার মানসিকতাও প্রবাদের মধ্যে রূপ পেয়েছে, ইতালীয় প্রবাদে শোনা গেছে—"নারী, গর্দভ আর বাদামের জন্যে শক্ত হাত চাই," তুর্কদেশে বলা হয়েছে, "নারীর বল আর্তনাদ, চোরের বল মিথ্যাবাদ।" নারীকে ছোট ভাববার এবং ছোট করে রাখার বিশ্রী মানসিকতার বিশেষ দৃষ্টান্ত এই প্রবাদগুলো। নারীকে বুদ্ধিবৃত্তি থেকে হীন ও সুখভোগের অনধিকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন রকম কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল, আর এই কৌশলগুলোও প্রবাদে পরিস্ফুট, পোর্তুগীসরা নারীকে ভ্রমণের সুখভোগে বঞ্চিত করার জন্য বললো, "নারী আর কুকুটী অধিক ভ্রমণে পথভ্রষ্ট।" রুশীয় দেশে প্রচলিত প্রবাদ হলো—"নারীদের এক সপ্তায় সাত শুক্রবার"—এখানে নারীকে মূর্খ হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করা হলো, আবার বলা হলো, "স্ত্রীলোকের চুল লম্বা, কিন্তু বুদ্ধি ছোট।"

নারী কর্তৃক রচিত প্রবাদগুলোর কথা ও ভাষা মেয়েদের ভাষা, কথা ও চিন্তাধারা অনুযায়ী, যেমন,—"মাছের তেলে মাছ ভাজা", "মুখে খই ফোটা।" 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো', 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'—উক্ত প্রবাদগুলোতে নারীজীবনের আত্মিক যোগ রয়েছে। এর কোনটির সঙ্গেই পুরুষের সম্পর্ক নেই, উপরোক্ত প্রবাদগুলোর মধ্যে বাঙালী নারীজীবনের ধান ভানার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের, তাই যুগ যুগ ধরে এই প্রবাদগুলো চলে আসছে, তার মূল কারণ হলো বহু মেয়েকে বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করে দিনের পর দিন ধান ভানা কাজটি চালিয়ে যেতে হচ্ছে,—তিক্ত অভিজ্ঞতা, জীবনের প্রতি বিস্বাদ থেকেই এই প্রবাদগুলো চলে আসছে, পরবর্তীকালে প্রবাদগুলো ক্ষুদ্রগণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর জগতে আসন করে নিয়েছে।

নারী-কেন্দ্রিক প্রবাদগুলোর ভাষা অত্যন্ত জোরালো, মেয়েলী প্রবাদের অন্দর মহলে প্রচলন বলেই রূপান্তর বিশেষ ঘটেনি, প্রবাদগুলো অনেকটাই ছড়ার মতো,—কবিতার গণবিশিষ্ট নয়, নিরক্ষর সমাজেও পরিচিত জগৎকে ঘিরে সহজ প্রকাশ ভঙ্গিমায় ছন্দবদ্ধ রচনায় মহিলাদের রচিত প্রবাদ ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বৃহত্তর পরিবেশেও রসাস্বাদনের সামগ্রী হয়েছে। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন বাংলা মেয়েলী ভাষার আলোচনা করেছেন এবং সেই সম্পর্কে তিন শতের অধিক প্রবাদের উদাহরণ দিয়েছেন। ডঃ সেন দেখিয়েছেন বর্তমান চলতি বাংলার নিদর্শন পাওয়া যায় মেয়েলী প্রাচীন প্রবাদের মধ্যে যা নাকি এখনও পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে রসসমৃদ্ধ করে রেখেছে।

ছেলে ভুলানো ছড়ায় বঙ্গজননীর স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের যে সুন্দর নমুনা চিত্রায়িত হয়েছে, ঠিক সেই মাত্রায়ই যেন প্রবাদের মধ্যে নারী সমাজের বাস্তবচিত্র ব্যঙ্গরসে পরিহাসে প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে, ঐ চিত্র ভাবরসে রসায়িত নয়—সম্পূর্ণ বাস্তবরসে সঞ্জীবিত। বাংলাদেশে সন্তানের নিকট মা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, স্বাভাবিক রীতিবিরুদ্ধ কিছু ঘটলে তাকে বাঙালি মা-এরা বলেছেন,—

"মায়ের চেয়ে দরদ যার
তারে বলি ডাইনী।"

বাঙালীর ঘরে শাশুড়ী-বৌ-এর তিক্ত সম্পর্ক অনেকটা প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, পুত্রবধূকে কেন্দ্র করে মাতা-পুত্রের কলহ চলতো—অবিবেচক স্ত্রৈণ পুত্রের মাকে অবহেলা,—

"মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি,
বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি।"

মা-এর মনের কথা পুত্রের মুখে বসানো হয়েছে, পুত্র পাছে অন্যের (স্ত্রী) হাতের পুতুল হয়ে যায় সেই স্নেহাতিশয্যে মায়ের বিলাপ, "সন্তান বুকে খেয়ে মুখে মারে" আর সেই হৃদয় যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ হয় পুত্রবধূর ওপরে—

"মা চায় আঁত পানে,
মাগ চায় ভাত পানে।"

অতএব, মা-এদের স্থির সিদ্ধান্ত,—"বিয়ে কর কালো, তাই গেরস্থের ভালো।" পুত্রবধূকে ঘরে এনেই প্রতি পদক্ষেপে শাশুড়ী লক্ষ্য রাখতেন তার চলাফেরা, আচার-আচরণের প্রতি। কোন কিছুতেই মন শান্ত হয় না, একটা অজানা আশঙ্কা, আতঙ্ক তাকে বিব্রত করে রাখতো, বৌকে খোঁটা দিতেন—

"বউয়ের চলন ফেরন কেমন,
তুর্কী ঘোড়া যেমন।"

মা-এদের কাছে মেয়ে চিরদিন আদরের কিন্তু পুত্রবধূকে কিছুতেই নিজের জন বলে ভাবতে পারতেন না,—

"পদ্মমুখী ঝি আমার পরের ঘরে যায়,
খেদা নাকী বউ এসে বাটায় পান খায়"

মেয়ের শাশুড়ী মৃত্যুশয্যায়, মেয়ের মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—

"একলা ঘরের গিন্নি হলি নাকি মা।"

মেয়ে আশঙ্কিত চিত্তে জবাব দেয়—"নিশ্বাসকে বিশ্বাস নেই নড়ছে দুটো পা।"

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষার স্বাধীনতা, পুরুষের সমান মর্যাদার প্রতিষ্ঠা থেকে তৎকালীন নারী সমাজ পুরোপুরি বঞ্চিত ছিল বলেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারা এত সঙ্কীর্ণ ছিল। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের মনে হত 'কিছু একটা বুঝি হারিয়ে ফেললাম, পুত্র হাত ছাড়া হলে দাঁড়াবে কোথায়, খাওয়াবে কে, দেখবে কে—বহির্জগৎ তো তাদের কাছে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ ছিল, শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের ঐ ধরনের মনোভাব দুরীভূত হতে থাকে। —মেয়েদের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে, তাই স্বামী-পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা খাওয়া-পরা নামক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ছিল, আজ মেয়েদের কর্মসংস্থানের জগৎ অনেকটাই প্রশস্ত, তাই পারিবারিক জীবনে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তা অনেকটা পরিমাণেই লুপ্ত প্রায়,—আজ আর শাশুড়ী-পুত্রবধূর সম্পর্ক এমনতর তিক্ততায় পৌছায়, খুবই কম ক্ষেত্রে বর্তমান জীবনের ব্যস্ততাও নারীদের মধ্যে অনেক বেশি পূর্বের তুলনায়—তাই ছোটখাটো দুশ্চিন্তায় ভুগবার অবকাশও নেই,—প্রয়োজনের তাগাদায় ব্যস্ততার জগতে যৌথ পারিবারিক বন্ধনের তেমন বাধ্যবাধকতা নেই। সমাজ স্বাভাবিকভাবেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথাগুলো থেকে বহুল পরিমাণেই মুক্তির পথে।

হিন্দু সমাজেরও বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল, বহু সতীনের ঘরে স্ত্রী-দের ভাগ্যে সুখ জুটতো না, অধিকাংশ মেয়েদের জীবনই সতীনের জ্বালায় জর্জরিত হতো, নতুনত্বের মোহ ও ঘোর কাটলেই স্বামীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হতো, তখন আবার নতুনের ডাক পড়ে, তাই তাদের অন্তর্জ্বালা,—

"নূতন নূতন তেঁতুলের বীচি, পুরানো হলে
আতায় বাতায় গুঁজি।"

রুশীয়দের মধ্যেও এই প্রবাদ প্রচলিত—

"নিজ নারী নহে কভু, জুতার মতন,
বার বার আকর্ষণ আর বিসর্জন।"

নারীর জীবনে সতীনের জ্বালা সবচেয়ে বেশি দুর্বিষহ, তাই ভালবাসার গভীরতা এক বিশ্রি মানসিকতার রূপ নেয়, যার বহিঃপ্রকাশ,—

"যমকে ভাতার দিতে পারি,
সতীনকে তবু দিতে নারি।"

শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত নারী সমাজের ভাগ্য স্থিরীকৃত হতো পিতার বংশ গৌরব, কৌলীন্য ও অর্থের মানদণ্ডের ওপরে,—বাকিটা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির

কৃপার ওপর, বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মত প্রকাশের চেষ্টা করলে তাগ্যে জুটতো লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচার, অনাচার, অবিচার। সমাজের বোঝা মেয়েদের মোটা অঙ্কের পণের মাধ্যমে কন্যাদান বা গ্রহণের রেওয়াজের শেকড় অনেক গভীরে ছিল,—আজও এই পণপ্রথা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়নি সমাজ, কিন্তু এটা যে একটা অন্যায় প্রথা,—সেটা সম্পর্কে আজ সমাজের প্রায় সকলেই একমত, তেমন কার্যকরী না হলেও আইনের দৃষ্টিতেও পণ নেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ বলে স্বীকৃত হয়েছে। পণের বলি হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে নববধূকে বলতে শোনা গেছে "মেয়ের কপাল না বাঁদির কপাল"। শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত মেয়েরা আজ অনেকটা পরিমাণে সচেতন হয়েছে, পণের দাবি মিটিয়ে বিয়েতে রাজী হওয়াটা মেয়েদের কাছে আজ অপমানের বিষয়। খোলাখুলিভাবে, অধিকারের সঙ্গে পণের বিরুদ্ধে আজ তারা সোচ্চার সভা করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কোন পাত্রপক্ষ পণ নিলেও লুকিয়েই নিতে হয়, সরবে গলাবাজি করে নেবার মতো সাহস নেই। আজ মেয়েরা সগর্বে ও আপন অধিকারে বলতে পারে,—

"ভেঙে দেবো আমি আজ যত আছে সেই নিষেধের দ্বার,
নারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কারো নেই অধিকার"।

দারিদ্র্য দাম্পত্য জীবনের মাঝে একটা কাঁটার মতো ছিল, কন্যাপক্ষের কণ্টকময় দারিদ্র্য জীবনে কি রকম বিপর্যয় ডেকে আনত তার উজ্জ্বল নজির হলো নারীকে কেন্দ্র করে অথবা নারী কর্তৃক রচিত প্রবাদগুলো।

সমাজের শোষণ-শাসন ভয়ঙ্করের বাস্তব রূপ পাওয়া যায় মেয়েলী প্রবাদগুলোর মধ্যে। সমাজে নারীর স্থান কোন্ পর্যায়ে ছিল, সেটার অবগতির জন্যও মেয়েলী প্রবাদগুলোর প্রয়োজনয়ীতা যথেষ্ট ছিল। সামাজিক, ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই প্রবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রেভারেণ্ড জেমস্ লঙে-এর উক্তি স্মরণযোগ্য,—"Proverbs throw a light on the dark recisses of social life, on archaism old customs, history, and ethnolgy."

রূপকথা : শিশুসাহিত্য অথবা কথাসাহিত্য

'রূপকথার পরিবেশ, সূচনা, পরিসমাপ্তি-র মধ্যে পরিণত মনের যৌক্তিকতা-বোধ নেই বললেই চলে, সবই যেন রীতিবিরুদ্ধ ব্যাপার, বাস্তবতার ঊর্দ্ধে। রূপকথা গ্রন্থিহীন, ছুটে চলেছে আপন গতিতে, স্বপ্নরাজ্যে আসর জমানোই যেন তার কাজ।'

দিন যত এগিয়ে চলেছে সমুখপানে মানুষ ততই স্বপ্নের জাল আস্তে আস্তে ছিঁড়তে ছিঁড়তে চলেছে। আধুনিক কথাসাহিত্যে যে দেশে ঘটনাটি সংঘটিত হয় সেই দেশের নাম, নায়ক-নায়িকার নাম উপস্থিত সকলেরই নাম ধাম জানা যায়, কিন্তু রূপকথায় রাজা-রাণীর নাম নেই, সন্ন্যাসীর নাম নেই। কেবলমাত্র একটি মাঠ, একটি সুবিশাল নদী, সমুদ্র, তেপান্তরের মাঠ ইত্যাদি অনির্দিষ্ট জাতীয় কিছু। রূপকথার পাঠকমন যেন নির্দিষ্ট কিছু জানতেও চায় না, প্রশ্নও করে না।

আরব্য উপন্যাস বা পারস্য উপন্যাস সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, ঐ সব কাহিনীতে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় দুঃসাহসী বীর চরিত্রকে অবলম্বন করে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তাতে লৌকিক উপন্যাসের সুরকে স্পর্শ করা যায়। ঘটনা অপেক্ষা নায়ক চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে।

রূপকথায় মধুমালার কাহিনী শিশুর উপজীব্য বিষয় নয়, এই কাহিনীর প্রেমরস পরিণত মন ব্যতীত বোঝা দুর্বোধ্য, তাই এখানেও আধুনিক রোমান্সের আস্বাদ মেলে। রূপকথার অধিকাংশ কাহিনীই প্রেম-বিষয়ক। উল্লেখ করা যেতে পারে কাজলরেখা, মধুমালার কাহিনী। মধুমালার কাহিনীতে রয়েছে প্রেমশক্তি যে কি দুর্জয়—তারই চিত্র।

একজন অপুত্রক রাজা হয়তো লতা-পাতায় তৈরি ওষুধ অথবা দৈব আশীর্বাদ অথবা কোন বরপ্রাপ্তিতে পুত্রলাভ করবেন, তারপর সেই রাজপুত্র ভাগ্যান্বেষণে নিরুদ্দেশ যাত্রা করবে, তারপর বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে রাজকন্যা লাভ করবে রাজ্যযৌতুকসহ, অবশেষে একদিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আধুনিক কথাসাহিত্যের রোমান্সের বীজ সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। দুঃসাহসিক প্রেমই প্রধানতঃ রূপকথায় উপভোগ্য বিষয়, আখ্যানের পথ অলৌকিক হলেও কাহিনীর রস নিহিত আছে প্রেমের মধ্যেই, প্রেমই এর

প্রেরণা। রূপকথার প্রেম সহজ সরল গতিতে ধাবমান, আধুনিক কথাসাহিত্যের জটিলতা অবর্তমান। অনেক সময়ই রূপকথা রূপকমাত্র, কিন্তু গভীরতায় প্রবেশ করতে পারলে দেখা যাবে তার মধ্য থেকেই মানবজীবনের অপূর্ব রস ধরা দিয়েছে।

কোন এক সন্ন্যাসী একজন নিঃসন্তান রাণীকে সন্তান লাভের জন্য একটি বিশেষ ফল খেতে দিয়েছে, ফল খেয়ে সন্তান লাভ হয়তো হলো, অন্য রাণীদের মনে তাতে হিংসার উদ্রেক হলো, তখন সদ্য প্রসূতা রাণীকে রাজার সামনে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিভিন্ন রকম ছলনা কৌশল অবলম্বন করে অন্যান্য রাণীরা, কখনও ছলনার ফাঁদে রাজা পা দিতে বাধ্য হন, নিজের অজান্তে সদ্য প্রসূতা রাণী রাজার কোপে পড়ে নির্বাসিতা হ'ন রাজপ্রাসাদ থেকে, যদি কুচক্রীদের মিথ্যা ষড়যন্ত্র রাজা বুঝতে পারেন পরবর্তীকালে, তা'হলে হয়তো নির্বাসিতা রাণীকে অট্টালিকায় ফিরিয়ে আনেন, কুচক্রীরা কঠোর শাস্তির যূপকাষ্ঠে বিদ্ধ হ'ন। শিশু-মন কঠিন বাস্তবতা, যুক্তি-চিন্তার ধার ধারে না, আশ্চর্য কিছু ঘটেছে দেখে শিশু উৎসাহের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে পড়ে যায়, ঘটনার রসশৈলী শিশু মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। এটা শুধুমাত্র রূপকথার বিষয় নয়, ঐ ধরনের ব্যবহার বা ঘটনায় ঔপন্যাসিক মনেরই পরিচয় মেলে। এটা বর্তমান জীবনের ধূলি মালিন্যের ঊর্ধ্বে কিছু ব্যাপার নয়, আমাদের চার পাশেরই ঘটনা। বহুপত্নীক সমাজে এরূপ ঘটনা অহরহই ঘটেছে, আজও কোনও নায়কের জীবনে একাধিক পত্নী বর্তমান থাকলে ঔপন্যাসিক স্বাভাবিকভাবেই এ' রকম কিছু ঘটিয়ে দেন।

চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো রূপকথার কাহিনীর প্রধান চরিত্র বেশিরভাগই রাজা রাণী-রাজপুত্র-রাজকন্যাকে আশ্রয় করে। একটা শিশুর নিকট এ'রকম চরিত্রসকলের কাহিনী বেশ রোমঞ্চকর ব্যাপার, কতকটা সম্মোহনী শক্তির মতো। আধুনিক কথাসাহিত্যের কারবার হলো যে কোন শ্রেণীর রক্তমাংসের মানুষকে নিয়ে।

রূপকথার চরিত্র সৃষ্টিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই বললেই চলে, আধুনিক রোমান্সে অন্তর্দ্বন্দ্বই কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যায়; ধীরে ধীরে আপন আপন ব্যক্তিত্বের বিকাশ লাভ ঘটে। শিশু মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের অবকাশ খুব কম থাকে স্বাভাবিক-ভাবেই, রূপকথার গতিও সহজ সরল, অনেকটা সেই কারণেই শিশুর নিকট রূপকথার কাহিনী যতটুকু উপভোগ্য, আধুনিক কথাসাহিত্য ততটুকু নয়। বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি', শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর

ছেলে'-র মতো দু'চারখানা কথাসাহিত্য শিশুপাঠ্য বা শিশুর উপভোগ্য থাকলেও শিশু মনের উপযোগী কথাসাহিত্যের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

রূপকথার চরিত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য হলো, যে ভাল সে শুধু ভালই, যে শঠ, সে শুধু শঠই, আধুনিক কথাসাহিত্যে দু'একটা Type চরিত্র থাকলেও বর্তমান জীবনের বাস্তবতা নিয়েই যেহেতু কারবার, তাই তার ঘটনার সকল মানুষই দোষে-গুণে মিশ্রিত। একটা শিশুর কাছে যে ভাল সে ভালই, মন্দ-মন্দই, সে এত বিচারের ধার ধারে না।

রূপকথায় প্রেমের যে গভীরতা রয়েছে আধুনিক রোমান্সেরও সেটাই বিষয়বস্তু। কিন্তু এই রোমান্স শিশুমনে কোন রকম রেখাপাত করে না, তার জটিল রহস্য শিশুর নিকট দুর্বোধ্য অথচ রূপকথার প্রেমরচনার শিল্পকৌশল শিশুর আনন্দের খোরাক যোগায়। আবার রূপকথার প্রেম পরিণত মন বা সাহিত্য-পিপাসু মনকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না। শিশুদের নিকট প্রেম দুর্বোধ্য হলেও রূপকথার পরিবেশ ও কাহিনী সংঘটনই শিশুমনের উপযোগী, 'আধুনিক কথাসাহিত্যের প্রেম লোক-সমাজের পরিণত প্রতিভারই রসভাণ্ডার।'

রূপকথার পরিসমাপ্তি অবধারিতই মিলনান্ত, দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে 'কাজল রেখা,' 'মধুমালা'র কাহিনী। বার বৎসর কাজলরেখার দুঃখের জীবন কাটল, তারপর ধর্মমতি শুক তাঁর সকল পরিচয় প্রকাশ করল। নকল রাণীর ভাগ্যে জুটলো কঠোর দণ্ড। মধুমালার কাহিনীতে আছে রাজপুত্র স্বপ্নে-দেখা মধুমালাকে দেখে চিনতে পারলেন, মধুমালাও সেই রাত্রে রাজপুত্রের জন্য পাগলিনী হয়েছিলেন। উভয়ের মিলন ঘটলো। একটি শিশু সুন্দর বা আনন্দজনক পরিণতি ঘটেছে দেখেই আনন্দ পায়, স্বস্তিবোধ করে, কিন্তু কথা-সাহিত্যের মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই, প্রয়োজনানুযায়ী পরিসমাপ্তি ঘটে অর্থাৎ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি সাধনেই পরিণতি ঘটে। তাছাড়া কথাসাহিত্যে স্বাভাবিক কারণেই জন-জীবনের পথ বিচিত্র। কিন্তু রূপকথা যেন একই ছকে বাঁধা এবং পরিসমাপ্তিও তাই প্রায়শই এক। আর রূপকথায় প্রাপ্তি ও অন্যায়ের প্রতিবিধানেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ধ্বনিত হয়, রূপকথায় জটিলতার কোন স্থান নেই, তার গতি সহজ সরল, শিশু রূপকথার এই গতিপথকেই পছন্দ করে নিজের মতো করে।

রূপকথা আকস্মিকভাবে কোন নাটকীয় ঘটনা দ্বারা আরম্ভ হয়, কিন্তু কথা-

সাহিত্য শুরুতেই ঐভাবে অগ্রসর হয় না। রূপকথায় ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়, কথাসাহিত্যে তার কোন অবকাশ নেই।

কথাসাহিত্যে ব্যক্তির রুচি, শিল্পবোধ, চরিত্র, পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রা যেমন সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়, সর্বোপরি লেখকের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় তাঁর রচনার মধ্যে রূপকথায় সেটা একেবারে অনুপস্থিত।

রূপকথা-র মায়ালোক, 'চাঁদের রাজ্য, সুনীল আকাশ', সাত সমুদ্র তের নদীর পার, তেপান্তরের মাঠ, রাক্ষস-খোক্কস, পরীর রাজ্য, চিন্তার অতীত অট্টালিকা, সন্দেশের তৈরী অথবা বরফের তৈরী-প্রাসাদ, দুঃসাহসিক ঘটনা ইত্যাদিতে শিশুমন যতটা মুগ্ধ হয়, পরিণত মন ততটা হয় না। ধরা-ছোঁয়ার অতীত একটা রাজ্য শিশুমনকে যে পরিমাণে প্রলুব্ধ করতে পারে, পরিণত মনকে ততখানি পারে না। বুঝে-না-বুঝে শিশুমন উল্লসিত হয়, পরিণত মন কার্য-কারণের অনুসন্ধান করে। তাই রূপকথার পরিপূর্ণ আস্বাদ গ্রহণে প্রাপ্তবয়স্করা অসমর্থ, শিশুদের রূপকথার রাজ্যে পরিপূর্ণ অধিকার।

সবশেষে এটা বলা যেতে পারে যে, যে-সকল উপাদানের সংমিশ্রণে কথা-সাহিত্য সাহিত্যের বিচারে শ্রেষ্ঠ শিল্প বা সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে অনায়াসে, সেই তুলনায় রূপকথার মানদণ্ড তেমন কিছুই নয় বলা চলে। তবে কথাসাহিত্য রূপকথার তুলনায় পরবর্তীকালের সৃষ্টি, স্বাভাবিকভাবেই কথা-সাহিত্যিক প্রয়োজনানুযায়ী বহু উপাদান রূপকথা থেকে সংগ্রহ করেছেন বা করতে পারেন। আর শিশু খুঁজে পায় তার মনের খোরাক রূপকথার রাজ্যে।

শিশু যুক্তির ধার ধারে না, কার্যকারণ, পরিণতি, অপরিণতি—কোন কিছুরই অর্থ বোঝে না। রূপকথার চমক-জাগানো ঘটনা বা কাহিনীই তাকে আকর্ষণ করে—যা সে চোখে দেখতে পাচ্ছে না, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তেমন কিছু তাকে কিছুক্ষণের জন্য মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। আর তাই রূপকথাকে শিশুসাহিত্য বলা হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে মাতা, পিতা, অভিভাবক ও সমাজের দায়িত্ব হলো তাকে বাস্তবতায় সচেতন করে তোলা, তাকে অলৌকিক কল্পনায় মোহাবিষ্ট করে রাখা কখনই সুস্থ চিন্তা-ভাবনার পরিচায়ক হতে পারে না।

প্রাচীন লোকসাহিত্যের আঙিনায় শিশু বিষয়ক ছড়া

যে সাহিত্যের মধ্যে জনগনের জীবনের রূপ প্রতিফলিত হয় এবং তা বৃহত্তর সমাজের মধ্যে পরিবেশিত হয় তাই লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যে কোনরূপ তথাকথিত পাণ্ডিত্যের অবকাশ নেই। মানুষের অন্তঃস্থল থেকে যা স্বতোৎসারিত ভাবে বেরিয়ে এসে সাহিত্যের ভাণ্ডারে আসন পায়, তাকেই লোকসাহিত্য বলা যেতে পারে। সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য যদি জনগণ হয়, তবে লোকসাহিত্য যে জনসাহিত্য সেটা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। সাহিত্য যার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, তার মূল খুঁজতে হবে লোকসাহিত্যের মধ্যে। ঐ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা একটু উল্লেখ করা যাক,—'যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুল-ফল ডাল-পালার সঙ্গে মাটির নীচেকার শিকড়গুলোর তুলনা হয়না, তবু তত্ত্ববিদদের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে। জনসাধারণের জন্যে জনসাধারণ কর্তৃক রচিত এই সাহিত্য, এটা কতকাংশে সমাজের সমম্বিত মানুষের চিন্তা-শক্তির ফলস্বরূপ অথবা যৌথ সৃষ্টি বলা যেতে পারে। কাজেই এটা অতিসহজেই বলা যেতে পারে যে, সমাজের রূপ যার ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়, তাকে অবাস্তব ভাববার কোন কারণ থাকতে পারে না। মানুষের মন-প্রাণের কথাই অভিব্যক্ত হয়েছে কোনরূপ অলঙ্কারবিহীন ভাবেই।

শিশু ও নারী লোকসাহিত্যের আসরে প্রধান স্থান অধিকার করেছে। আধুনিক নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত নর-নারীর মনেও তাই আনন্দের খোরাক দিতে পারে। নারীর জীবনের সমস্ত অভিব্যক্তি, হৃদয়াবেগ, ভাবনা, সুখদুঃখের কাহিনী, প্রেম-প্রণয়, আনন্দ-উল্লাস প্রভৃতির ভিত্তিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হৃদয়স্পর্শী লোকসঙ্গীত গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে বলা যেতে পারে যে, বহু যুগের শিশুর চিত্ত-ক্ষেত্রের ওপর দিয়ে অশ্রান্তভাবে কত বিপ্লব কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়ে অক্ষুন্নভাবে চলে এসেছে লোকসাহিত্যের ছেলেভুলানো ছড়া ও ঘুম-পাড়ানী গান। এর উৎস সমগ্র মাতৃস্নেহের মধ্যে, "যে স্নেহ রাজ্যেশ্বর রাজা হতে দীনতর কৃষককে পর্যন্ত বুকে করে মানুষ করেছে; সকলকে শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখিয়ে ভুলিয়েছে এবং ঘুম-পাড়ানী গানে শান্ত করেছে।"

নিখিল বঙ্গদেশের সেই চিরপুরাতন গভীরতম স্নেহ হতেই এই গান বা ছড়া উৎসারিত। এই ছড়াগুলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে সর্বদেশের সর্বকালের আদিম কবিতার স্বাক্ষর।

একটি কেন্দ্রীয় বিষয় বা 'মোটিফ' হচ্ছে ঘুম-পাড়ানী ছড়ার বক্তব্য, মা বা মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তির জীবনের গভীরতম কথা। সামাজিক রীতি-পদ্ধতি, ঘুমের আবাহনমূলক গান, আবার ঘুমন্ত শিশুকে নিয়েও নানারকম স্নেহের অভিব্যক্তি ঘটেছে ঘুম-পাড়ানী গানের মধ্যে। ঘুম-পাড়ানী ছড়ার মধ্যে নির্দিষ্ট কোন বিষয় আছে। আবোল তাবোল কথা নয় বা পাগলের প্রলাপের মতোও নয়। আর এই ঘুমপাড়ানী গান শুধুমাত্র বাঙালী মায়েদেরই জিনিস নয়, পৃথিবীর সমস্ত মায়েদের হৃদয়ের অভিব্যক্তি ঘটেছে তার সন্তানের জন্য—পার্থক্য ঘটেছে শুধু ভাষার ক্ষেত্রে

ঘুম-পাড়ানী গানের একটি অংশ হচ্ছে দোল-খাওয়ানো ছড়া, ইংরেজরা বলে 'দোলনার গান'। এই দোল-খাওয়ানো ছড়ার প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে, ছন্দের তাল বা দোল। এখানে সুরেরই প্রাধান্য থাকে, মায়ের কণ্ঠে ছড়ার মাধ্যমে শিশু যে সুর শোনে তাতে শিশু মুগ্ধ হয়, ফলে শিশুর চোখে ঘুমের আমেজ দেখা যায়। নিতান্তই আবেগের বশে মায়েদের বা ধাত্রীদের কণ্ঠে দোল-খাওয়ানো গান বা মৌখিক গান গীত হয়। পরিণত বয়স্কের রচনাবলে সামাজিক অনেক সমস্যা এই ছড়ায় স্থান পায়। বাংলার পারিবারিক স্নেহ-বাৎসল্য রয়েছে এই দোলনা গানে। ঘুমন্ত শিশুর পাশে বসে শিশুর জননী বা ধাত্রী গান গাইছে আনন্দ ও বেদনামথিত চিত্তে সুদূর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যে, শিশু-কন্যাকে একদিন অন্যের হাতে তুলে দিতে হবে এই ভেবে,—

"দোল্ দোল্ দোলনী,
রাঙা মাথায় চিরুণী।
বর আসবে এখুনি,
নিয়ে যাবে তখুনি।"

ঘুমের আবাহনমূলক ছড়া হচ্ছে ঘুম-পাড়ানী গানের আরেকটি অংশ। মায়ের গলায় 'ঘুম আয়রে! ঘুম আয়রে! কথাটির মধ্যেই যেন একটি সম্মোহনী শক্তি রয়েছে, আর এই মিষ্টি আহ্বান ধ্বনিতে শিশুর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। বাঙালী ঘরের আরেকটি স্নেহার্দ্র পারিবারিক চিত্র এই ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়। বাঙালীর মাধুর্য সমস্ত উজাড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছে এই ছড়ার মধ্যে। বাঁকুড়া জেলার মা-এর কণ্ঠে শোনা যায়—

"খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল
বর্গি এল দেশে ;
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবে কে সে ?"

দেশে তখন বর্গিদের খুব উৎপাত শুরু হয়েছিল—শিশুর ঘুমে মায়ের ছড়ায় এই ঐতিহাসিক সত্যটি ধরা পড়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকেরা সব সময় ঝড়-এর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতো, এই ঘূর্ণী ঝড় ঝঞ্ঝা ঘুম-পাড়ানী গানেও জায়গা করে নিয়েছে।, চট্টগ্রামের মা বা ধাত্রীর কণ্ঠে শোনা যায়—

"মণি গুমাইল পাড়া জুড়াইল
গোর্কি আইল দেশে,
টিয়া পাখীতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবে কে সে ?"

এই ছড়াগুলো জীবনের সঙ্গে মিশে যায়। জীবনের সঙ্গে যা মিশে যায়, তাতো আর কৃত্রিম হতে পারে না। শিশুর চিত্তে পার্থক্যবোধ থাকে না বললেই চলে, তাই অনেক সময় চিত্রের অসম্ভাব্যতা, অকল্পনীয়তা শিশু চিত্তে দোল খায়। সোনামণির বিয়েতে হাতী-ঘোড়া-বাঘ-ভালুক নাচে। শিশু-ভোলানো ছড়ায় জীবনের পরম সত্য প্রস্ফুটিত হয়, যেমন—

"কিসের মাসী, কিসের পিসি
কিসের বৃন্দাবন,
চতুর্দিকে চেয়ে দেখো
'মা' বড় ধন।"

ঘুমন্ত শিশুর দিকে তাকিয়েও মায়ের মনে কত আনন্দের আলোড়ন উদ্বেল হয়ে ওঠে, তাইতো তিনি কত রকম আশ্বাস দেন,—

"বইতে দিমু রূপার চেয়ার, শুইতে সোনার খাট,
খেলার তরে তাস দিমু, হাওয়া খাইতে মাঠ।
সরস্বতী কলম দিমু, লিখবা তাড়াতাড়ি,
পড়ার তরে উপন্যাস আলমারি আলমারি।"

বাঙালী মা-এদের সামাজিক ও পারিবারিক ঐতিহ্য হল কন্যাসম্প্রদানের সময় পণ ও যৌতুক দানের। পণ ও যৌতুকের পরিমিতি অনুযায়ী কন্যাদায়গ্রস্ত মাতা-পিতার সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মানমর্যাদা নির্ভর করত। শুধু তাই নয়, শ্বশুর

বাড়িতেও কন্যার সুখ-শান্তিও সেই মতই হত। তাই শিশু কন্যাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে মা-এর দান-সংক্রান্ত নানা জল্পনা-কল্পনা ছড়ায় রূপ পেয়েছে।

মায়ের স্থান যে শিশুর নিকট কত আপন, তার অভিব্যক্তিও ছড়ায় আছে,—

"মাসি পিসি বনগাঁবাসী বনের ধারে ঘর,
কখনো মাসি বলেন না যে খই-মোয়াটা ধর।
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন
এতদিনে মানিলাম মা বড়ো ধন।"

অবোধ শিশুর মনেও 'মা'-এর সঙ্গে আর সকলের পার্থক্যটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই রেখাপাত করে। জীবনের একটি পরম সত্য কথা এখানে ফুটে উঠেছে।

ইতিহাস রচনার প্রয়োজনেও লোকসাহিত্যের উপকরণ ব্যবহৃত হতে পারে। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রংপুরের কৃষক সমাজ থেকে সংগৃহীত গোপীচন্দ্র বিষয়ক গীতি-কাহিনীতে একাদশ শতাব্দীর সমাজ-চিত্রের সন্ধান পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলে-ভুলানো ছড়া "প্রবন্ধে" অনেক প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। যেমন,

আগডুম্ বাগডুম্ ঘোড়ার ডুম সাজে।
ঝাঁঝ কাঁসর মৃদঙ্গ বাজে।"

এটার প্রথম পদটির অর্থ 'আগডুম' অর্থাৎ অগ্রবর্তী ডোম সৈন্যদল ও 'ঘোড়ার ডুম' অর্থাৎ অশ্বারোহী ডোম সৈন্যদল। ছড়াটি একটি ডোম চতুরঙ্গের বর্ণনা। যখন বাংলার পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার জন্য বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের রাজগণ ডোম সৈন্যদল নিযুক্ত রাখতেন, তখন তাঁদের বীরত্বব্যঞ্জক চিত্রটি শিশুমন অধিকার করে বসেছিল।

লোকসাহিত্য ও সঙ্গীতে সমাজে ও পরিবারে নারীর স্থান প্রতিফলিত হয়। তাই সামাজিক প্রথানুযায়ী শিশু বালকটি সগর্বে বংশানুক্রমিক অনুসারে পরিবারে আসন জাঁকিয়ে বসে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সে ধরেই নেয় 'পুরুষ' হয়ে জন্মানো মানেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধালাভের অধিকারী। একই সঙ্গে বেড়ে ওঠা শিশু কন্যাটির মনে আতঙ্ক ঘনীভূত হতে থাকে, পরের ঘরে অর্থাৎ 'শ্বশুর বাড়ি' নামক ভয়াবহ স্থানে চিরদিনের জন্য চলে যেতে হবে ভেবে। আশৈশব-লালিত সংসার তার চিরস্থায়ী আবাসস্থল নয়, ভিন্ন একটি পরিবারে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে তাকে আজীবনের জন্য নিজের স্থান করে নিতে হবে। আর এই নতুন পদযাত্রীর সম্মুখে থাকে কত বাধা-বিঘ্ন, অজানা দুঃখ-কষ্ট। কত ঘাত-

প্রতিঘাত চলতে থাকে তার দুঃসহ জীবনযাত্রা। পূর্বস্মৃতি বিজড়িত স্নেহচ্ছায়া-মাখা পিত্রালয়কে পিছনে ফেলে নবজীবনের দ্বারদেশে প্রবেশ করে কন্যা প্রথমে কিছুতেই নিজেকে নতুন পরিবারের সঙ্গে সংগতি সাধন করতে পারে না।

লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে বলা যায় যে, গ্রাম বাংলার সংগে রাশিয়ার লোক-সঙ্গীতের সাদৃশ্য অত্যন্ত বেশি। বাঙালীর ঘরের শিশু কন্যাকে মা-বাবার আশ্রয় ছেড়ে 'শ্বশুরবাড়ি' বা 'পতিগৃহ' নামক কারাগারে গিয়ে কঠিন জীবনযাত্রা শুরু করতে হয়, তখন শিশুকন্যার কি মর্মান্তিক অবস্থা! পিতৃগৃহের 'দুধের সর'-এর মত শিশুটি স্নেহ-ভালবাসা বঞ্চিত পতিগৃহে গিয়ে কি করে কালাতিপাত করবে সেই ভেবে আপনজনরাও আতঙ্কিত।—

"অন্নপূর্ণা দুধের সর ক্যামনে করবি পরের ঘর,
পরের বেটা মারিবে, কানাচ বইসা কাঁদিবে।"

রাশিয়ার লোকসঙ্গীতেও বালিকা কন্যার পতিগৃহের প্রতি আতঙ্ক লক্ষিত হয়,—

"ও মাগো, জননী গো (রাদিমায়া মাতুষ্কা)
মোমের বাতি জ্বেলো না
দেব-ঈশ্বরে পুজোনা
সোনার মেয়ে হারিওনা (ক্রাসা দেভিচা)"

ছড়াগুলোতে জীবনের অসংগতি, বেদনার্ত জীবনের কান্না, নিপীড়ন, অত্যাচার-অবিচার, শিশু মনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি এবং তার গুমরে মরা অভিমানকে উপলব্ধি করা যায়। সমাজ জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই শিশু বিষয়ক ছড়া উদ্ভূত হয়েছিল। ঐতিহাসিক ও সামাজিক দৃষ্টিতেও শিশু-বিষয়ক ছড়ার প্রয়োজন অপরিমেয়।

শিল্প-সংস্কৃতি ও রাজনীতি

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিল্প-সংস্কৃতিরও ঘটে দিক বদল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে শুরু হয়ে গেল প্রতিযোগিতার পালা। রাজনৈতিক চেতনার প্রভাব বিস্তার করল শিল্প-সংস্কৃতির ওপরে, সাহিত্যে-শিল্পে-রঙ্গমঞ্চে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হল মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক কোথায়। প্রায় সকল সাহিত্য শিল্পীই এ যুগে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন মানুষের নীচতা-হীনতা-ঘৃণ্যতার জন্য সমাজও সমভাবে দায়ী। তাই শিল্পের বাস্তববাদের তোরণ দ্বার হল উন্মুক্ত।

সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে একটা জাতি, একটা সমাজ, একটা দেশ সভ্যতার সোপানে পদার্পণ করতে সক্ষম হয়, কাজেই এখানে গোপনীয়তার কোন স্থান নেই। লুকোচুরির খেলাকে এখানে প্রশ্রয় দেওয়া চলতে পারে না। সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে তো পরিশীলিত মন এবং রুচিই কাম্য, নতুবা 'সংস্কৃত' বা 'সংস্কৃতি' শব্দটিরই অবমাননা করা হয়। সংস্কৃতি চর্চা নানা ভাবেই হতে পারে, যেমন, কাব্য, সাহিত্য, নৃত্য-গীত, অভিনয়, সুস্থ-সুন্দর আলোচনা সভা, খেলাধূলা, কলাশিল্প, বয়নশিল্প ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। সুস্থ, সভ্যমন এবং সংস্কৃত সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে অপরিহার্য। তবে এটাও সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, শিল্পীকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতিবিদ্ কোনদিনই অগ্রসর হতে পারবেন না।

সংস্কৃতির ধারাকে অপরিবর্তনীয় করে রাখলে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। তখন শিল্পীর ভূমিকা হল জনগণের জীবনের আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংকট ও সমস্যাকে রূপায়িত করা। সংস্কৃতি তখন আপন ধারাতেই হাত মিলিয়ে চলবে। পুরানো সংস্কৃতিকে অহেতুক অমর্যাদা করে নতুন সংস্কৃতিকে অভ্যর্থনা জানানো কোনদিনই সম্ভব নয়। সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রগতির পথে অনেকটা এগিয়েছে সত্য কিন্তু সংশয়পূর্ণ চিত্তে অগ্রসর হবার ফলে উন্নতি ধীর পদক্ষেপে চলেছে। অবশ্য এর মূল কারণ একদিকে বুর্জোয়া মনোবৃত্তিসম্পন্ন কতক সুবিধাবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকের দৈন্য, অন্যদিকে রয়েছে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণ। ভাব, প্রেরণা এবং উদ্দীপনার অভাব ঘটলেই অচল সংস্কৃতিকে স্থায়ী আসন বিছিয়ে দিয়ে প্রগতির পথ রুদ্ধ করতে হয়।

সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজনই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে জন্ম দেয়। তাই প্রয়োজনের খাতিরেই পুরাতন সংস্কৃতিকে গ্রহণ এবং বর্জন করেই নতুন সমাজকে গঠন করতে হবে। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের অগণিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, লাঞ্ছিত ও শোষিত মানুষগুলোর সম্মুখে নতুন বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। তাদের প্রাণের জিজ্ঞাসা, মনের ব্যথাকে রূপ দিতে হবে নবচেতনায়, গণতান্ত্রিক চেতনায়। ধর্মের গোঁড়ামিকে পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে হবে। যে গতি জনগণের সুখের জন্য সমুখপানে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাকেই বলা যেতে পারে প্রগতি।

বহু শিল্পীর ধারণা হুবহু চিত্রিত করাই বস্তুবাদী শিল্পীর লক্ষ্য। এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদস্বরূপ এঙ্গেলস্ বলেছেন,—

In addition to variety of detail, realism takes for granted the true protrayal of typical characters in the typical circumstances ·· which surround them and motivate their behaviou." সমাজ বিবর্তনে একজন শ্রমিকের যে ভূমিকা হওয়া উচিত, শ্রমিককে সেই ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তাকে হতে হবে typical character in typical circumstances. এ প্রসঙ্গে গোর্কির Mother-এর Pavel Vlasov নামক শ্রমিকের কথা বলা যেতে পারে। বালজাক লেখক-শিল্পীদের বলেন, 'The Secretary of history'.

বিশ্বের সকল বড় শিল্পীরই সমাজবোধ অত্যন্ত প্রবল, যার ফলে বাস্তববাদী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকা সত্ত্বেও Flanbert শিল্পের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বস্তুবাদী। বরিস্ পস্টারনাক বলেন,—"শিল্পের লক্ষ্য হোলো আত্মপ্রদান এবং তা কৃতিত্বের হাততালি নয়।" এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, টিপিক্যাল সমস্যা সব সময়ই একটা রাজনৈতিক সমস্যা।

প্রকৃত শিল্পীর যে গভীর অনুভূতি ও সমাজ সচেতনতার স্পর্শে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্ভব, দেশের সকল শিল্পীর সেই পথ নির্বাচন করাই কাম্য। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে যে, অতীতের শিল্প-সংস্কৃতির রঙ্গমঞ্চে খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার অত্যন্ত কড়াভাবে নিয়ন্ত্রিত। রাজা মহারাজা, জমিদার শ্রেণীর লোকই নায়ক-নায়িকা, আর তাদের তুষ্টি সাধনের জন্য চিত্রশিল্পের সৃষ্টি। সমাজ ও রাষ্ট্রের চাবিকাঠি ছিল ঐসব মানুষের হাতে। আর দেশের বাকি

মানুষ অন্ধকার কামরায় হাতড়ে বেড়িয়েছে। চৈতন্যের অভাবে খুঁজে পায়নি মুক্তি পথের সন্ধান, যার ফলে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি চূড়ান্তভাবে ব্যাহত হয়েছে।

শিল্প-সংস্কৃতির প্রধান উপজীব্য মানুষ ও সমাজ। দেশের আপামর দুঃখী জনসাধারণই এ সমাজের মেরুদণ্ড। তাদেরই 'তিল তিল রক্ত মোক্ষণে শিল্প-সংস্কৃতির স্বর্ণ মিনার গগন ভেদ করে উঠেছে।'

জীবনের নিজস্ব গতি-প্রকৃতির সঙ্গে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার একটা সংগতি বিধানের প্রয়াস থেকেই জীবন শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গেও এর একটা সম্বন্ধ সৃষ্ট হয়েছে। রাজনীতিকে যদি জীবনের সঙ্গে একান্তভাবে সংযুক্ত বলে মনে করা যায়, তবে তার প্রবেশ অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

শ্রীমতী পার্লবার্কের 'গুডআর্থ' কৃষক জীবনের একান্ত বস্তুচিত্র হয়েও চিরকালের মানবজীবনে রসসিঞ্চিত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সার্থক প্রগতিবাদী শিল্পীদের লেখনীতে রাজনীতির ও সমাজনীতির একান্ত বস্তুরূপ থাকলেও মানব জীবনের রসমূর্তি হয়ে উঠেছে। আধুনিক রুশ সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে এই বাস্তব জীবনরস যুদ্ধোত্তর বিশ্বসাহিত্যের প্রায় সর্বত্রই এই সংগ্রামী বাস্তব জীবনের বাণীরস। তবে কোন শিল্পী বা সংস্কৃতিবিদের এটা ভুললে চলবে না যে রাজনীতি প্রচারের ভূমিকা শিল্পের বা শিল্পীর নয়।

একালের শিল্পীকে কখনও সমাজের নির্দেশকে, প্রয়োজনকে অবহেলা করা চিত নয় যে সমাজ তাঁর শিল্পী মানসকে পরিবর্ধিত করবার উপযুক্ত রসদ দেয়নি, নির্বিকার ঔদাসীন্যে তাকে স্বীকার করা অন্যায়। শিল্পীর দরদ যদি থাকে অজ্ঞাত, অবহেলিত নির্যাতিত মানবদের জন্য, তবেই সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সম্ভব।

অসংস্কৃত সমাজ বা অমার্জিত অজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সাহিত্য-শিল্প সম্ভব নয়। সাহিত্য জনগণকে ভাল উন্নততর জীবনযাত্রায় সাহায্য করে।

হালের কিছু সাহিত্য-শিল্পীর ধারণা হলো বস্তুবাদী শিল্প সৃষ্টি করতে হলে 'অশ্লীলতা'র আশ্রয় অপরিহার্য। ঐসব শিল্পীর যুক্তি হল সমাজে যখন যৌন অপরাধ ক্রমবর্ধমান, বেশ্যাবৃত্তি চলছে পেটের দায়ে পুরোদমে, তখন তাকে শিল্পে সাহিত্যে রূপ দেওয়াই তো কাম্য। এ'প্রসঙ্গে বলতে হবে যে, যে সৃষ্টি সমাজে ভাঙন ধরায়। যে শিল্প মানসিক পরিপুষ্টির বদলে ফাটল ধরায় বেশি, সেই শিল্পকে আবাহন করার পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? পতিতা, বেশ্যা বা এদ'মায় কুড়িয়ে পাওয়া পরিচয়হীন শিশুকে তো আর সভ্যতার চূড়ান্ত মাত্রা

বলে মেনে নেওয়া যায় না। এটা কোন সংস্কৃত মন সংস্কৃত জাতির পরিচয় নয়। আর যে চিন্তাধারা সংস্কৃত নয় তাকে তো আর সভ্যতার গণ্ডীতেও ফেলা যায় না। যার ফলে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক জগত ক্রমশঃ এক দুষ্ট চক্রে আক্রান্ত হতে চলেছে।

এই শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশকে ইউরোপে যে ভয়াবহ আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল আজ আমাদের এই পুঁজিবাদীর দেশেও সেই ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, অর্থাৎ সংস্কৃতিকে পণ্য হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে, সভ্যতার মাধ্যম হিসাবে নয়। নারীর দেহকে বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ধনশালীর হাতে, মুনাফাখোরের হাতে নারী দেহের কোন মর্যাদা নেই। রাস্তায়, পথে-প্রান্তরে কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপানো হচ্ছে নগ্ন নারী দেহকে উপস্থাপন করে, উদ্দেশ্য ক্রেতার মনকে অধিকরূপে প্রলুব্ধ করা। কতকগুলো অশ্লীল চলচিত্র প্রদর্শনী 'প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য' বলে ঘোষণা করা হচ্ছে ডামাডোল বাজিয়ে। আর প্রতিফল দাঁড়াচ্ছে উক্ত চলচিত্র প্রদর্শনীতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের ভিড়, আর তারই প্রতিক্রিয়া যাচ্ছে সংক্রামক ব্যাধির মতো সমাজে ও রাষ্ট্রে। সীমাহীন দারিদ্র্য, সামাজিক অসাম্য, বেপরোয়া রীতিনীতি আজ আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়।

যুগ যে সমুখপানে এগিয়ে চলে। তাকে যেন ধনশালীরা স্বীকৃতি দিতে চাইছে না, ফেলে-আসা দিনে ফিরে যাবার সাধ ক্রমশঃ যেন বেড়ে চলেছে, যে সব দিন বহু যুগ আগে পিছনে ফেলে এসেছি, সেই সকল দিনের নগ্ন সজ্জা, রুচি, বেশভূষা আবার যেন লেখাপড়া জানা ব্যক্তিদের ঘাড়ে ব্যাধির মতো চেপে বসেছে। পুরুষ যেন তার পৌরুষ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ, কথিত আছে, "একটি মানুষকে চিনিতে পারা যায় তাহার পোষাক দেখিয়া" ; আবার কেউ কেউ বলে থাকেন, "একটা মানুকে চিনতে পারা যায় তাহার বন্ধুকে দেখিয়া।" উক্ত মন্তব্য দুটোই সত্য। পুরুষ যদি নারীর মত দীর্ঘকেশী হয়ে অলঙ্কারে সেজে থাকে তবে তো পৌরুষ হারানো স্বাভাবিক। সিনেমায়, নাটকে, যাত্রায়, পত্র-পত্রিকায়, কবিতায়, উপন্যাসে, নাচে, গানে, বিজ্ঞাপনে, পোষাকে, নাইট ক্লাবে—সব মিলিয়েই যেন এক 'অপসংস্কৃতি' নামক বিষয়টির স্থায়ী আসনের তোড়জোড় চলছে জোর কদমে। লেখাপড়া জানা প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক যখন রাতের অন্ধকারে টাকার বিনিময়ে নাইট ক্লাবে গিয়ে নারীর নগ্ন নৃত্য দেখতে অভ্যস্ত, এবং ঐ পরিবেশকে যিনি বন্ধু বলে স্বীকৃতি দেন তখনও কি তাকে

একটি সভ্য সমাজের সংস্কৃত ব্যক্তি বলতে হবে? আলেকজাণ্ডার ব্লক এদের উদ্দেশে বলেন,—

"পাপে নির্লজ্জ, হারানোতে নির্ভাবনা
হেলাফেলা রাত-দিনের গণনা,
এবং তারপর মদ খেয়ে মাথা ধরে যখন
জলজলে চোখে, ঈশ্বরের ঘরে যাও
চুপিচুপি।"

বহুযুগ পূর্বের শিল্পীর মতো আজকের শিল্পীকেও নগ্ন মানবমূর্তি দাঁড় করাতে হবে, এর কোন যৌক্তিকতা আছে কি?

হাজার হাজার বৎসর পূর্বের শিল্পীদের গড়া আদি মানবের নগ্ন মূর্তি, স্থাপত্য, ভাস্কর্যকে কি করে আজকের সভ্য সংস্কৃত সমাজের অনেকে সেটাকে স্থূল অর্থে গ্রহণ করছেন। যাদুঘরে এ'সব শিল্প দেখে ইতিহাসের প্রয়োজন মিটতে পারে, অবসর বিনোদন চলতে পারে, কিন্তু এগুলোকে অনুকরণ করে সমাজকে নতুন কিছু দান করা যায় না যার দ্বারা সভ্যতার সিঁড়িতে ওঠা যেতে পারে।

অপসংস্কৃতির হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে রাজনীতিকে অবলম্বন না করে গত্যন্তর নেই, কবি সুকান্ত তাঁর কাব্য শিল্পকে উৎসর্গ করেছিলেন সমাজের কাঠামো পরিবর্তনের জন্য। তার 'রাণার', 'আগ্নেয়গিরি', 'ছাড়পত্র' বিশ্বসাহিত্যে মর্যাদার আসনের দাবি রাখে, অথচ ঘনিষ্ঠ জনসংযোগ, পরিষ্কার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত এরূপ শিল্পকলা অসম্ভব। সুকান্ত তো খেটে খাওয়া মানুষের দরদী বন্ধু ছিলেন, তাই তিনি ঘোষণা করলেন:

"চলে যাব, তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল।
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে করে যাব আশীর্বাদ
তারপর হবো ইতিহাস।"

তাঁর এই কবিতাটি যে একটা শ্রেষ্ঠ শিল্প—এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের কারণ নেই।

অন্যায়, অবিচার, হীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করে নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের কথা চিন্তা করে নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যশিল্পে লিপিবদ্ধ করেছেন,

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ?—প্রলয় নূতন সৃজন বেদন
আসছে নবীন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন।"

রাজনীতি বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তো আর সমাজের বাইরের কোন বস্তু নয়। সমাজকে দুর্নীতি অত্যাচার থেকে মুক্ত করবার জন্যই শিল্প-সংস্কৃতি ও রাজনীতির প্রয়োজন।

ইতিহাসে বার বার দেখা গিয়েছে যে, জাতির মহাসঙ্কট ও দুর্গতির মুহূর্তেই সমাজকে বাঁচাবার জন্যে গড়ে ওঠে নাট্য আন্দোলন। ক্ষয়িষ্ণু মুমূর্ষু সমাজের সামনে এই নাট্য-আন্দোলন এক নতুন জীবনের আশা ও স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে। রঙ্গমঞ্চই সাংস্কৃতিক অগ্রগতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎস, সেদিক থেকে রঙ্গমঞ্চের এক বিরাট দায়িত্ব রয়েছে সমাজের কাছে। কৃষক, শ্রমিক ও উপেক্ষিত সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনের মধ্যে বাঁচবার ও সংগ্রাম করবার নতুন প্রেরণা খুঁজে পায়। শিল্পীরা যে আনন্দ ও রস সঞ্চার করেন, তাতে সমাজের চিত্ত আবার সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। কৃষক-জমিদার অথবা জোতদারের সংগ্রাম, এগুলোকে বর্তমানে নাটকের মধ্যে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা হচ্ছে। শুধু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের মুক্তির সুস্পষ্ট আভাসও এই নাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পাওয়া যায়। আজকের সমাজে প্রগতিমূলক ও সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শের যে প্রসার হয়েছে তার পেছনে আধুনিক গণনাট্য আন্দোলনের যে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে তা সব সময় স্মরণ রাখা উচিত।

সমাজের শৃঙ্খলা যদি শৃঙ্খল হয়ে ওঠে, সংস্কার যখন শাসনের রূপ ধারণ করে, তখনই শুরু হয় সমাজসত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সংঘাত। আর সংঘাতের রূপ প্রতিফলিত হচ্ছে আধুনিক কয়েকখানা উপন্যাস ও নাটকে। জীতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় নাটকেরও সেই সংঘাতের পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে। শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকখানি নাট্যমোদী জনগণের প্রশংসা অর্জন করেছে, বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা' নাটকে দেখেছি ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা। নিত্যকার সংগ্রামের ফলে তিল তিল করে তার অবলুপ্তি—এবিষয়গুলো যথাযথরূপে নাটকের মধ্যে বর্ণিত হবার ফলে দর্শকদের হৃদয়ে এর আবেদন স্বতঃস্ফূর্ত। মন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট' চমৎকারভাবে নাটকীয় কৌতূহল ও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। শ্রমিকদের সংঘশক্তি ভেঙে ফেলবার জন্য মালিকরা কিভাবে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাধিয়ে দেয়, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উক্ত নাট্যকাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' সমাজে

এক বিরাট উপহার। এই নাটকের মধ্য দিয়েই নাট্য আন্দোলন দেশের বৈপ্লবিক গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং এতেই সর্বপ্রথম মঞ্চ আঙ্গিকের প্রচলিত সংস্কার বর্জন করে আলোকসম্পাত ও শব্দ ক্ষেপণের নানা কলাকৌশল অবলম্বনে দৃশ্য পরিবেশ ও ভাব-পরিবেশ গঠনের চেষ্টা দেখা গেছে। সমাজ জীবনের শোচনীয় বিপর্যয়, প্রচলিত জীবন মূল্যবোধের পরিবর্তন, পুরাতন জীবনের ভাঙ্গন ও নবজীবনের স্বপ্ন নাটকটির মধ্যে বাস্তব সত্যের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মানুষের জীবন সুন্দর ও সুখী হতে পারে যদি বর্তমান সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই লক্ষ্যে পৌছোনোর সংগ্রামে শিল্পীর কাজই হচ্ছে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করা। ঐ পথ ধরে অগ্রসর হলেই ব্যক্তি-চরিত্র সংস্কৃত হতে পারে, সাংস্কৃতিক মান উচ্চশিখরে পদার্পণ করতে পারে। মানুষ মিলে-মিশে বাস করে যেদিন সামগ্রিক কল্যাণের মধ্যে নিজের কল্যাণের মন্ত্র খুঁজে পাবে, সেদিন থেকেই হবে সভ্যতার সূত্রপাত ও অগ্রগতি। সমাজবোধই তাদের সকল উন্নতির প্রাণশক্তি, সকল উৎকর্ষের মূল উৎস।

সমস্ত রকম শিল্প-সংস্কৃতির অগ্রগতির পেছনেই অর্থনীতি মূল নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে, যার ওপর গোটা সমাজ ও জাতি নির্ভরশীল, সুতরাং রাজনীতিকে অবলম্বন করা নিতান্তই প্রয়োজন।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কর্মীদের ভূমিকা

সম্প্রতি কতক স্বার্থান্বেষী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও কুসংস্কার দ্বারা সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে জর্জরিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে, স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রচেষ্টা চলছে যুবমনে স্বৈরতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করা এবং সুস্থ সমাজের বুকে ফাটল ধরাবার প্রাণান্তকর প্রয়াস।

চতুষ্পার্শ্বের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক তৎপরতা, জনগণকে অধিকারবোধে সচেতন করে তাদের মনের খোরাক যোগানো, তাদের হাসি কান্নাকে কলমের মুখে তুলে ধরাই আজকের শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি কর্মীদের প্রধান দায়িত্ব। শিল্প-সংস্কৃতির প্রধান উপজীব্য মানুষ ও সমাজ, দেশের আপামর শোষিত জনসাধারণই ঐ সমাজের মেরুদণ্ড। শিল্পী বা সংস্কৃতি কর্মীদের এটা ভুললে চলবে না যে, সমাজের নির্দেশকে, প্রয়োজনকে অবহেলা করা উচিত নয়। মানুষের জীবন সুন্দর ও সুখী করতে হলে চক্রান্তকারীদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নামক চক্রান্তকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে। এই ধরনের সমাজ সচেতনতা, জনদরদই হল শিল্প-সংস্কৃতির প্রাণশক্তি, সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রগতিবাদী শিল্পী-সাহিত্যিককে সোচ্চার হতে হবে। শিল্প-সাহিত্যের মধ্যেই একটা দেশের, একটা সমাজের প্রকৃত ছবি ফুটে ওঠে, কাজেই সেই ছবিকেও তো কিছুতেই চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত দ্বারা কলুষিত করতে দেওয়া যেতে পারে না। প্রকৃত শিল্পীর লক্ষ্য হ'লে জনগণকে সঠিক পথে পরিচালনা করা। সাংস্কৃতিক চেতনায়, নাগরিক চেতনায়, মমত্ববোধে জনগণকে জাগ্রত করতে হলে শিল্পী-সাহিত্যিককে হতে হবে সমাজসচেতন।

একটা জাতি, একটা সমাজ বা একটা দেশকে সভ্যতার সোপানে উন্নীত করতে হলে শিল্পী-সাহিত্যিককে গুরু দায়িত্ব বহন করতে হয়। শিল্পী-সাহিত্যিকের এটা মৌলিক দায়িত্ব বললে ভুল হয় না,—যে দায়িত্ব পালনে সামান্য মাত্র বিচ্যুতি ঘটলেও বহুল পরিমাণে খেসারত দিতে হয় জনগণকে, শিল্পী-সাহিত্যিকের সমগ্র প্রচেষ্টা তখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মিথ্যার

বেসাতি, জনদরদের অভিনয় করে কখনই 'প্রগতি' নামক শুভ উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করতে পারে না, যার ফলশ্রুতি হিসেবে ফাঁক ফোঁকর দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ উঁকি-ঝুঁকি দেয়, সুযোগ বুঝে ডাল-পালা বিস্তার করে, ক্রমে মহীরুহের আকার ধারণ করে।

আজ সেই মুহূর্ত উপস্থিত যখন শিল্পী-সাহিত্যিক সম্মিলিতভাবে শপথ গ্রহণ করবেন সমস্ত রকম অত্যাচারের বিরুদ্ধে, মুখর হয়ে উঠবেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সোচ্চার হবেন সাম্প্রদায়িক বিরোধিতা ও স্বৈরতান্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে, লেখনী হয়ে উঠবে গর্জনমুখর। প্রকৃত শিল্পের মূল লক্ষ্যই হলো জনগণের আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্খা, সঙ্কট ও সমস্যাকে রূপায়িত করা।

সাম্প্রদায়িক বিরোধ ঝগড়া বাধে সাধারণত মন্দির-মসজিদ-গীর্জা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের গোঁড়ামি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রধান কারণ হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার ইতিমধ্যে যে কয়টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে গেল, তার একটিও আসলে ধর্মবিরোধ নয়,—সবগুলোই চক্রান্তকারীদের সৃষ্ট চক্রান্ত। আর এস এস, জামাত-ই-ইসলাম প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকারীরা আনন্দ-মার্গী, 'আমরা বাঙালী'-র মুখোশ ধারণ করে বাংলার বুকে কলঙ্ক লেপনে সামান্যমাত্রও দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। তাইতো তারা এক হাতে নরমুণ্ড অন্য হাতে লাঠি ছোরা ইত্যাদি অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে জনগণকে 'শায়েস্তা' করার, বিভ্রান্ত করার জন্য শ্লোগান দিতে থাকে উদ্ভট অঙ্গভঙ্গি করে। সমাজে একটা ভাঙন ধরানো, মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে—জনগণকে বিপথগামী করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্য চরিতার্থ হলে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনা যাবে, কবির ভাষায় গেরুয়া বসনধারী 'আনন্দমার্গী নামক চক্রান্তকারীদের উদ্দেশ্যে বলা যেতে পারে,—

"…ধুনি জেলে হাততালি দিচ্ছে উদোম ন্যাংটো কিচেল সন্ন্যাসী, আর চারিদিক থেকে যৌথ জয়ধ্বনি উঠছে 'আহা বেশ! বেশ!!"

এই রক্ত পিশাচের দল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে নিরপরাধ জীবনগুলোকে পৃথিবী থেকে চিরতরে ছিনিয়ে নিতে সামান্যমাত্রও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কর্মীদের দায়িত্ব হলো জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়া যে পৃথিবীতে হিন্দু-মুসলমান ধর্মাধর্ম বলে কিছু নেই, শুধু দুটি জাতই আছে শাসক এবং শোষিত।

বিভিন্ন ধরনের অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ,

ভ্রাতৃসংঘাত ইত্যাদি নানাবিধ দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির মহড়া চলে রাতের অন্ধকারে। শিল্পী-সাহিত্যিকের কর্তব্য হলো এই সমস্ত অশুভ আচরণের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা যাতে জনগণ বিভ্রান্ত না হয়, সঠিক পথের সন্ধান পায়।

বলিষ্ঠ চিন্তাধারা ও সুবিচার শক্তির দ্বারা যোগ্য বিষয় নির্বাচন করতে হবে, যাতে দেশবাসী আশার আলো দেখতে পায়, ভুলভ্রান্তির যেন কোন অবকাশ না থাকে। হাটে-মাঠে, গ্রামে-গঞ্জে ঘরে ঘরে চাই তার একনিষ্ঠ প্রস্তুতি, আর তার জন্য সাহিত্যিক-শিল্পী কৌতুকরসিক ও সংস্কৃতি কর্মীদের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, মনে রাখা দরকার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে, জাতীয় সংহতির সপক্ষে দাঁড়াবার জন্য বহু কঠিন, দুর্বোধ্য ও জটিলতম ব্যাপারকেও প্রাণবন্ত ও সহজতর করে তুলে ধরে জনগণকে শ্রেষ্ঠ পথের সন্ধান দেওয়াই শিল্পী-সাহিত্যিকের দায়িত্ব। শ্রেষ্ঠ সংহতির সপক্ষে সৃষ্ট শিল্পরসই তো শ্রেষ্ঠতম শিল্প ও জনগণের মনের অন্তরতম আকুতিরও পরিচয়বাহী আর তাতেই জনগণের দিশেহারা অবস্থা কেটে যায় অতি সহজেই।

গণতান্ত্রিক শিবিরের শিল্পী-সাহিত্যিকরা মনে করেন শিল্প হল অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতা-বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য হাতের শাণিত অস্ত্র, জাগতিক বিপ্লবের পথ, যে বিপ্লব মানুষের জীবন থেকে দূর করে দেয় সর্বপ্রকারের অসাম্যের প্রাপ্য। মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে শ্রেণীহীন সমাজে এবং বিশ্বাস করেন শিল্প "বিশ্বাতীতের আভাস নয়, বিপ্লবের বহ্নি।"

শিল্পের প্রধান উপজীব্য তো মানুষ, কাজেই মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, শ্রেণীবিভেদ, ধর্মের নামে অস্পৃশ্যতা, বিচ্ছিন্নতা, সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে শ্রেষ্ঠ শিল্প হতে পারে না। শ্রেণীহীন, বিভেদহীন, সংহতিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা দ্বারাই শিল্প-সংস্কৃতির সম্ভার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাই সুস্থ সমাজের বাঞ্ছনীয় ও একান্ত কাম্য যা উত্তরকালের নিকট হয়ে উঠবে মূল্যবান উপহার। সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে কবিকে বলতে হবে—

"সেই উজ্জ্বল অরণ্য পাহাড়ের সামনে
বিশাল চলমান মিছিলে পথ ভাসতে ভাসতে
উত্তরকালকে প্রসন্ন সম্ভাষণ জানাবো।
জমাট অন্ধকারের অতল থেকে, তুলে আনবো সবুজ সকাল
নিরন্তর অন্বেষণে পা রাখি আরও দূর পথে।"

(অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়)

বিভেদপন্থার বিরুদ্ধে প্রগতি শিবিরের শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃষ্ট শিল্প হচ্ছে সংগ্রামের হাতিয়ার, কখনও শ্রেষ্ঠ পথের দিশারী, কখনও বা অঙ্কুরিত চেতনা শিল্পের রসসিঞ্চনে মহীরুহের আকার ধারণ করে।

সুদীর্ঘ দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য রয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বেই অবিভক্ত বাংলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কূটনীতি 'ডিভাইড এণ্ড রুল'-এর বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান জনগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছে কংগ্রেসী শাসক গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের বিরুদ্ধে। বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আজকের পশ্চিমবাংলার জনগণ যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করেছে, তাকে রক্ষা করবার জন্য তারা সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করবে সর্বস্তরের সংগ্রামী মানুষ, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ। সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব শিল্পী-সাহিত্যিক সংস্কৃতি কর্মীদের, সমবেত কণ্ঠে আজ আকাশ-বাতাস মথিত করে তাঁদের বলতে হবে :

"আজ আগিয়ে যাওয়ার দিন সাথী।
আগিয়ে যাওয়ার দিন।
জোরে, আরও জোরে
আরও দ্রুত এসে মিছিলে জমায়েত হও,
বাস্তিলের ধ্বংসস্তূপে আমাদের
মানুষের চিরপরিচিত মুক্তির পতাকা তুলতে হবেই হবে
স্থির প্রতিজ্ঞায়।"

প্রকাশিত : একসাথে শ্রাবণ, ১৩৮৬

অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে মহিলাদের দায়িত্ব ও ভূমিকা

যুগ যুগ ধরে এক এক ধাপ করে মানুষ সভ্যতা-সংস্কৃতির পথে এগিয়ে চলেছিল কিন্তু মহাযুদ্ধের কাল থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে মানুষের যেন অপ-সংস্কৃতির প্রতি এটা স্বাভাবিক প্রবণতা ও সুযোগ বুঝে তারই মহড়া, ব্যাপারটি হাল আমলে বটবৃক্ষের মতো শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ফেলেছে ওপরে ও মাটির গভীর তলদেশে।

সমাজের অর্ধেকভাগ নারী—আর শুধু অর্ধেকই নয়—নারীই জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—তার ভূমিকা হলো জননী-স্ত্রী-ভগ্নী-কন্যারূপে, স্নেহ-মায়া মমতা ভালবাসার পরিপূর্ণ প্রতিমূর্তি হিসেবে, যার সুফল ফলতে পারে ব্যক্তিজীবন থেকে পারিবারিক জীবন ও সমাজ জীবন পর্যন্ত, কাজেই সংস্কৃত জীবনযাত্রায় নারীর দায়িত্ব অনেকখানি কিন্তু বর্তমান সমাজ-কাঠামোতে অনেকটা পরিমাণেই নারী সেই দায়িত্ব পালনে অপারগ, আর তার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব ও নিরক্ষরতার অভিশাপ, নারীর যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকে ও শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকে তাহলে স্বভাবতই সমাজসচেতনতায় জাগ্রত হয়ে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতা বুঝতে পারে অপসংস্কৃতির করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পায় পারিবারিক জীবন সুন্দর হয়, সমাজের অগ্রগতি ঘটে সুস্থ চিন্তার পথ ধরে, শোষণ মুক্তির পথেই আসে নারীর সামাজিক মুক্তি এবং গড়ে উঠতে পারে শিল্প-সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ।

ধনতান্ত্রিক সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীবিভক্ত বুর্জোয়া কাঠামোতে নারী ভোগ্যপণ্য সমস্ত রকম অধিকার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত—স্বাভাবিকভাবেই চলার পথ সেভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে—অথচ সমগ্র নারী সমাজের সচেতন থাকা দরকার যে, নারীরও সামাজিক মূল্যায়ন মানুষ হিসেবেই, সেও পুরুষের মতই সমান অধিকার ও সমান মর্যাদার যোগ্য, ভোগ্য পণ্য নয়—মহিলারা এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হলে সুস্থ সংস্কৃতির পথ সুগম হতে পারে না।

সুস্থ সংস্কৃতির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন নারীত্বের পূর্ণ মর্যাদা। অপসংস্কৃতির মূলে রয়েছে নারীত্বের অবমাননা, যার ফলে সমাজ একপ্রকার অশ্লীল কাঠামোর

ওপর কালাতিপাত করে। মেয়েরা মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ে, সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হয় না, ন্যায়-অন্যায় বিচারশক্তি থাকে না, আর তাই এখনও নারী সমাজ চরম বঞ্চনা আর অবহেলায় মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে, সুস্থ সংস্কৃতির পথ অবরুদ্ধপ্রায় অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই। কাজেই নারী জাতিকেই সচেতনতাবোধে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে সর্বাগ্রে।

নগ্ন সাজ-সজ্জা, কুরুচি, ঔদ্ধত্যপূর্ণ বেশভূষা ইত্যাদি হাল আমলের লেখাপড়াজানা বেশ কিছু সংখ্যক মহিলাদের যেন গ্রাস করে নিচ্ছে,—আর খেসারত দিচ্ছে পুরো সমাজ, উত্তরসূরীরা আর বিত্তহীন মেয়েরাও অন্ধভাবে সেগুলোকে নকল করছে নেশাখোরের মতো, নগ্ন ও উগ্র সাজসজ্জা দ্বারা পুরুষকে প্রলুব্ধ করবার প্রচেষ্টাই থাকে। পুরাকালে মেয়েরা পুরুষদের মতই গাছের ছাল-চামড়া পরিধান করত, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কাপড় পরতে শুরু করে কারণ নগ্নতাকে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টার মধ্যে আছে সভ্যতার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ অর্ধে দাঁড়িয়েও যদি নগ্নতাকেই তুলে ধরা হয় তাহলে তাকে অপসংস্কৃতি ব্যতীত কি বলা যেতে পারে? কিছু কিছু সিনেমায়, নাটকে, যাত্রায়, অভিনয়ে, পত্র-পত্রিকায়, সাহিত্যে, নাচে-গানে, বিজ্ঞাপনে নাইট ক্লাবে মহিলাদের দেখা যায় নেশাখোরের মত নিজের নগ্নতাকে জনগণের সামনে তুলে ধরার ভয়াবহ উল্লাস। যে উল্লাসের মধ্যে কোথাও কোন শিল্প-সংস্কৃতির ছিটেফোঁটা রূপ নেই—আছে অপসংস্কৃতির করাল গ্রাসে ডুবে যাবার এক উন্মাদনা। এই উন্মাদনা থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, সচেতনতাবোধে জাগ্রত হওয়া, নৈতিক মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা, তাহলেই এই সমাজের কলুষমুক্তি সম্ভব। শাসকগোষ্ঠী দেশের জনগণকে বিশেষত মেয়েদের এমন এক নেশার ঘোরে আটকে রাখতে চায় যাতে তাদের মেরুদণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। সামাজিক অবস্থার কথা তারা চিন্তা না করতে পারে, নারী দেহসজ্জ, যৌন উত্তেজক পোষাকের বাড়াবাড়ি চলতে পারে অবাধে কিন্তু মহিলারা যদি সচেতন থাকেন তাহলে শাসকগোষ্ঠীকেও পরাভূত করা সম্ভব এবং অপসংস্কৃতির বিলোপ ঘটানো সহজতর হতে পারে।

বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কোন কোন ব্যবসায়ী নগ্ন নারীদেহের চিত্র সর্বজনসমক্ষে বিভিন্ন কায়দায় উপস্থাপন করে মুনাফা লুটে নিতে চান,—উদ্দেশ্য ক্রেতাকে অধিকতর পরিমাণে বিজ্ঞাপিত বস্তুটি ক্রয় করতে প্রলুব্ধ করা। কতক মহিলা দারিদ্র্যের জ্বালায় অনন্যোপায় হয়ে

পতিতাবৃত্তি বা বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হন, ব্যবসায়ীদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে যান। কিন্তু মহিলাদের এটা বোঝা দরকার যে, জীবিকা অর্জনের উপায় এটা নয়—এটা ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থার বিষময় দিক, যা নাকি সুস্থ সংস্কৃতির অন্তরায়, সমগ্র নারী সমাজেরই এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হতে হবে, সুস্থভাবে জীবন যাপন করে কিভাবে আর্থিক সংকট কাটিয়ে ওঠা যায় সেটা ভাবতে হবে বিভিন্ন আলোচনা, মিছিল মিটিং ইত্যাদির মাধ্যমে।

নারী ও সুরাকে একই অর্থে একই আসরে ব্যবহার করা অপসংস্কৃতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, 'প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য' ডামাডোল বাজিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করে দেখানো হয় অশ্লীল নোংরা চলচ্চিত্র। অভিনীত হয় 'বারাঙ্গনা', 'বারবধূ', 'সম্রাট ও সুন্দরী', 'বিবর', 'প্রজাপতি' ইত্যাদি। বেশ কিছু সংখ্যক মহিলারা ভীড় করে এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনীগুলিতে—এক নিঃশ্বাসে গ্রাস করে অশ্লীল বইগুলো, হোটেলে ক্যাবারে নারীর নগ্ন ট্যুইস্ট প্রদর্শনীর দ্বারা নারীত্বের অবমাননা করা হয়,—তারা জানেও না তারা কোন ফাঁকে অপ-সংস্কৃতি নামক ব্যাধির কবলে আবদ্ধ হচ্ছেন—আর তার ফলে দেখা গেল তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-সন্ততিও লুকিয়ে একই কাজ করে চলেছে। এভাবেই একটা দেশ একটা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। অবশ্য দেশে দারিদ্রের চরম পরাকাষ্ঠা সামাজিক অসাম্যই জীবনকে যেমন খুশি চালিয়ে নিয়ে যাবার প্রবৃত্তিকে উস্কানি দেয়।

অফিসে চাকুরীজীবী কতক মহিলার ধারণা হলো চাকরি করতে যখন এসেছেন তখন আর সুন্দর শোভন—এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। যেমন খুশি স্থূল রসিকতা, অশ্লীল গালগল্প, উদ্ভট সাজ-সজ্জায় তারা মশগুল থাকেন, অথচ এসবই সংস্কৃতির পরিপন্থী। মহিলাদের দায়িত্ব হলো তারা যাতে কোন অবস্থাতেই অপসংস্কৃতির বলি না হন, নারীত্বের মর্যাদাহানি না হয়—এ বিষয়ে সচেতন থাকা।

একটি শিশুর জীবনও সংস্কৃতির আওতার বাইরে নয়, শিশুটির জীবন প্রধানত গড়ে ওঠে মা-মাসি-পিসি-ঠাকুমা-দিদিমার স্নেহছায়ায়, চারিত্রিক বিকাশও হয় সেই পথ ধরেই, কখনও দেখা যায় মায়েদের স্নেহে আদরে শিশু অন্যায় কাজে প্রলুব্ধ হচ্ছে, অন্যায় আচরণে দ্বিধাহীন, অপরের দ্রব্যে লোভ ও লালসা এবং নিজেকে বিরাট কিছু ভাবতে আরম্ভ করেছে, মায়েদের বোঝা দরকার অতি সামান্য হলেও যে কোন অন্যায় অশুভ ও কুচিন্তার মধ্যেই অপ-

সংস্কৃতির বীজ সুপ্ত থাকে ; বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়ের প্রতি লোভও বৃদ্ধি পাবে, অশ্লীলতার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকবে, অন্যায়ের শেকড় হয়তো তখন চলে যায় অনেক গভীরে, তখন আর তার মূলোৎপাটন সহজ ব্যাপার তো নয়ই উপরন্তু চারপাশের আরও অনেকেই সেই ভাবে আটকা পড়ে। রাস্তাঘাটে কোন কোন মহিলাকে গর্বভরে বলতে শোনা যায়,—"আমার বাচ্চাটা কাউকে কেয়ারই করে না, পছন্দ না হলে মুখের ওপরেই বলে দেবে—'আমি পারব না', তার অমতে কেউ কিছু করতে পারবে না।" হাস্যাস্পদ হলো যে, এঁরা ভুলে যান—'শিশু মাত্রই অবোধ'—ন্যায়-অন্যায়ের সে কতটুকু বোঝে? মায়েদের দায়িত্ব হলো পরিমার্জিত ও পরিশীলিত পথ ধরেই সৌজন্যমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে শিশুর জীবন বিকাশে সাহায্য করা। স্বাভাবিক গতিতেই জীবন সংস্কৃত হয়ে উঠবে। তা না হলে প্রথমে খেসারত দিতে হয় মা-বাবাকে পরিবারকে তারপরে সমাজকে ও দেশকে।

শিশুরা মায়েদের পারিবারিক চলাফেরা, সামাজিকতা, পোষাক-পরিচ্ছদ, গাল-মন্দ সবকিছুর প্রতিই খুব বেশি লক্ষ্য রাখে, নকল করে, মায়ের সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কেমন সম্পর্ক সেটা শিশুরা খুব ভালভাবেই বুঝতে চেষ্টা করে। পারিবারিক জীবনে মায়েদের কুরুচিপূর্ণ মনোভাব, বৈষম্যমূলক আচরণ, পরিবারের প্রত্যেককে যথোচিত মর্যাদা না দেওয়া শিশুমনে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একজন উচ্চশিক্ষিতা আধুনিকতম সাজ-সজ্জায় অভ্যস্ত চাকুরীজীবী মহিলাকে বলতে শোনা গেল "বাড়িতে একগাদা লোক, ঠাকুর-চাকর যা রান্না করে বাচ্চা-বুড়ো সকলে তাই আনন্দে খেতে থাকে। আমি ঘরে ঢুকে কাপড়-জামা পাল্‌টে কারুর দিকে না তাকিয়ে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে আমার ছেলেটার জন্য আলাদা রান্না করে ওকে খাইয়ে দিই তবে আমার শান্তি। আমার ৬।৭ বছরের ছেলে কি আর গড়ের রান্না খেতে পারে?" স্নেহান্ধ মহিলাটি শুধু যে পৃথকীকরণের দ্বারা সঙ্কীর্ণ মানসিকতার পরিচয়ই দিলেন তাই নয়—বাড়ির অন্যান্য বাচ্চাদের কাছ থেকে সে ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগলো, পরিবারে আর খাপ খাওয়াতে পারলো না। জীবনটা বিষময় হয়ে উঠলো। শিশুটি শিখলো শুধু এটাই যে, আমিই পরিবারে প্রধান আমার সমতুল্য কেউ নয়। যা 'সু' নয়, 'শুভ' নয়—তাতো সংস্কৃতিও নয়, কাজেই মায়েদের এসব ব্যাপারে যথেষ্ট হুঁসিয়ার হওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায় বলেছেন,—"সমাজে নারীদের মাতৃজাতি হিসাবেও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে,

সে ভূমিকা দাসীর নয়, জননীর।—ছেলে-মেয়েদের উপর মায়েদের সেই প্রভাব ফেলতে হবে যা তাদের সুস্থ জীবনবোধ জাগাতে পারে, মানবিক মূল্যবোধ শেখাতে পারে, অপসংস্কৃতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

সংস্কৃত জীবন যাত্রার জন্য এবং শিশু শিক্ষার জন্য ভিয়েতনামে চাচা হোর পাঁচটি শিক্ষানীতি মহিলাদেরও স্মরণযোগ্য। এই পাঁচটি শিক্ষা নীতি হলো: (১) নিজের দেশ ও নিজের জনগণকে ভালোবাসো। (২) ভালভাবে পড়াশুনা ও ভালভাবে কাজ করো। (৩) ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল হও। (৪) স্বাস্থ্য বিধি করো। (৫) বিনয়ী, দৃঢ়চেতা ও সাহসী হও। মহিলাদের সমাজের পরিচয় মানতে সচেষ্ট হওয়া দরকার, গণিতের সংখ্যা শুধু চিনলে হবে না—চিনতে দিতে হবে সমাজের শত্রুকে, শ্রেণীশত্রুকে, তাহলে আপনা থেকেই সংস্কৃতির পথ সুগম হবে।

শিক্ষা প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু হল শিক্ষার্থী নিজে, অন্য কেউ বা কিছু নয়। যে শিক্ষা শিশুকে তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে শেখায় না, সেটাকে শিক্ষা বলবার কোন কারণ নেই। হালের কিছু কিছু মায়েরা সমাজের ওপর মহলে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য শিশুদেরকে পরিবেশ থেকে বিচ্যুত করে তৈরি করেন—ইংরেজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে শিশুকে পড়াবার জন্য মায়েদের কিরকম প্রাণান্ত চেষ্টা; শিক্ষাশেষে দেখা গেল শিক্ষার্থী পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অপারগ, মাতৃভাষায় অনাগ্রহী, সমাজের প্রতি উদাসীন ও উন্নাসিক। আর এই আবহাওয়া দেশের আবহাওয়াকেও দূষিত করে তুলছে। উচ্চবিত্ত পরিবারের মায়েরা যেন চ্যালেঞ্জ নিয়েই এসে দাঁড়ান কোন প্রকারে অন্তত একটি সন্তানকে বিদেশী কায়দায় শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করে গড়ে তুলতে। দেশ স্বাধীন হওয়ার দীর্ঘকাল পরেও এঁদের মন এখনও দাসত্বসুলভ। পথে-ঘাটে কোন কোন মহিলাকে আক্ষেপ করে বলতে শোনা যায়,—"মেয়েটাকে এত কষ্ট করে কনভেন্টে পড়াচ্ছি কিন্তু পাড়ার বাংলা মিডিয়াম স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব আর ওদের কাছ থেকে বাংলা গল্পের বই এনে পড়বে—আমার এত বাজে লাগে যে কি বলব!" যে শিক্ষার্থীটি শিখে উঠলো মাতৃভাষার ও স্বদেশীদের অবজ্ঞা ও অবহেলা দেখানোই কৃতিত্ব, তার জীবন কখনও সংস্কৃত হবে এটা আশা করা বৃথা।

উৎসবাদিতে যুবক-যুবতীদের উদ্দামতা রোধ করতে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা দরকার। পুজোর সময়ে দেব-দেবীর আবাহনে বিসর্জনে

তরুণ-তরুণীর টুইষ্ট নাচ, উদ্দামতা, হাল্কা ফুর্তি-আনন্দে গা ভাসিয়ে দেওয়া—মারপিট করে ধাক্কাধাক্কি করে ও ভীড় ঠেলে পুজো মণ্ডপে গিয়ে একটি প্রণামের পাট সেরে নানারকম কুরুচিপূর্ণ আলাপে নেশায় মশগুল হওয়া, সাজ-সজ্জার উগ্রতার দ্বারা প্রলুব্ধ করার চেষ্টা—এই ধরনের বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে সংস্কৃতির কোন পরিচয় নেই, উৎসবের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো সুস্থ সুন্দর শোভনতার দিক—যা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্দ্বিধায় সুন্দর ভাবেই উপভোগ করতে পারে। তাহলে চাঁদার জুলুমবাজিও অনেকটা কমবে। মহিলারা যদি সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে ভাবেন—তাহলে সেটা অনেকটাই সম্ভব।

পণ-প্রথার বলি হচ্ছেন প্রতিবছর বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা। শ্বশুরবাড়ীতে কেউ বা নির্যাতিতা হন সারা জীবন ধরে, কেউ বা প্রায়শ্চিত্ত করেন আত্মহত্যার দ্বারা। এই অবস্থা থেকেও অন্ততঃ কিছুটা মুক্তি সম্ভব এই সমাজ কাঠামোতেই, যদি মহিলারা নিজেরা আত্মসম্মান সম্পর্কে সচেতন হন। যদিও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ না হলে এই সম্মানবোধ বজায় রাখা কঠিন তথাপি এই প্রথাগুলোর থেকে মুক্তির জন্যই সঙ্ঘবদ্ধভাবে মহিলাদের একত্রিত হয়ে অভিযান, আলোচনা-আন্দোলন করা দরকার বেশি বেশি করে। পণ প্রথা অপসংস্কৃতির একটা বিষময় দিক।

সংস্কৃত সমাজ কাঠামো গড়ে তোলার জন্য সংঘবদ্ধভাবে সমগ্র নারী সমাজের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে আসা দরকার।

"এমন সমাজ আমাদের চাই যেখানে প্রতিটি মানুষ হবে শিল্পী ; ভালোবাসবে এবং ভালোবাসা পাবে। আর সেখানেই হবে বাস্তব সত্যের প্রকাশ।"—(কার্ল মার্কস)। কার্লমার্কসের এই সত্যনিষ্ঠ অভিমতকে মেনে নিয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সমাজ, মানুষ, শিল্প ও ভালবাসা—কোনো কিছুই একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, আর এঁরা যদি মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ হয়, স্বাভাবিকভাবেই সুন্দর সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে।

প্রকৃত শিল্পী সাহিত্যিকের প্রথম পরিচয় একজন পরিশীলিত, সংস্কৃত জনদরদী মানুষ হিসেবে, যা যুগোপযোগী চিন্তাভাবনার গতিপথেই তাকে পেঁাছে দেয় সুনাগরিকত্বে, সংগ্রামী মানুষের সাথী হয়ে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে, আর সেই সংগ্রামী ফসল বা সৃষ্টি সম্ভার হয়ে ওঠে সমাজের দর্পণ, কালের দর্পণ, যুগের প্রতিচ্ছবি হিসেবে। ঐ প্রসঙ্গে বেলিনিস্কের ভাষায় বলা যায়,—"The Poet is first all a man and then a citizen of his land and son of his times." সেই মানবিক আবেদন নিয়েই প্রবীণ ও নবীন লেখক শিল্পী-সাহিত্যিক-দের দায়িত্ব হচ্ছে ছাত্র-যুবকে সঙ্গে নিয়ে সংগ্রামী আদর্শের মঞ্চে এসে দাঁড়ানো শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্য।

দেশের অধিকসংখ্যক মানুষ যদি লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও শোষিত হয়, তাহলে প্রকৃত শিল্পে বা সাহিত্যে তার প্রতিফলন তো একান্তই কাম্য অর্থাৎ শিল্পী বা রূপকার তো তাদের জীবনকে কেন্দ্র করেই তাঁর সৃষ্টির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে তুলবেন। যাকে লেনিন বলেছেন, কমিউনিস্ট পার্টির 'চাকা ও চাবি' (a Cog and Screw)। সাহিত্যে বা শিল্পে সমাজের পরিপূর্ণ রূপ বা চিত্র থাকলে, শিল্প-সাহিত্যের মানদণ্ডেই সেটা উন্নত। শিল্পী-সাহিত্যিকের দায়িত্ব যুবসমাজকে এটা অবহিত করা।

বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মানুষ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় বাস করছেন এবং অবশ্যই সেই সমাজ সুস্থ সুন্দর ও সংস্কৃত ; যেখানে পুরুষ নারী নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনার কোন

প্রশ্ন সেখানে নেই, সমাজের তরুণগোষ্ঠী যাতে সেই সমাজ গড়ে তোলার পথে বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্য লেখক-শিল্পীদের নৈতিক দায়িত্ব অনেকখানি। কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধিগুলোকে দূরে সরিয়ে শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষ ও শোষিত নারীসমাজের মুক্তির জন্য যাতে যুব সম্প্রদায় সংগ্রামী মঞ্চে এসে দাঁড়াতে পারে তার জন্য প্রয়োজন সুস্থ সাংস্কৃতিক খোরাক তাদের সামনে তুলে ধরা। বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সঠিক প্রচার, গ্রহণ ও পরিচালনার দায়িত্ব নেবার মত যোগ্যতা অর্জনও যাতে তারা করতে পারে সেই সম্পর্কে লেখক শিল্পী-সংস্কৃতি কর্মীদের ভূমিকা সঠিক পথ নির্দেশ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে আন্তর্জাতিক যুববর্ষ উদ্‌যাপন (১৯৮৫) সংক্রান্ত কমিশনের চেয়ারম্যান গেইদার আলিয়েভ সপ্তাহিক 'মস্কো নিউজ' পত্রিকার ভাষাকার আলেকজান্দার গুবের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন: "সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে নবীন প্রজন্মকে আরো বেশি সক্রিয় করে তোলা এবং মানবজাতি যে সব সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জীব পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন সেগুলির সমাধানে তাদের অবদান বাড়ানো, বিশেষ করে শান্তি, সমঝোতা ও সহযোগিতার জন্য সংগ্রামে নবীন বয়সীদের ভূমিকা বাড়ানো প্রয়োজন।"

বর্তমান অবক্ষয়ী সমাজে যুবক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ করছে বেকারী, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি, পারমাণবিক অস্ত্রের ঝনঝনানি, সাম্রাজ্যবাদী হুঙ্কার, ফ্যাসিবাদের ছায়া গ্রাস করবার জন্য উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, মধ্যবিত্তরা বেঁচে থাকার সংগ্রামে দিশেহারা, মজুর কৃষক ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, আর তাই আজ সচেতন, তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক প্রতি মুহূর্তেই উপলব্ধি করছে সমাজের যন্ত্রণা, তাদের সৃষ্টি কর্মেও সেই যন্ত্রণা, সংগ্রাম, নিপীড়িত মানুষের জয় ঘোষণা তাদের কলমের মুখে, তুলির টানে ফুটে উঠছে, যদিও তা কখনও প্রচ্ছন্ন—এমন পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীদের দায়িত্ব হলো যাতে তরুণ লেখক-শিল্পীরা দিক ভ্রষ্ট না হয়, বিভ্রান্তে না হয়—সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে এবং তরুণদের একতার সূত্রে গ্রথিত হওয়ার পক্ষে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা যথেষ্ট। তরুণ চিন্তা ভাবনাকে বিকশিত করার শ্রেষ্ঠ সুযোগ হলো লিটল ম্যাগাজিন। লিটল্ ম্যাগাজিন যদি সুস্থ চিন্তা ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়, ক্ষয়িষ্ণু সমাজের নিকট সেটা অবশ্যই আশার আলো।

ভাববার বিষয় হলো, সমাজের মন্দ দিকটার খপ্পরে পড়ে অল্প বয়সের

ছেলেমেয়েরাই সবচেয়ে বেশি। খারাপ জিনিসের আস্তাকুঁড়ের মধ্যে পড়ে যাওয়া সহজ, ভাল বুঝতে হলে বা জানতে হলে নিষ্ঠার সঙ্গে অবিচল থেকে একটা বিশেষ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সংস্কৃত পথে চলতে হয়। তাই তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে সংগ্রামী আদর্শ, সামাজিক অবস্থানের প্রকৃত রূপ। সুস্থ সংস্কৃতি আর তার দায়িত্ব অনেকখানি শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতি কর্মীদের। যুব সমাজের উপলব্ধির প্রয়োজন যে, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন আর সেই পথেই আসবে সুস্থ সংস্কৃতি, ঘটবে সামাজিক বিকাশ। লেখক-শিল্পীদের দায়িত্ব হচ্ছে তরুণ সম্প্রদায়ের সংগ্রামী মনোবলকে মহিমান্বিত করে তুলতে সাংস্কৃতিক খোরাক যোগান দেওয়া আদর্শ তুলে ধরা। তাদের সুকুমার মনোবৃত্তিকে আন্তরিকতার সঙ্গে অনুধাবন করে সংগ্রামী আদর্শের দ্বারা তাদের শিল্প ভাবনাকে, সাহিত্য ভাবনাকে বিকশিত করে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে। শুধু কেতাবী শিক্ষাদানে যুবমনকে আকর্ষণ করা যায় না। প্রাণশক্তিতে ভরপুর যুবক-যুবতীদের সঙ্গে আদর্শের ভিত্তিতে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপনের দ্বারাই তাদের মনের কাছে পৌঁছনো সম্ভব। তাছাড়া প্রগতি শিবিরের প্রতিষ্ঠিত লেখক-শিল্পীদেরও সজাগ থাকা দরকার যে, যে আদর্শ সমাজকে ক্রমশ অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে, সেটাই তো প্রগতিশীল ভাবনা, কাজেই প্রগতিশীলতা কোন এক জায়গায় আবদ্ধ থাকে না, সুতরাং যুব সম্প্রদায় যদি উন্নয়নমূলক সুস্থ সংস্কৃত পথে নতুন কিছু ভাবে, তাহলে তাদের ভাবনাকেও স্বাগত জানানো বা আবাহন করা প্রগতিশিবিরের শিল্পী-সাহিত্যিকদের দায়িত্ব।

শিল্পের নামে যে বাজারী ব্যবসা ডামাডোল বাজিয়ে চলেছে যুবসমাজ যাতে সেই পথ থেকে দূরে সরে প্রকৃত শিল্পের উন্মুক্ত দ্বারের কাছে পৌঁছোতে পারে তার আয়োজন একান্ত প্রয়োজনীয়, শিল্পী রোয়েরিখ জনগণের প্রয়োজনে শিল্প কি হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছে—'জনগণের গতিস্রোতে প্রথম স্থান শ্রমের পুনর্মূল্যায়ন। সৃষ্টি ও জ্ঞানের ব্যাপক বোধ তার শীর্ষস্থানীয়" এবং "শিল্প সে হলো জনগণের হৃদয়, জ্ঞানজনগণের মস্তিষ্ক। শুধু হৃদয় আর সুবুদ্ধি দিয়েই মানবজাতি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, বুঝতে পারে পরস্পরকে।"

মনে রাখা দরকার, সাংস্কৃতিক নিয়মনীতি পুরনো পথ বেয়েই আসে, সংস্কার এবং সংস্কৃতি দুইই মজ্জায় মিশে যায়, খুব ধীরলয়ে তাদের নিয়ম-নীতির মুক্তি

ঘটে বা অবলুপ্তি ঘটে বহু বছর পরে। প্রতি মুহূর্তেই বহু ঘাত-সংঘাতের বা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে অগ্রসর হয়। তাই পুরনো ঐতিহ্যকে বা সামাজিক মূল্যবোধকে স্বীকার করেই নতুন নতুন চিন্তায় উজ্জীবিত হয়ে তরুণ সম্প্রদায়কে উন্নততর চিন্তা চেতনার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। মনে রাখতে হবে "এযুগ তো সে যুগেরই একান্ত সৃজন/সে যুগের মৃত্তিকায় রসপুষ্ট এ যুগের মন।"

শ্রমিক-কৃষক, মেহনতী মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ সর্বস্তরের যুবক-যুবতীরা কুসংস্কারকে দূরে সরিয়ে মার্কসবাদী দৃষ্টির আলোকে বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলে সংস্কৃতির পথে আপনা হতেই সুগম হবে। এ প্রসঙ্গে আলেক্সি তলস্তয় লিখেছিলেন: "আমি যতক্ষণ না মার্কসবাদ সম্যকভাবে বুঝতে শিখেছি, ততক্ষণ আমি প্রকৃত শিল্পীদের স্বাধীনতার স্বাদ পাইনি।"

একদা রবীন্দ্রনাথ, মুকুন্দ দাস, নজরুলের গান ও পরবর্তীকালে সুকান্তের গান যুবমানসে গভীর রেখাপাত করেছে এবং যুবসমাজ সংগ্রামী আদর্শে অত্যাচারিত, শোষিত মেহনতী মানুষের আন্দোলনের সাথী হয়েছে। সেই সংগ্রামী ঐতিহ্যকে স্মরণ করে আজও কঠিনতর পথ যাতে তারা পাড়ি দিতে পারে তেমন সৃষ্টি উপস্থাপন করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে মনের পরিপুষ্টির জন্য সাংস্কৃতিক আয়োজনের সামাজিক দায়িত্ব শিল্পী সাহিত্যিকদের।

ভারতবন্ধু শিল্পী নিকোলাই রোয়েরিখ ছবি আঁকলেন, জাতীয় পোশাকে পুষ্পিত ডাল হাতে একটি মেয়ে, শিল্পী নিজে তার ব্যাখ্যা দিলেন; "সুদূরের হাওয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উত্তরের অজানা অপরূপ সব দেশের কথা ভাবছেন মেয়েটি। সেই রূপকথার দেশ যার অধিষ্ঠান মানুষের হৃদয়ে।'

আরেকটি ছবি আঁকলেন—একজন যুবতী, তিনজন যুবক, দৃষ্টি তাদের দিগন্তে—দীর্ঘ যাত্রার সময় এসে গেছে, সবাই উৎকর্ণ, কবিতার ছন্দে তাকে রূপ দিলেন:

"পবিত্র সংকেতের
খবর যদি রটে,
আমরাও রব উৎকর্ণ।
যদি তা বয়ে আনে কেউ
দাঁড়িয়ে উঠে আমরা প্রথম জানাব।
তীক্ষ্ণ চোখে আমরা চেয়ে থাকব,
পেতে থাকব সতর্ক কান।

শক্তি চাইব, আর যেই সময় হবে—
বেরিয়ে পড়ব।"

'৩০-এর দশকে যুব-ছাত্র সংগঠনগুলো ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিল। ৪০-এর দশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংগঠনগুলোর মধ্যে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের জন্য সংহতি স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ সালে প্রাগের প্রথম সম্মেলনে 'বিশ্বশান্তি'ই ছিল প্রধান দাবি, নির্ভীক যুব সম্প্রদায় গান ধরেছিল নাজি বিধ্বস্ত ছোট্ট লিডিস গ্রামের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে—"উই লিভ টু ব্রিং পীস টু দি আর্থ।" ১৯৪৭ সালে বুদাপেস্টে শান্তি, গণতন্ত্র, জাতীয় স্বনির্ভরতা ও উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য 'জোট বাঁধো' আওয়াজ উঠেছিল। ১৯৪৭ সালে প্রাগে যে বিশ্ব যুব উৎসব শুরু হয়েছিল, যার মূল লক্ষ্য ছিল শোষণ মুক্তি, যুব জীবন, সমৃদ্ধিশালী যুব জীবন গড়ে তোলা সেই লক্ষ্য পথেই অবিচল থেকে পরবর্তী পদক্ষেপ হলো নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ের ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষে সর্বস্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংহতি ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি ও মৈত্রীর জন্য যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে মানুষকে সংঘবদ্ধ করার কাজে। উৎসবের মূল কথাই হল, প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে আর যুদ্ধ নয়—শান্তি চাই। নয়া ফ্যাসিবাদকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে।

যুবক সুকান্ত বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই শিল্পীর দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁর কাব্য চিন্তা, শিল্প চিন্তা সংগ্রামী চিন্তার সঙ্গে সাঙ্গীকরণ ঘটলো, সুন্দর সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখলেন:

"চলে যাবো তবু যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল।
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি।"

কবি এখানে যেন আদর্শবোধের তাগিদেই নতুন প্রজন্মের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে, অবক্ষয়ী সমাজের বিষময় দিকগুলোকে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী কিভাবে সদ্ ব্যবহার করছিল।

ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে ধনী বা পুঁজিবাদী মনে করে এমন শিল্প-সাহিত্য চর্চা চলুক যাতে তাদের স্বার্থ পুরোপুরি বজায় থাকে, তাদের লোভ-লালসা ও স্ফূর্তি মিটিয়ে নেবার সহজতম পথ হল শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করা এবং সমাজের মেরুদণ্ড যে তরুণসমাজ তাদেরকে আফিঙের নেশার মত ঘোরের মধ্যে রাখা, যাতে তারা কখনও মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে।

বিপরীত প্রগতিশীল শিবিরের মানুষ চায় এই ব্যবস্থাকে চিরতরে নির্মূল করে সমাজে সর্বস্তরের মানুষকে মানুষ হিসাবে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। শ্রমিক শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। স্বাভাবিকভাবেই দুই বিপরীত মেরুর সাহিত্য-শিল্প ভাবনাও বিপরীতমুখী।

প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর শিল্প সাহিত্যে মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার ছবি হয়তো আছে কিন্তু সমাধানের কোনো ইঙ্গিত নেই। প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক সংস্কৃতি কর্মীরা নেমে এলেন পথে দেশের অধিক সংখ্যক মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘবের উদ্দেশ্যে। আর যন্ত্রণাকাতর মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য সংগ্রাম, কালি, কলম ও তুলিকে একত্রিত করলেন, উত্তরসূরীদের হাতে তুলে দিতে এগিয়ে এলেন সঠিক নিশানা।

দেশের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে প্রগতি শিবিরের দায়িত্ব হচ্ছে তরুণ সম্প্রদায় যাতে সব কিছু সম্পর্কেই একটা স্পষ্ট স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারে সেইমত চলতে সাহায্য করা। কাজেই সমস্যার মূলে প্রবেশ করতে হবে, আর সেজন্যই প্রয়োজন তরুণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা যাতে তারা বিপথে চালিত না হয় এবং সহানুভূতিপূর্ণ আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই তাদেরকে কাছে টানবার যোগ্যতা অর্জন করা।

যুবসম্প্রদায়কে মনে রাখতে হবে সংখ্যালঘু জাতি উপজাতি ও ধর্ম সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকাসহ সমানাধিকার ও মৌলিক অধিকারসমূহের জন্য, নারীর সমানাধিকার ও মুক্তির জন্য, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেখানেই মানুষের ওপর শোষণ-নিপীড়ন নেমে আসবে সেখানেই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, এটা সামাজিক দায়িত্ব ও নৈতিক কর্তব্য। বুঝতে হবে মানবাধিকার যদি অপহৃত হয় তাহলে প্রকৃত সংস্কৃতি কোন্ পথে আসবে? প্রকৃতপক্ষে এই আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে দারিদ্র্য, বেকারীর জ্বালা ভোগ করছে দেশের বেকার যুবকরা, অনেকে হতাশাগ্রস্ত, দেখা দিচ্ছে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, সঙ্কীর্ণ পথে কতগুলো প্রতিযোগিতা। কাজেই সেখানে দাঁড়িয়ে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলা খুবই কঠিনসাধ্য ব্যাপার। সুতরাং প্রগতি শিবিরের লেখক-শিল্পীদের আদর্শের জোর কঠিনতর হওয়া দরকার এরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য। গণনাট্য সঙ্ঘ অবশ্য তার নাটক ও গণসঙ্গীতের দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে তার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে এবং গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সঙ্ঘের সদস্যরা ব্যক্তিগত ভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে অপসংস্কৃতি প্রতিরোধে সংগ্রামের সামিল হয়ে তাদের সৃষ্টির সম্ভার সমাজের কাছে, তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন।

সুস্থ সংস্কৃতির পথ প্রসারিত করার জন্য তথ্যচিত্র বেশি সংখ্যক পরিবেশন করা দরকার। তথ্যচিত্রে সামাজিক দিকগুলোর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। দেশের আধুনিকীকরণের কর্মসূচি ও ভাব রূপায়ণ, কুসংস্কার মুক্তি ইত্যাদি তথ্যচিত্রে তুলে দিলে কেতাবী বিদ্যা থেকে অনেক বেশি গভীরভাবে যুবমনে রেখাপাত করে। কিশোর-কিশোরী, যুবতীদের নিকট আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলা অনেকখানি সহজ হবে। চীনের কয়েকটি জনপ্রিয় তথ্যচিত্র হচ্ছে 'ব্রেক থ্রু ফ্রম জিরো', 'ডোন্ট ওয়েস্ট ইয়র ইয়ুথ', 'হাণ্ড্রেড ডেজ ইন হংকং' ও 'লাইফ'। শহর জীবনের সমকালীন যুবক-যুবতীদের জীবন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই 'লাইফ'-এ তুলে ধরা হয়েছে। ১৯ বছরের তরুণী শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেছে।

সমাজের ওপর যে কোন রকম বিষময় প্রতিক্রিয়া যখনই দেখা দিয়েছে একদল শিল্পী-সাহিত্যিক তখনই তার প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছেন। তরুণ সমাজের নিকট এগুলো প্রেরণাদায়ক। তরুণ লেখক সোমেনচন্দকে যখন ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বলি হতে হয়েছিল, তখন সচেতন লেখক-শিল্পীরা ধিক্কার জানিয়েছিলেন এবং সে যুগে গঠিত হয়েছিল ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ। সাম্প্রতিককালে মার্কসবাদী আলোকে, বৈপ্লবিক আদর্শে, সংস্কৃতির পথে তরুণ সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে একসাথে নন্দন, যুবশক্তি, ছাত্র সংগ্রাম, গণনাট্য, গ্রুপ থিয়েটার প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুব সম্প্রদায়ের কাছে এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, বিশ্বের সমস্ত বড় বড় কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী সকলেই অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের সপক্ষে, মানবাধিকারের সপক্ষে শুধু কলম, তুলি বা রঙ হাতে নিয়েছেন তাই নয়, প্রতিরোধের ময়দানে এসে দাঁড়িয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: রঁমা রলাঁ, আঁরি বারবুস, ম্যাক্সিম গোর্কি, রবীন্দ্রনাথ, লু সুন, পল-রোবসন, পাবলো পিকাসো, প্রেমচন্দ এবং আরও অনেকে।

প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সাহিত্য-শিল্প চর্চার নামে যৌন লালসার ছড়াছড়ি, মদ জুয়া জালিয়াতি চুরি ডাকাতি খুন রাহাজানি বেপরোয়া গুণ্ডামি ও সংঘবদ্ধ জীবন সংগ্রামকে উপহাস করে যুবসমাজের নৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেবার যে প্রয়াস চলছে অবিরত, প্রগতি শিবিরের লেখক-শিল্পীদের দায়িত্ব যুবসমাজকে সেখান থেকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং সুস্থ সংস্কৃতির খোরাক তুলে ধরা। যুবসমাজ

অনেক সময়ই বিভ্রান্ত অথবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়, কখনও বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। নানাকারণেই প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে ফারাকটা কোথায় তারা বুঝে উঠতে পারে না। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সৃষ্ট অশ্লীল শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্র, নাটক-সঙ্গীত ইত্যাদির আকর্ষণ বা মোহের টান এত তীব্র যে যুবসমাজের সেদিকে ঝুঁকে যাবার স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে যায়, কখনওবা আত্মসমর্পণ করে অপসংস্কৃতির কাছে।

অপসংস্কৃতির জোয়ারে ভেসে যাওয়ার মুখ থেকে উদ্ধার করতে পারে প্রগতি-শিবিরের লেখক-শিল্পী সংস্কৃতি কর্মীরা। কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের জানবার আকাঙ্ক্ষা, সাংস্কৃতিক পিপাসা যাতে সুস্থ পথ ধরে মেটানো সম্ভব হয় সেদিকে লেখক-শিল্পীদের অতন্দ্র প্রহরীর মত সজাগ থাকতে হবে। সঠিক নিশানা পেলে তরুণ সম্প্রদায়ই পারে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের পরিবর্তন ঘটাবার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিতে।

সর্বোপরি মনে রাখা দরকার যুব-ছাত্র, মহিলা, শ্রমিক, কৃষক, লেখক-শিল্পী সংগঠন—কোনটাই একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন সংগঠন নয়। কাজেই শিল্প-সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে হলে আদর্শের ভিত্তিতেই যৌথভাবেই গড়ে তুলতে হবে সংগ্রামের মঞ্চ।

আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে শ্রেণী-চেতনা

'আধুনিক' শব্দটি নিয়ে বাদানুবাদের অন্ত নেই। ব্যুৎপত্তিগত অর্থবিচারে বর্ত্তমানে যা ঘটছে তাকেই আধুনিক বলা যেতে পারে, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই 'আধুনিক' ব্যাপারটি সতত পরিবর্তনশীল, তার পরিবর্ত্তন হয় সময়-ধারার বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে। "আজ যাহা নূতন, কালকেই তাহা পুরাতনের কোঠায় চলিয়া যায়।"

এ'কথা অবশ্য স্বীকার্য যে অতীত দিনের ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে কোন নতুন কাব্যরীতি রাতারাতি গড়ে উঠতে পারে না,—

"এ যুগ তো সে যুগেরই একান্ত সৃজন।
সে যুগের মৃত্তিকায় রস পুষ্ট এযুগের মন ॥"

এটা মানতেই হবে যে, "নতুনের উদ্ভবের বীজ নিহিত থাকে পুরাতনেরই জঠরে।" অতএব যে নবতর প্রেরণায় সাম্প্রতিক কবিতার স্বাতন্ত্র, তাকে একেবারে আকস্মিক মনে করবার কোন কারণ নেই। ঐতিহাসিক প্রয়োজন-বোধে এবং জীবনধারণের তাগাদায় বাংলা কাব্যের পরিবর্তন বাস্তবতার যাত্রাপথে যে রূপ সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছে, তা' মোটেই নগণ্য নয়।

মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রোত্তর যুগ বা কল্লোলযুগ থেকে আজ অবধি, সকল কবিকেই আধুনিক কবি হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে এই কালসীমার মধ্যে বহু কবিই নতুন পথে পথ পরিক্রমা করেছেন বটে কিন্তু শ্রেণী-চেতনাকে উপলব্ধি করা যায় কয়েকজনের কাব্যেই। রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নজরুল বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করলেন গণ-মানবের জয়, কারার লৌহকপাট ভেঙে লোপাট করে নতুন সমাজ গড়বার আহ্বান জানলেন,

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
যবে অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেদিন হব শান্ত।"

নজরুল রোমান্টিক মনের কবি ব'লে তাঁর বিদ্রোহ রোমান্টিক রূপ নিয়েছে। পরবর্তীকালে ঐ সুরই আরও সুষ্ঠু, দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ, বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন

অন্ত কবিদের হতে শ্রেষ্ঠতর পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছে। তবে বাংলা কাব্যে শ্রেণী চেতনার প্রথম স্ফুরণ দেখা দেয় নজরুল কাব্যেই, কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের উচ্ছ্বাস, ভাবপ্রাবল্য ও বিক্ষিপ্ত চিন্তার ছাপ রয়েছে।

আধুনিক কবির দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদা তিনভাবেই ; প্রধানত,—মর্যাদাবোধ, ব্যক্তিসত্তার মুক্তি, বিপ্লবী নিয়তিতে বিশ্বাস ; মানুষে চোখে আজ মানুষ সত্য মানুষ হিসেবেই, আত্মার প্রতীক হিসেবে নয়, সত্য হাসি কান্না, সুখ দুঃখের জন্ম, 'আধুনিক মানুষ সত্য secular জীবন নিয়ে social মানুষ হিসেবেই।' মানুষ সামাজিক প্রাণী, কাজেই যে সমাজে যে যুগে কবি বাস করেন, সেই যুগের প্রয়োজনকে এড়িয়ে যাওয়া কোনমতেই সম্ভব নয় ; যুগ আপন গতিতেই সুমুখপানে এগিয়ে চলে, প্রগতিবাদী কবির লেখনীতেও প্রতিমুহূর্তে তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে।

লক্ষ যুগের হাসি অশ্রু আর সুখ দুঃখের সংগীতে গাথা এই ধরাতলে মানব-জীবনের কত বৈচিত্র্য, কত বিভাগ কত শ্রেণীবিন্যাস। সমগ্র মানুষের রূপ এখানে অভিন্ন নয়, সমাজ ব্যবস্থার অসম বিন্যাসের দরুন মানুষের পদ-মর্যাদা আর তার অবমাননার কতই না স্তরবিভাগ।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাগ্রত চেতনা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নামল উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে,—রাজনৈতিক চেতনার দ্রুত অগ্রগতি প্রভাব বিস্তার করল বাংলা কাব্যের জগতে। এবারে কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে যেমন নতুন মানুষের সন্ধান পাওয়া গেল, তেমনি দেখা গেল এ দেশের জরাজীর্ণ মৃতকল্প সমাজের ছবি। সমাজ আর মানুষকে পৃথক না রেখে দেখানোর চেষ্টা হ'ল বর্তমান সমাজের পরি-প্রেক্ষিতে মানুষের স্থান কোথায়। কাব্যকে এতদিন যেভাবে ধূলিমালিন্যের ঊর্ধ্বে শুভ্রতার আবরণে আবৃত করে রাখবার চেষ্টা হয়েছিল, তা আর টিকলো না ; শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত মানব শ্রেণীর সংগ্রামী চেতনা, বৈপ্লবিক চেতনা কাব্যের জগতে প্রধান স্থান অধিকার করল। কবিরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন মানুষের নীচতা-দীনতা ঘৃণ্যতার জন্য সমাজও সমভাবে দায়ী, তাই কাব্যের জয়যাত্রার পথে সর্বহারার দ্বার হলো অবারিত।

সাম্প্রতিক প্রগতিবাদী কবিগোষ্ঠী কখনই সমাজের নির্দেশকে, ইতিহাসের সাক্ষ্যকে, শোষিত শ্রেণীর ব্যথা বেদনা যন্ত্রণাকে অবহেলা করতে পারে না, তাঁর প্রতি রক্ত কণিকায় যে আছে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের বীজ। এপ্রসঙ্গে রোমঁ্যা রলাঁর বক্তব্যকে স্মরণ করা কর্তব্য,—"বিপ্লবী মনোবৃত্তি হইতে যে আর্টের জন্ম

তাহার কাজ সর্বপ্রকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। পূর্ণসত্য —এই পূর্ণসত্য লাভ করিবার পথে বহুবার আমাদের শ্রমিক বিপ্লবীদের সাথী হইতে হয়। কিন্তু আমরা স্বাধীন সাথী। আমরা খাতায় নাম লিখাই না। আমরা একটি শ্রেণীর প্রভুত্ব লাভের জন্য সংগ্রাম করি না, আমাদের সংগ্রাম সর্বমানবের জন্য। কোনো শ্রেণী শাসন করিবে অথবা শাসিত হইবে, ইহা আমরা সহ্য করিব না…।" যে সমাজ মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষের বাঁচার অধিকার দেয়নি, শারীরিক বা মানসিক পরিপুষ্টির জন্য উপযুক্ত রসদ দেয়নি, সেই শ্রেণীর মানুষকে তুলে ধরতে হবে কাব্য সাহিত্যের জগতে। আধুনিক প্রগতিবাদী কবি কবিতা লেখেন সর্বহারার জন্য, তাঁর দরদ অবজ্ঞাত অবহেলিত নির্বাচিত মানবতার পথে,—অন্যায় অসত্য অবিচারের রক্তচক্ষুর সামনে কবির পলায়ণ-পরতার নীতি আত্মহত্যারই নামান্তর, যুগাগত, সত্যকে মানতে গিয়ে তাঁদের সাহিত্যে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে যুগের স্বাক্ষর। সর্বহারা মানুষের বেদনার কাহিনীকে রূপায়িত করে তাঁরা হন জনগণের কবি।

বাংলা কাব্য সাহিত্যের স্রষ্টা ও নিয়ামক প্রায়শঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কবি ও সাহিত্যিকরা। বিদেশী রাজরোষের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রতিক্রিয়া হয়েছে মধ্যবিত্ত মানসে, জীবনের গভীর নৈরাশ্য ও অবক্ষয় তাদেরকে ক্রমশঃ সরিয়ে এনেছে বাস্তবের ধূলিধূসরতার মধ্যে। কাব্য ক্ষেত্রেও নতুন বৈপ্লবিক চেতনা দানা বেঁধে উঠেছে,—কবিরা বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে চলেছেন নতুন পথে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—"এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকারী থেকে বঞ্চিত করেছে আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে, তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।"

ধর্ম ও প্রথার বন্ধনমুক্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা চেতনা লাভ করেছে, দেখা দিচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা। মানুষ যে দেবতার দয়ার দান নয়, বংশ গৌরবের ফল নয়, মানুষ হিসেবেই তার পূর্ণ মর্যাদা প্রাপ্য,—এ বিষয়ে সাধারণ মনুষ্যসমাজ অবহিত হলো,—কবিরাও তাই উপলব্ধি করলেন মর্মে মর্মে, স্বাভাবিক ভাবেই কাব্য-সাহিত্যে তার প্রতিফলন হলো।

বিদ্রোহের নৈরাশ্যবাদ কাটিয়ে যারা বাংলা কাব্যে নতুন বলিষ্ঠতার সঞ্চার করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই মার্কসবাদী। মার্কসীয় দর্শনভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক

বাস্তবতা কবিদের সম্মুখে এক নতুন কর্তব্যসূচী উপস্থিত করেছে। ব্যক্তিমনের ওপরে সমাজমনের অস্তিত্ব ও গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। জীবন ও জগৎকে অনুধাবন করা এবং শ্রমিক শ্রেণীর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া কবিদের সামাজিক দায়িত্ব বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। পৃথিবীর এক বৃহৎ সংখ্যক কবি-সাহিত্যিক এই মন্ত্রকে সত্য বলে শিরোধার্য করেছেন।

সাম্প্রতিক কবি মানস যে সমাজ সচেতন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজমুখী, এ সত্যটি স্বীকার করতে হবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীই ভিড় জমিয়েছে বেশি। কয়েকজন শক্তিমান কবির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা কাব্যের এই মোড় ফেরা সফলকাম হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের অসাম্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবিরা লেখনী চালনা করলেন। সমাজচেতনা, শ্রেণীচেতনার দিক থেকে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের কবিতা মর্যাদার দাবী রাখে। সেদিক থেকে 'পদাতিক', 'চিরকূট', 'অগ্নিকোণে' কাব্যসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর একটি কবিতা এখানে উল্লেখ করা হল,—

"প্রভু যদি বলো, অমুক রাজার সাথে লড়াই
কোনো দ্বিরুক্তি করব না। নেব তীর ধনুক।
এমনি বেকার, মৃত্যুকে ভয় করি থোরাই—
দেহ না চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক।"

অথবা, কবি অরুণ মিত্র যখন বলেন,—

"প্রাচীর পত্রে পড়োনি ইস্তাহার?
লাল অক্ষর আগুনের হলকায়
ঝলসাবে কাল জানো।"

তখন কবির সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সঙ্গে আত্মীয়তাকে উপলব্ধি করা যায়। কবি অরুণ মিত্রের প্রকাশভঙ্গি সংহত ও সংযত। কিন্তু বর্তমানে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যা লিখছেন তাতে সর্বহারা মানবতা অনুপস্থিত, তাঁর কলমে আজ আর শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণী রুখে দাঁড়াতে অসমর্থ।

কবি সুকান্তের ছাড়পত্র বাংলা কাব্য সাহিত্যের একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ। সমাজচেতনার এমন কাব্যসম্মত রূপায়ণ খুব কমই দেখা যায়। 'ছাড়পত্র' বিশ্বসাহিত্যে মর্যাদার আসনের দাবি রাখে। সুকান্ত তো খেটে-খাওয়া মানব শ্রেণীর দরদী বন্ধু ছিলেন। কবির সমগ্র কাব্য, সমগ্র দৃষ্টি শ্রেণীসংগ্রামের মশালকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন শোষক শ্রেণীর

প্রতি তীব্র ঘৃণা, শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে 'প্রতিশোধের দামামা' বাজাতে চেয়েছেন,—

"তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে।"

এরূপ দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ, বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন সংগ্রামী চেতনা বিরল বলা চলে। কবি স্থির বিশ্বাসে জানালেন,—

"তাই তো চলেছি দিন পঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ! বিপ্লব চারিদিকে॥"

শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন,—

"শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি"।

সুকান্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি চিরস্থায়ী ঘৃণা ঘোষণা করলেন: শ্রমজীবী মানুষের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়, সর্বহারার মানবতাবোধ কবির কাব্যিক উচ্ছ্বাস নয়, এ-কাব্য শ্রমিক শ্রেণীকে দায়িত্ববোধে, অধিকারবোধে, বৈপ্লবিক কার্যে সমুখপানে এগিয়ে নিয়ে চলে। বিপ্লবী কবি অনুভব করলেন,—

"লেনিন ভূমিষ্ট রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।"

মহিলা কবি কণক মুখোপাধ্যায় যখন বলেন,

"আমি যে তোমার শবাধারে উপচে পড়া
ফুলের বুক থেকে বুকে তুলে নিয়েছি
সুগভীর দুঃখ,
আমি কি পারি
মেহনতী মানুষকে ভাল না বেসে।"

তখন স্বাভাবিকভাবেই অনুধাবন করা যায় যে মেহনতী মানুষ, নিপীড়িত মানবশ্রেণী, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ কত অনায়াসে কবির কাব্যের আঙিনায় ভিড় জমিয়েছে।

অথবা,

"এস, আমরা ছড়িয়ে পড়ি
বিপ্লবের রক্তিম বসন্তে বসন্তে
ফুল ফোটার অসহ্য যন্ত্রণায়,

এস; আমরা দু'হাত ভরে কোটাই,—
বিদ্রোহের ফুল, মুক্তির ফুল, ভালবাসার ফুল।"

এখানে কবি শিল্পীর অন্তরে শ্রেণী চেতনা, বৈপ্লবিক চেতনা কাজ করেছে কত গভীর ভাবে, সমস্যাপীড়িত মানব শ্রেণীকে অবলম্বন করেও তাঁর কাব্যখানি কত রসস্নিগ্ধ হয়েছে, আশা করি কোনরূপ মতানৈক্য দেখা দেবে না।

বিদ্রোহী আধুনিকতা, অবোধ্য ধূসরতা ও জীবন সংগ্রামের তীব্রতায় প্রগতিবাদী কবির কবিতা এগিয়ে চলেছে পূর্ণস্রোতে। কবির কবিতা আজ সর্বহারার দলের শাণিত অস্ত্র। তাদের শ্রেয়োবোধ সম্পূর্ণরূপে জাগতিক বিপ্লবের পথে,—যে বিপ্লব মানুষের জীবন থেকে দূর করে দেবে সর্বপ্রকারের অসাম্যের পাপ, মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করবে শ্রেণীহীন সমাজে আর তার ভেতর দিয়েই শ্রেণী-হীন নবজীবনের সূচনা; কবি অমল চক্রবর্তী বলেন,—

"জাগো জন্মক্ষুধা ক্লিষ্ট মানুষের কবি
মহামারী-চূর্ণ-করা হানো সে আঘাত
ক্রুদ্ধ দাবানল জ্বালো রক্তে আঁকো ছবি
ধ্বংস দামামা হাতে বাজাও প্রভাত
জনতার মাঝে মৃত্যু সে মৃত্যু মহান,
মৃত্যু হোক গাও কবি ক্ষুধা-জয়ী গান।"

এ প্রসঙ্গে কবি গোবিন্দ চক্রবর্তীর কবিতাও উল্লেখযোগ্য,—

"দিকে দিকে দৃপ্ত পদধ্বনি—
কাল প্রহরীর শিঙা বাজে অবিরাম,
আর বুঝি মানে না লাগাম
উচ্চকিত কালো ঘোড়া।
রাত্রি শেষ যাম,
কোথা কারা জ্বেলেছে মশাল—
আকাশ কঠিন লাগে লাল।"

কবি অনির্বাণ চৌধুরীর কবিতাতেও শ্রেণী-চেতনা লক্ষণীয়,—

"ওরা পথ হাঁটে সেই কাক ভোর থেকে
যদিও অভুক্ত ওরা সারা দিনমান।
ক্লান্তি হীন তবু সঙ্গে লাল উদ্ধি এঁকে
ওদেরই ডাক দেয় ব্রিগেড ময়দান।"

কাব্যকে তাঁরা জীবন সংগ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী করে দেখেছেন বলে তাঁদের রচনা যে বলিষ্ঠ,—এটা অবশ্য স্বীকার্য। বর্তমানে আরও বেশ কিছু সংখ্যক তরুণ কবি আছেন যাঁদের কবিতায় শ্রেণী চেতনাকে উপলব্ধি করা যায়। তাছাড়া বর্তমানে এই চিন্তাধারায় রচিত বেশ কিছু বিদেশী কবিতাও বাংলায় অনূদিত হয়েছে। ভিয়েৎনামের বিখ্যাত কবি 'তো হু' বিপ্লবী ভাই 'এই'-এর উদ্দেশে লেখা কবিতার বাংলা অনুবাদ করেছেন মহিলা কবি শুভ্রা সোম—

"নগুয়েন ভাই 'এই', ভ্রাতৃবর।
তোমার কথা আমরা স্মরণ করব
মানুষ বাঁচবে এবং মরবে সগৌরবে,
মাথা নত করবে না শত্রুর সামনে
আর সব কিছুই উৎসর্গ করবে নিজের
পিতৃভুমির জন্যে,
যেমন করেছ তুমি, তুমি একজন শ্রমিক।"

অনূদিত কবিতা "ভারতের কবিদের প্রতি"-তে কবি ইরাকলি আবাশিদজে বলেন,—

"যুদ্ধ শ্রান্ত এ গৃহে কারোই দুঃখ চাইনি আমি,
আমি যা চাই তা শুধু যেতে সেই দুনিয়া
মুশায়ারাতে
যেখানে আগুন জ্বালিয়ে কবি ও গায়ক বসেছে
সব—
সারারাত যায় সারারাত যাক্ গীতি
প্রতিযোগিতায়

*   *   *

কবির লড়াইয়ে জগতের কবি সব জমায়েৎ হও
নিজ সামর্থ্য দেখাক্ সবাই কেউ কারো ছোট নয়।'

কোনো বিশেষ একজন মাত্র কবি এই সাম্প্রতিক কাব্য ধারার স্রষ্টা নয়, অনেক কবির মিলিত প্রচেষ্টাতেই তৈরী হয়েছে এই নতুন রীতি।

সাম্প্রতিক গল্প-কাহিনীর গতি-প্রকৃতি

"বিপ্লবী মনোবৃত্তি হইতে যে আর্টের জন্ম, তাহার কাজ সর্বপ্রকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। পূর্ণসত্য—এই পূর্ণসত্য লাভ করিবার পথে বহুবার আমাদের শ্রমিক বিপ্লবীদের সাথী হইতে হয়, কিন্তু আমরা স্বাধীন সাথী। আমরা খাতায় নাম লিখাইনা, আমরা একটা শ্রেণীর প্রভুত্ব লাভের জন্য সংগ্রাম করিনা, আমাদের সংগ্রাম সর্বমানবের জন্য। কোনো শ্রেণী শাসন করিবে অথবা শাসিত হইবে, ইহা আমরা সহ্য করিবনা..." ।—রঁম্যা রলাঁ।

মানবজীবনের স্বাভাবিক বিকাশ লাভের জন্য গল্পকার বা কথা-সাহিত্যিকের নৈতিক দায়িত্ব আছে অবশ্যই। দেশ-জাতি-ধর্ম অনুযায়ী সামাজিক মানুষের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই—সেখানে সমগ্র মানবিক জাতির গোত্র এক ও অভিন্ন, প্রেম-ভালবাসা-স্নেহ-প্রীতি সকল মানুষের মধ্যেই বর্তমান। নর-নারীর জীবনকে কেন্দ্র করেই গল্প-কাহিনী বা কথাসাহিত্যের কারবার। মানুষকে উন্নততর জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে সাহায্য করা, বাঁচার পথ, ক্ষিদের জ্বালা নিবৃত্তির উপায়, অত্যাচার, অনাচার, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঁচবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার মতো মানসিকতা গঠন ও উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রেরণা জাগাবার মতো দায়িত্ববোধে সচেতন থাকবেন গল্পকাররা ও কথা-সাহিত্যিকরা···শোষিত বঞ্চিত জনগণের এটাই কাম্য আর যুগেরও এটাই প্রধান দাবী। জাতির জীবনের উন্নতি ও অবনতি অনেকটা পরিমাণে সাহিত্যিকের হাতে—যুগকে উপেক্ষা না করে সমসাময়িক যুগের ছবি গল্পকারের কলমে ফুটে ওঠা দরকার, স্বাভাবিকভাবেই মতাদর্শগত স্পষ্ট প্রগতিবোধের চিত্র ও পরিশীলিত লেখককে সেই রচনায় খুঁজে পাওয়া যাবে সহজেই।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আমাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয় এল—বাঁচার তাগাদায় কেউবা লক্ষ্যপথে আর কেউবা লক্ষহীন-ভাবে ছুটে চলেছে।

সাম্প্রতিক গল্পের প্রবণতা অন্তর্লোকের দিকে, চরিত্রগুলো যুগানুগ করে আঁকা হয়েছে ও তার নায়ক-নায়িকার আত্মপ্রত্যয় খুব বেশী। চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঘটনার গতিপথ যেভাবে রয়েছে তা পাঠককেও সচেতন হতে সাহায্য করে। আজকের প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা সমাজবাস্তবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং

তাঁরা অনেকেই রচনাশৈলীতে বলিষ্ঠতার ছাপ রাখতে পেরেছেন। এঁরা সাধারণ মানুষের কথাকে—সমস্যাকে তাঁদের সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়েও মানবিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারেরই জয়গান গেয়েছেন এবং পাঠকের মনকেও সেই পথেই আকৃষ্ট করেছেন।

যুদ্ধোত্তর যুগের প্রতিচ্ছবিকে কেন্দ্র করে কতক সাহিত্যিক কথাসাহিত্য রচনা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ননী ভৌমিকের 'ধানকানা' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এখানেও আন্তরিকতার ভড়ং দেখানো হয়েছে, বিপদ অতিক্রম করবার মতো কোন পথ দেখানো হয়নি।

গৌরীশঙ্করের 'এ্যালবার্টহল'—এর পর তাঁর 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' সত্যিকারের বলিষ্ঠ নির্বাচন, লেখনশৈলী কৃতিত্বের দাবী রাখে এবং রচনায় নতুনত্বেবোধের স্বাক্ষর রয়েছে। রাজশেখর বসু উক্ত বইটি সম্পর্কে বললেন,—"ইস্পাতের স্বাক্ষর পড়ে মনে হয় আবার একটা উপন্যাস পেয়েছি হাতে…।" লেখকের জীবনানুভূতি ও জীবনবোধ প্রশংসনীয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় রাজনৈতিক চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে। শিল্পবিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাদের যুগে গ্রামের নতুন সমস্যা ও সঙ্কট তারাশঙ্করের লেখায় ফুটে উঠেছে। তাঁর, 'আরোগ্য নিকেতন'-এ চিত্রিত হয়েছে গ্রামের ছবি,—গ্রাম্যজীবনের সমস্যাবহুল চিত্র। 'সপ্তপদী', 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' পাঠকমনে সচেতনতাবোধ জাগাতে সাহায্য করে। 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথ, 'পঞ্চগ্রামের' দেবু রাজনৈতিক সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। 'গণদেবতা'য় দেখি অত্যাচারিত, উৎপীড়িত জনগণ কিরকমভাবে প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। সাম্রাজ্যাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট জেহাদ ঘোষিত হয়েছে। 'ঝড় ও ঝরা পাতা' এবং 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাস, তাঁর 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'য় কথাসাহিত্যিকের কলম বেশ সার্থক হয়েছে বলা যায়।

বনফুলের রচনা বৈজ্ঞানিকমুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, প্রগতিবোধের ছাপ তাঁর রচিত গল্পে আছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। বনফুলের 'স্বাধীনতা' গল্পের ছাত্র সুমনের মুখে শোনা যায়,—"পণ্ডিতমশায়, স্বাধীনতার আরেকটা মানে আমি খুঁজে পেয়েছি। যা করলে সত্যিকারের আনন্দ পাওয়া যায় তাই করবার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে।"

সতীনাথ ভাদুড়ী আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিতে 'জাগরী' উপন্যাস লিখেছেন। এখানে নীলুর কম্যুনিজমবোধ যেন রচনাশৈলীর দিক থেকে

কোথায় একটু খুঁত রয়ে গেছে ব'লে মনে হয় যার জন্যে পাঠককে তেমনভাবে উৎসাহিত করতে পারে না। তবে এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় লেখকের প্রগতিশীল মানসিকতা পরিস্ফুট হয়েছে।

গোপাল হালদারের 'ত্রিদিবা'য় অমিতের সন্ত্রাসবাদ থেকে কম্যুনিজমের দিকে ঘুরে দাঁড়াবার ঝোঁক রয়েছে, অমিতের চরিত্রাঙ্কনে লেখক সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। লেখকের রাজনৈতিক সচেতনতা ও মুক্তিপথের ইঙ্গিত রয়েছে। অতীন্দ্রনাথ বসুর 'বি-কেলাস' গোয়ামুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ঔপন্যাসিক নিজে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় উপন্যাসটি অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী হয়েছে। লেখক প্রমাণ করেছেন তাঁর জীবন, কর্ম ও সাহিত্যচর্চা কত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশেষভাবে প্রমাণিত যে, লেখক যদি সংগ্রামের সাথী হন, নেমে আসেন মাঠে-ময়দানে, সাধারণ জনগণের সাথে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য উৎকৃষ্টতর হয়, বাঁচবার পথ দেখায়।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার মারপ্যাচে গল্প-কাহিনী কত জনপ্রিয় করা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন তাঁর 'ভাদুড়ী মশাই', 'কবুলতি', 'আমরা কি ও কে' জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁর 'চীনযাত্রী'' একটি রসাল ভ্রমণ সাহিত্য।

বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প রচনায় একজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিককে খুঁজে পাওয়া যায়। তবে তাঁর এই হাস্যরসের অন্তরালে একজন বেদনার্ত শিল্পীচিত্তকে অনুভব করা যায়। তাঁর 'রাণুর প্রথমভাগ', 'দ্বিতীয় ভাগ', 'তৃতীয় ভাগ', রাণুর কথামালা', 'বরযাত্রী', 'নীলাঙ্গুরীয়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য বা গল্প রচনার জগতে অবদান আছে অনস্বীকার্য কিন্তু কোন বিশেষ সুর বা নীতি যেন ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। তাঁর 'মর্গ', অপূর্ব শিল্প-সৃষ্টি বলা যেতে পারে।

সন্তোষ কুমার ঘোষ 'কিনু গোয়ালার গলি' লিখে পাঠককে তেমন তৃপ্তি দিতে পারেননি, তবে যুগচিত্রকে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। নরেন মিত্রের 'অঙ্গীকার'—এ নারীজীবনের প্রগতির দাবীকে স্বীকার করা হয়েছে। 'মাধবীর জন্য' উপন্যাসে প্রতিভা বসুও সে চেষ্টা করেছেন। সুবোধ ঘোষের 'চোখ গেল' ও 'পলাশের নেশায়' সচেতনতাবোধ ও চিন্তাশীল মনের ছাপ আছে। জরাসন্ধের 'লৌহকপাট' প্রকৃতপক্ষেই অপূর্ব সৃষ্টি। 'ফকির'-এর সংবেদনী ও মানবিক আবেদন যে-কোন পাঠকমাত্রের মনে সাড়া জাগায়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোনের' মধ্যে বাস্তব জীবনের সমস্যা ও সঙ্কটের চিত্র আছে যা নাকি সম্পূর্ণ আমাদের চারপাশের ঘটনা।

মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে মেহনতী মানুষের প্রতিরোধ শক্তিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'পুতুল নাচের ইতিকথায়' নিয়তিবাদ ও যুক্তিবাদ দুইই আছে কিন্তু যুক্তিবাদই প্রাধান্য পেয়েছে। 'সোনার চেয়ে দামী' উপন্যাসে আন্তর্জাতিকতাবাদকে উপলব্ধি করা যায়। 'শান্তিলতা'র নায়ক শ্রমিক সুখেন্দুকে শায়েস্তা করবার জন্য মালিক গুণ্ডাদলকে উস্কানি দেয় কিন্তু সম্মিলিত শ্রমিকদের প্রতিবাদের শক্তি অত্যন্ত বলিষ্ঠ, বইটি সংগ্রামী দলকে সঠিক পথের নির্দেশ দিতে সাহায্য করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সাধারণ জনগণের জীবনে যে সমস্যা-জর্জরিত রূপ দেখা দিয়েছিল সেটাই চিত্রায়িত হয়েছে। 'পদ্মানদীর মাঝি'র প্রধান চরিত্র কুবের—তার জীবনের আরম্ভ ও পরিণতিতে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে। যৌথ জীবন চিত্রকে মাণিক বন্দোপাধ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসখানি শ্রেষ্ঠ, সার্থক ও বহুল প্রশংসিত জনপ্রিয় উপন্যাস।

অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম'—জেলেদের জীবন-কাহিনীই এতে বর্ণিত হয়েছে। 'চরকাশেম'-এর লেখক উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন—"চরকাশেম উপন্যাস হলেও আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য সেই চরের জীবন্ত বলিষ্ঠ মানুষ গুলির উদ্দেশ্যে।" উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কাশেম, সে স্বপ্ন দেখে চর জাগলে সমস্ত দুঃখের অবসান হবে,—মাছ ধরে বেড়ায়, জল মেপে দেখে চর জেগে ওঠার কত বাকি। বাস্তবিক পক্ষেই অমরেন্দ্র ঘোষের 'চরকাশেম' বাংলা সার্থক উপন্যাসের জগতে একটি মূল্যবান সম্পদ এবং উপন্যাসখানিতে দরদী প্রগতিশীল শিল্পীমনের পরিচয় মেলে।

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' এবং অদ্বৈত মল্ল বর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস দু'খানিতে জেলেদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সমস্যাসঙ্কুল জীবনচিত্র চিত্রিত হয়েছে—দুটিই বেশ সার্থকতার স্তরে উন্নীত হয়েছে।

'৭০ সালের আধাফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের কালে দিলীপ মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত সোমেনচন্দ ও তাঁর সংগ্রহ গল্প জনগণের মনে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। সোমেনচন্দ লেখার প্রয়োজনেই আন্দোলন, সংগঠন, শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের প্রতি আস্থাকে অবশ্য প্রয়োজনীয় ব'লে জীবন দিয়ে উপলব্ধি করে-

ছিলেন। তাঁর 'দাঙ্গা' গল্পটি এ' ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন রাখতে পেরেছে। আজকের প্রগতিশীল কথাসাহিত্যিকের সোমেনচন্দ-এর পথ অনুসরণ করার দিন এসেছে। সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমান প্রগতিশীল লেখকবৃন্দের নিকট সোমেনচন্দ-র রচনা আলোর দিশারী।

কমল সেন সম্পাদিত 'প্রতিবেশী সূর্যের রক্তাক্ত দিনগুলি' বিভিন্ন দেশের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামী আদর্শে লেখা—সংগ্রামী জনগণকে এটি উৎসাহিত করেছে। মিহির আচার্য সম্পাদিত 'পশ্চিমবাংলার গল্পসংগ্রহ' পড়ে জনগণ উৎসাহিত হয়েছে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। জুলিয়াস ফুচিকের 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে'ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবি বসুর 'সেইমেয়ে', দেবদত্ত রায়ের 'আইনের-জন্যে', 'প্রতিশ্রুতির সপক্ষে', মণি মুখোপাধ্যায়ের 'গণতন্ত্র', অভিজিৎ দত্তের 'দিন বদল', অলক সান্যালের 'ঝড়ো বাতাস' ইত্যাদি গল্প-উপন্যাসে প্রগতিবোধের ছাপ সুস্পষ্ট।

তপোবিজয় ঘোষের 'সামনে লড়াই', 'মুক্তি চাই' গ্রন্থে চেতনাকে উপলব্ধি করা যায়। 'সামনে লড়াই' উপন্যাসের এক জায়গায় আছে,—এর অবশ্যম্ভাবী পরিণামে ওদের ভ্রান্ত রাজনীতি শোষক শ্রেণীর হাতই শক্ত করবে এবং ফ্যাসিস্ট আক্রমণের পথ খুলে দেবে। শ্রমিক কৃষকের স্বার্থে আমাদের উচিত এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। আর তার সঙ্গে দৃঢ় মজবুত সংগঠন গড়ে তোলা। সংগঠনই হল মূল শক্তি, তার অগ্রবাহিনী হল শ্রমিকশ্রেণী—এ কথা কখনোই ভুললে চলবে না।" এখানে তপোবিজয় ঘোষের সংগ্রামী চেতনা 'শোষকশ্রেণী ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠনী শক্তিতে বিশ্রাম এবং শ্রমিক কৃষকের স্বার্থে যে কোন আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো মানসিক প্রস্তুতিই পরিলক্ষিত হয়। লেখকের লেখনী সামাজিক মানুষকে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেছে, বাঁচবার পথ নির্দেশ করেছে। কথাসাহিত্যিক হিসেবে এখানে তাঁর পরিপূর্ণ সার্থকতা।

অমল দাশগুপ্ত-র 'কারানগরী'র পরোক্ষ নায়ক একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। ট্রেড ইউনিয়ন করার অপরাধে চাকুরি থেকে বরখাস্ত, পরে সর্বক্ষণের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর আন্দোলন লেখককে 'কারানগরী'র মতো বই লেখায় উৎসাহ দিয়েছে। গ্রন্থের এক জায়গায় আছে, "আমি কেন স্টেশনে এসেছি তাও ওরা জিজ্ঞেস করেনি, সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল, আমরা একা নই। আর কেউ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার

মনে হল, একবার চেনাজানার আসর করতে গিয়ে সফল হইনি কিন্তু এতদিন পরে খুবই সহজভাবে যেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো চেনা ও জানা হয়ে গেল।" গল্পের নায়কের একত্রীকরণে তৃপ্তি, সংগ্রামী চেতনা ইত্যাদি যেন লেখকের মনোভাব পাঠকের নিকট অত স্ত স্পষ্ট। লেখক প্রমাণ করলেন স্বপ্নের জাল বুনে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া ভার, কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে জনগণকে সঠিক পথ-নির্দেশে গড়ে তুলতে বহু শ্রমিকের জীবনপণ সংগ্রাম ও আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছে। শিল্প-সাহিত্য যে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, সেটা লেখক সার্থকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রভাত কুমার গোস্বামীর 'নাগপাশ' উপন্যাসে গণসংগ্রামের জয়ই হয়েছে। তাঁর 'নোয়ার নৌকো'র বিচার গল্পে দেখানো হয়েছে গৃহকর্ত্রী গৃহকর্তাকে অহেতুক ভাবে সন্দেহ করায় গৃহকর্তা ও আয়ার জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এল। গৃহকর্ত্রী আত্মহত্যা করে প্রতিশোধ নিলেন। গৃহকর্তাকে বলতে শোনা গেল,—"নির্দোষী হয়েও দোষীর দণ্ড ভোগ করছি আমরা, কিন্তু এই সান্ত্বনা নিয়ে আমরা মরতে পারবো যে অবিচার শুধু আমাদের ওপরেই হয়নি।" বিচারের নামে মিথ্যা ষড়যন্ত্রের সপক্ষে বিচারপতির রায় কিভাবে মানুষের জীবনে বিপর্যয় নামিয়ে আনে, সেটাই তুলে ধরা হয়েছে।

মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্তের 'অতসী পৃথিবী'তে আছে জীবনের অসংগতি, বেদনার্ত জীবনের কান্না, রিক্ত-বঞ্চিতদের হাহাকার, ক্ষুধার্ত নিপীড়িত অত্যাচারিদের গুমরে-মরা অভিমান আর বিদ্রোহ খুব সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, যেখানে সুহাসিনীর ব্যক্তিমানস অপমানের দীপ্তদহনে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে—সেখানে লেখিকার কলম সার্থক। সমাজের অত্যাচারে জর্জরিত মমতাময়ী মালতীর রাজনৈতিক সচেতনতা পাঠককুলকে উৎসাহিত করে।

কালিদাস রক্ষিত তাঁর রচনায় যুগোচিত জ্বালা-যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন এবং তার থেকে উদ্ধারের উপায় হিসেবে সংগ্রামী মনোভাবকেই পথ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তাঁর 'অপরাজেয়' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অমল চক্রবর্তীর গল্প-রচনায় দেখি লেখক ধ্বংসের ইঙ্গিত পেয়ে সৃষ্টি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন সুন্দর, নতুন কিছু গড়তে হলে ভাঙাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাঁর 'আবিষ্কৃত পৃথিবীর মাটি' গল্পের এক জায়গায় আছে,—"একটা কিছু ভাঙার শব্দ যেন আমি টের পাচ্ছি। হয়ত তার পাশাপাশি গড়ার শব্দও। মঙ্গল, মাংরী, যোগব্রত সমাদ্দার, মালতী, হাটের

ওই নগ্ন অর্ধনগ্ন নারীপুরুষেরা—এরাই হয়ত একসাথে কিছু ভাঙছে, কিছু গড়ছে—তারই শব্দ হয়ত ধাক্কা মারছে আমার ভেতরে।”

সংগ্রামী ঔপন্যাসিক শ্রীঅরুণ চক্রবর্তীর ‘শিল্পী’ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে একদিকে জোতদার-জমিদারদের জালিয়াতি চরিত্র, অন্যদিকে রয়েছে শোষিত-বঞ্চিত নিপীড়িত চাষীদের ঐক্যবদ্ধ হ’বার প্রয়াস। অবিচারের বিরুদ্ধে তারা সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। উপন্যাসের এক জায়গায় আছে—“আজকের দিনের জোয়ান চাষারা মার খায়, কিন্তু চোখের জলে সে মার শুধু সয়ে যায়না, মার ঠেকায়, দল বেঁধে রুখে দাঁড়ায়।”

উজ্জ্বল চক্রবর্তীর ‘অপদেবতা’ গল্পে দেখি হাড়সম্বল ক্ষুধার্ত মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে বিপিন শ’দেড়েক লোক সঙ্গে নিয়ে নকুলের বাড়ির ধান জোর করে আনতে যায়, বিপিন নকুলকে বলে,—“ভয় নেই, তোর সংবৎসরের ফসল রেখে বাকি সব নিয়ে যাবে ভুখানাঙা লোকেরা—সকলের কষ্টের চাল গোলায় জমিয়ে পচিয়ে সদরে চালান দেবে তুমি বেশী পয়সায়, আর গাঁয়ের লোক না খেয়ে মরবে!” তখন লেখকের মনোভাব পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট, ভুখা-নাঙা মানুষের প্রতি লেখকের সমবেদনা পাঠকের অন্তরকেও স্পর্শ করে।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্পরচনায় লক্ষণীয় বিষয় হলো অনুভবের গভীরতা ও সংবেদনশীলতা! তাঁর নির্বাচিত গল্পের ‘পাতক’, ‘আততায়ী’, ‘পানশালা’ গল্পগুলো অত্যন্ত মর্মগ্রাহী ও নির্ভেজাল, তাঁর গল্পগুলোতে বিচিত্র ধরণের চরিত্রের সমাবেশ ঘটে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘অগ্নিদগ্ধ’, ‘গহিনগাঙ’, ‘দুই ঠিকানা’, ‘মনোনয়ন’ প্রতিটি উপন্যাস ও গল্পই সংগ্রামী জনগণের সপক্ষে রচিত হয়েছে এবং সচেতন পাঠকের মনের খোরাক যোগাতে সক্ষম হয়েছে। ‘উদ্যোগ পর্ব’ উপন্যাসের ‘কিছুকথা’ অংশে লেখক লিখেছেন,—“যার মূল উৎস রাজনীতি ও আর্থসামাজিক সামাজিক প্রভাব—সাহিত্যে তার সাক্ষ্যের আজ বিশেষ প্রয়োজন।” সামান্য কয়টি কথা থেকেই লেখককে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না।

হাল আমলের প্রগতিশীল কথাসাহিত্যিকরা কল্পনা রাজ্যকে দূরে ঠেলে দিয়ে নেমে এসেছেন জনসাধারণের সঙ্গে মাঠে-ময়দানে,—আন্দোলনের শরিক হয়েছেন, শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী মানুষের সংগ্রামী সাথী হিসেবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাদেরই সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয়, সংগ্রাম-সংগঠন প্রগতিশীল সাহিত্য রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে, তাঁদের দরদ রয়েছে অজ্ঞাত, অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষের

জন্য, আর এখানেই প্রগতিশীল কথাসাহিত্যিক বা গল্প রচয়িতার সার্থকতা।

বর্তমান গল্প বা কথাকাহিনী রচনার মধ্যে দিয়ে শুধু যে প্রগতিশীল গল্প রচনা হচ্ছে তাই নয়—প্রগতিশীল পাঠকও তৈরি হচ্ছে শতসহস্র।

সাম্প্রতিক কালের গল্প-কাহিনীতে বক্তৃতাধর্মী কথোপকথন পূর্বের তুলনায় অনেক কম, অনেক বেশি স্বাভাবিক ও অধিকাংশ কাহিনীই জীবনমুখী। সমাজের জ্বালা-যন্ত্রণা যত প্রকট হচ্ছে গল্পকারের গল্পের আয়োজনও ব্যাপকতর হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে কখনও একটু বেসুরো মনে হলেও সমাজের প্রয়োজনে ও কালের দাবীতেই তা সার্থক হয়ে উঠবে।

ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এবং বেঁচে থাকার তাগাদায় কথাসাহিত্যেও গল্পের গতিপথ যে পথে মোড় নিয়েছে নিঃসন্দেহে তা সার্থকতার পরিচয়বাহী ও সঠিক পথের নিশানা।

কর্মময় জীবনে কাব্য ও সঙ্গীত

প্রকৃতির অমোঘ শক্তি ও প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্যে, কামনা-বাসনা সফলার্থে, কর্মে উৎসাহ-উদ্দীপনা পাবার আশায়, উৎপাদন ও সৃষ্টির কাজেও আদি অনন্তকাল ধরে নর-নারী নির্বিশেষে সঙ্গীত ও কাব্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। আদিম সমাজব্যবস্থায় সুসভ্যতার আলোক পৌছোয়নি, তখনও সঙ্গীতের সুরে তাল মিলিয়ে নর-নারী বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছে, শিকার করেছে, খাদ্য সংগ্রহ করেছে, আত্মরক্ষার্থে যখন যুদ্ধ ও লড়াই করেছে তখনও গানের সুর তাদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং বিভিন্ন ভাবেই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে আপন গতিতেই সুর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কর্মময় জীবনে সঙ্গীত কত বেশি তাৎপর্যময় আদিম জীবনযাত্রায় সেটা স্পষ্টতর, সেখানে শিল্পনৈপুণ্যের কচকচানি নেই, আছে স্বতঃস্ফূর্ত গতিময়তা। বুশের প্রমাণ করেছেন ছন্দের মূল উৎস কর্মময় সুশৃঙ্খল তালের মধ্যেই। সৃষ্টি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে সঙ্গীত অপরিহার্য ও অনিবার্য।

উপনিষদের যুগে ফিরে তাকালে দেখা যাবে ঋষিরা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তির দিকটিকেই বিশেষভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, নিছক আনন্দের খোরাক হিসেবে সঙ্গীতকে গ্রহণ করেননি, সঙ্গীতকে তাঁরা আহ্বান করেছেন। পেটের জ্বালা নিবৃত্তির উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় সামগানের টোটেম গোষ্ঠীর দৃষ্টান্তই উল্লেখযোগ্য—

"Their arts of dancing, music and poetry began as one. Their source was the rhythmical movement of the human bodies engaged in collective labour."

মিলটনের 'Paradise Lost'-এ আছে বৈপ্লবিক চেতনার আভাস। জনগণের দুঃখ-ক্লিষ্ট অবস্থার কথা স্মরণ করে ব্যথিত-ক্লান্ত শেলী অত্যাচারিত লাঞ্ছিত জনগণকে রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়ে বললেন, 'Rise like lions.'

শিল্পী আর্নস্ট টলার খুব ভালো পিয়ানো বাজাতেন, কিন্তু নিপীড়িত-লাঞ্ছিত অপমানিতের যন্ত্রণায় তাঁর অন্তর মথিত করে কলমের মুখে বেরিয়ে এল,—

'ওঠো, জাগো :—নিজ হস্তে ক্ষমতা ধরি
শত্রুরে দমিতে সাহস করো সঞ্চয় ;
তব পদতলে শত্রুরে করিলে মথিত,
বিজয়মালা তবে শোভিবে
তব গলে।"

উনবিংশ শতাব্দীর বেশ কিছু ইংরেজ কবির কলমও বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে, কেউবা খাঁটি মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গিতে, কেউ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় আস্থাবান হয়ে আবার কেউ বা মার্কসীয় বিচারে। সুইন বার্নের "Songs before Sunrise" ইতালীর স্বাধীনতা পিপাসু জনগণের কাছে গণবিদ্রোহের শপথ বাক্য হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছিল। সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র ও প্রগতিশীলতায় আস্থাবান Willam Moris অমানুষ মুনফাখোরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিলেন, তাঁর কাব্যগাথায় তা' সুপরিস্ফুট। যুগচিত বাস্তব সচেতনতা জাগ্রত করতে ব্রাউনিং অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘোষণা করলেন :

"Strive and thrive ! Cry, 'Speed',
fight on, fare ever
There as here !"

পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলোর দিকেও চোখ মেলে তাকালেই দেখা যাবে জনগণের কামনা-জর্জর মনের পরিচয় গানের মধ্যে আছে। তারা তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, অপমান সব কিছুই সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করছে।

শান্ত-নিরক্ষর সাঁওতালদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জমিদার মহাজনরা তাদের বঞ্চিত করে তাদের ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নিজেদের লালসার তৃপ্তি ঘটাতেই যখন অভ্যস্ত ছিল তখনও ব্রিটিশ শাসক এই অন্যায় অত্যাচারের কোন প্রতিবাদ জানায়নি। ১৮৫৫ সালে সহস্র সাঁওতাল জেহাদ ঘোষণা করে রুখে দাঁড়িয়ে বলল,—

"আমরা বাঁচব, আমরা উঠব, কেউ আমাদের পাশে দাঁড়াবে না
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব
......।"

মহা চীনের প্রাচীন কবি তুফু (TuFu) চীনের জনগণের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছেন কান্না পরিত্যাগ করে সুন্দর দেশ, সুখের দেশ গড়ে তোলার

জন্মে কৃষিকাজ ও বুননের কাজে মনোনিবেশ করতে। তিনি তাঁর "Song of the Silk Weavers And Harvesters" সঙ্গীতের মধ্যে বলেছেন :

Rather
From the men harvesting
From the Women spinning
Would there come back to us
Song of happiness." (অনুবাদ Rewi Alley)

কিউবা যখন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তখন তাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত ধরে সমস্বরে গেয়ে উঠলেন :

"When one dies
In the arms of a greatful fatherland
Death ends, prison walls break—
Finally with death, life begins."

অর্থাৎ জন্মভূমিতে যখন একজনের আত্মবিসর্জন ঘটে, সেখানেই মৃত্যুশেষ, কারাগারের দেয়াল ভেঙে পড়ে—প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু-মূল্য দিয়েই জীবনের শুরু।

রাশিয়ার জীবনযাত্রাতেও শ্রমের সঙ্গে সঙ্গীত একাত্ম হয়ে রয়েছে, তাদের লোকসঙ্গীতে শোনা গেল :

"আমরা জঙ্গল সাফ করলাম, সাফ করলাম
হে দিদো হে লাদো। সাফ করলাম, সাফ করলাম।"

অথবা রাই কাটার সময় কাস্তে হাতে নিয়ে গান গাইতে গাইতে মাঠে নামে।

"এ বছর রাই-মাতা যেমন বাড়লে, ক্লান্ত হলেনা
তেমনি আমার শিরদাঁড়া যেন ফসল কাটতে গিয়ে
ক্লান্ত না হয়।"

একটি পাঞ্জাবী লোকগীতিতে আছে :

"আমার চরকা নিয়ে যাও ওখানে
তোমার হাল চলছে যেখানে।"

বহুকাল আগে বর্গীদের লেভির নাম দিয়ে গরিব চাষীদের থেকে ফসল লুঠ করে নিয়ে যাওয়া, বিভিন্নভাবে তাদের মনে ভয়ের আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া

ইত্যাদি প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ছবি আছে টুসু গানে :

"লেভি নিতে অ্যালে মারবে গো ঝাঁটা
আইন কানুন মানব নাইকো ভাঙব
বুকের পাটা।"

সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্গীদের অত্যাচার এবং জমিদার মহাজনের শোষণেরও সমাপ্তি ঘটেছে, গ্রামবাসী আনন্দে গান ধরলো :

"টুসু ইবার জাগছে চাষী রক্তে রুয়া তুলছে ধান।"

প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে সামাজিক অবস্থার পটপরিবর্তনের সাথে সাথে সঙ্গীতের বিষয় ও সুরেরও পরিবর্তন হচ্ছে, কারণ সঙ্গীত সমকালীন অবস্থাকে ছন্দবদ্ধ বাণীতে তুলে ধরে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যেতে পারে, নীলবিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, কৃষকবিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ —ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্রোহের সঙ্গীত আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে এসেছে আর তার কাব্যময় ভাষা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে জনগণের অন্তঃস্থল পর্যন্ত নাড়া দিয়েছে।

পরাধীন ভারতবাসী বঙ্কিমচন্দ্র, ডি. এল. রায়, অতুল প্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, মুকুন্দ দাস, নজরুলের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের দ্বারা লড়াই ও আন্দোলনে অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'বন্দে মাতরম', 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা', 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী', 'পণ করে সব লাগরে কাজে', 'আসিয়াছে নামিয়া ন্যায়েরই দণ্ড', 'আমরা ছাত্রছাত্রী দল' প্রভৃতি সঙ্গীতের কথা। এ রকম আরও বহু সহস্র সঙ্গীত দেশী-বিদেশী ভাষায় আছে। স্বদেশী সঙ্গীত গাইতে গাইতে কত লক্ষ লক্ষ মানুষ ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছেন,— পুলিসের বর্বরোচিত অত্যাচারের বলি হয়েছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণের মনে ঘৃণার উদ্রেক করতে সক্ষম হয়েছে এইসব সঙ্গীত।

খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী কালের মধ্যে জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্য, জীবনযাত্রা জনগণের কণ্ঠেই সুরেলা ভাষায় সংঘবদ্ধভাবে প্রাণবন্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ, ধনতান্ত্রিক সমাজ, জমিদার-জোতদারের শাসন-শোষণ সমস্ত কিছুই গ্রাম্য সুরে পাওয়া হয়েছে—বিভিন্ন জিলায়। বিভিন্ন অঞ্চলের সময়োপযোগী, ঋতু উপযোগী গ্রামীণ সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবনের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি পল্লীগীতি, লোক-

গীতির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে উঠেছে। নির্ভেজাল মনের আকুতিই এ ধরনের সঙ্গীতের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। বাউল, সারি, জারি, ভাটিয়ালি, পাঁচালি, ভাদু, টুসু ইত্যাদি আঞ্চলিক সঙ্গীতগুলোরও জীবনের সঙ্গে আত্মিক যোগ রয়েছে। জীবনের প্রয়োজনেই লোকসঙ্গীতের মধ্যেই বিদ্রোহের সুর ঝংকৃত হয়। তখন আবার সেগুলো বিদ্রোহী সঙ্গীত অথবা স্বদেশী গান বলেও পরিচিত হয়। নবজাগরণের চারণ কবি মুকুন্দ দাসের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গান উল্লেখযোগ্য। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে কিছু সঙ্গীত রচিত হল ও গাওয়া হলো যেগুলোকে স্বদেশী সঙ্গীত বলা হয়ে থাকে। দেশ স্বাধীন হলো—কিন্তু অত্যাচার উৎপীড়নের হাত থেকে রেহাই মেলেনি আজও। বুর্জোয়া শাসনের যাঁতাকলে আজও মানুষের শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা, জনগণ মুক্তিপথের উপায় খুঁজতে লাগলো যার ফলস্বরূপ পাওয়া গেল গণসঙ্গীত। আজ শহর থেকে গ্রামে পর্যন্ত, মাঠে ময়দানে, কলে কারখানায়, সভা সমিতিতে গণ-সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে। 'এসো মুক্ত কর, মুক্ত কর মুক্ত কর এই অন্ধকারের দ্বার', 'শত ফুল বিকশিত হোক', 'আমরা এই দুনিয়ায় জীবনের গান শোনাই' ইত্যাদি গণসঙ্গীতগুলো জনজীবনে আলোড়ন জাগায়। তাছাড়া 'মে দিবসের' গানগুলো এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কর্মময় জীবনের সঙ্গে সুরের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তা আজকের গ্রাম-শহর নাগরিক জীবনেও সত্য। কলে কারখানায় শ্রমিকরা কাজে উৎসাহ পাবার জন্যে, দাবি আদায়ের জন্যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে সঙ্গীতকে হাতিয়ার করে নেয় যাতে দশজন শ্রমিকের মর্মযন্ত্রণা শত সহস্র শ্রমিকের মনেও আলোড়ন জাগাতে পারে। যে সকল শ্রমিক নিরক্ষম, বিদ্রোহের সঙ্গীত, বিপ্লবের সঙ্গীত তাদের মনেও সমান আবেদন পৌঁছে দেয়। দুঃসাধ্য ভারী কাজ করতে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকরা সঙ্গীতকে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করে, গানের তালে শ্রমের কঠোরতা তীব্র না হয়ে কাজটা সহজসাধ্য হয়। নৌকো বাওয়ার গান, ধান ভানার গান, মাটি কাটার গান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আদিম মানুষ তো সংঘবদ্ধভাবেই অধিকাংশ কাজ করত, ক্ষেতে সোনার ফসল ফলাতো আর মহানন্দে সঙ্গীতের সুরে মত্ত হয়ে একত্রে পরিশ্রম করত। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে বিশেষতঃ কর্মময় জীবনে ও সম্মিলিত জীবনযাত্রায় সঙ্গীত চিরকাল মিলন সূত্রের কাজ করে এসেছে। পারস্পরিক মিলনোৎসবের বিরাট যোগসূত্র হল সঙ্গীত। আদিম মানুষ জমি চাষ করত, শস্য বপন করত, কোদাল চালাত, কাস্তে

চালাত আর অনুপ্রেরণা লাভ করত সঙ্গীত থেকে। সঙ্গীতের উন্মাদনায় পরিশ্রমের কাজও অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক বেশি পরিশ্রম করতে সমর্থ হয়—উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটে, অর্থনৈতিক চাহিদা মেটে। সংঘবদ্ধভাবে গাইতে গাইতে ওরা অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছে, হিংস্র পশুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

দেশবাসী যখন কমরেড লেনিনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন— "কমরেড লেনিন লও লাল সালাম", "এ্যায়মেরে মজদুর কিসানো কমরেডো", "কমরেড জেগে থাকো" তখন যেন লক্ষ লক্ষ সুপ্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয় একসঙ্গে, একসাথে লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মিক যোগ ঘটে,—এখানে পাণ্ডিত্যের কচকচানি নিতান্তই মূল্যহীন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেই সঙ্গীত প্রধান অংশগ্রহণ করেছে। শহীদের আত্মবিসর্জনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সঙ্গীতের সুরে জনগণের কণ্ঠে যখন ঐক্যবদ্ধভাবে ধ্বনিত হয়—'ও আমার শহীদ বন্ধুরে', 'শত শহীদের খুনে রাঙা ঐ' তখন সেগুলো যেন মানুষের মনের গভীর তলদেশকেও নাড়া দেয়।

কবির আত্মীয়তা সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে, কবিমানস হবে সমাজ সচেতন ও সমাজমুখী। জনজীবনের সমস্যা-পীড়িত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না প্রগতিশীল কবির কলমে ফুটে ওঠে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে সচেতন কবিগোষ্ঠী মনে করেন শ্রমিকের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে সাহায্য করা, বুভুক্ষু জনগণকে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করা তাদের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। পৃথিবীর এক বৃহৎ সংখ্যক কবিগোষ্ঠী এই চিন্তাধারাকেই শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন। চীনের কবি Aiching-এর 'Protect Peace' নামক কবিতায় আছে :

"all the workers of the world, unite
to use together the strength of our
arms, to change the fate of humanity."

অর্থাৎ বিশ্বের সকল শ্রমিককে একত্রিত হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে মানব-জাতির ভাগ্য পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

অথবা Li Tien-Min-এর 'For Peace' কবিতায় আছে :

"our working people are supreme master of the land
never shall we return to the time...
.... ।"

(অনু: Rewi Alley)

রুশী কবি ইয়াকলি আবাশিদ্জে আহ্বান জানিয়েছেন, বিভেদ-বৈষম্য মুছে দিয়ে সকলকে একত্রিত হতে,

"কারো মনে ভয় জাগাবে না কোনো নৈশ অস্ত্র খেলা,
এসো বন্ধুরা, কাছাকাছি হও, ফৈয়জও মুছে যাক্ !

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথ মর্মযাতনায় ছটফট করতে লাগলেন, অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস এ রকম সংকটপূর্ণ অবস্থায় কবির সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। তাই তিনি মনুমেণ্টের বেদীতলে গিয়ে দাঁড়ালেন—নির্ভীক কণ্ঠে ধ্বনিত হল: 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।'

পরাধীন ভারতবাসীর অত্যাচার অপমান মর্মযন্ত্রণাকে উপলব্ধি করে বিদ্রোহী কবি নজরুল প্রতিবাদ জানালেন :—

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
যবে অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।"

সমাজ সচেতনতা, বৈপ্লবিক চেতনা, স্থির প্রত্যয় নিয়ে কবি সুকান্ত শাসকের রক্তচক্ষুকে পরোয়া না করে অত্যাচারিত জনগণের নিকট আবেদন জানালেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে,—

"শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।"

দেশের জন্য সংগ্রাম করে কারাগারে বন্দিনী মহিলা কবি কনক মুখোপাধ্যায়ের মনের একান্ত আকুতি—কোনরূপ কৃপা-করুণা নয়,—তিনি বললেন, —একটি শপথ রেখো—

'বন্ধু আমার
বন্দী সাথীর একটি অহংকার
করুণ অশ্রু ফেল না আমার দুঃখে
আমার জন্যে কোর না মুক্তিভিক্ষা।

অথবা, উল্লেখ করা যেতে পারে '৭৪ সালের রেল ধর্মঘটের দিনে কমরেড রামস্বামী পাইলট কারের নিচে শহীদ হয়েছিলেন। স্ত্রী রাকাম্মা স্বামীর হাতের

রক্তপতাকা হাতে নিয়ে অপরিসীম সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়ালেন। উপস্থিত সকলে 'রামস্বামী জিন্দাবাদ' ধ্বনি দেন। বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ছন্দোময় ভাষায় দরদীভঙ্গিতে আরও বহু সহস্র সহস্র নারীকে স্বৈরতান্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যাতে সাহায্য করে তাই কবি বললেন,—

"...... কান পেতে শোন
সেই ভয়ঙ্কর 'পাইলট গাড়ির' আওয়াজ রক্তপিপাসু
দস্যুদের পদধ্বনি তুলে ধর, আরো ঊর্ধ্বে তুলে ধর
ভূলুণ্ঠিত শহীদের হাতের পতাকা।"

যখন প্রগতিশীল ও সংগ্রামী কবি প্রণব চট্টোপাধ্যায় জনগণের সামনে তুলে ধরেন—এক পৃথিবী মানুষের বাঁধন, হাতের কাছে সাপকে মারার লাঠি, সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন তখন বহু সহস্র সহস্র মানুষ সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন।

শোষণ নিপীড়ন বঞ্চনা জ্বালা বিড়ম্বনায় কবির অন্তর ব্যথিত, বিচলিত—কবির প্রশ্ন—'কুঁড়ি তুমি ফুল হবে কবে?" দৃঢ় সংকল্পে এগিয়ে চলেছেন—ঘোষণা করলেন, 'সিঁড়িগুলো ভেঙে ভেঙে আমি ক্রমশঃই উঠছি।" তারপর স্থির প্রত্যয় নিয়ে কবি শ্যামসুন্দর দে বললেন—

"অরণ্যের অন্ধকার পার হলেই সভ্যতার বিজয় নিশান উড়বে।"

ইরা সরকার শোষণ মোচনের স্বপ্ন দেখেন, শেকল ভাঙার গান শোনেন, তাই তাঁর কলমে ফুটে উঠলো,—

'মাটিতে ফলে ওঠে প্রাণের অগ্ন,
শেকল হারাবার মিছিল ও স্বপ্ন।'

এমনি আরও কত শত কবি জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে প্রতিটি কথা কবিতার মধ্যে ছবির মত লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং রাখছেন।

কবে থেকে কাব্যরসের সৃষ্টি তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা কঠিন তবে বহু প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্তই বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল যে, আজো পাড়াগাঁ-গুলোতেও মানুষ তাঁদের যাবতীয় বাসনা-কামনা, দুঃখ-দারিদ্র্যকে মুখে মুখে ছড়ায় বা ছোট ছোট কবিতায় ধরে রাখতে চেষ্টা করে আসছে অনন্তকাল ধরে। ছন্দবদ্ধ ভাষা গ্রামবাসীর মনে অত্যন্ত সহজে আবেদন পৌঁছে দিতে পারে। আর সেই ছন্দময় ভাষা যদি সুরের মধ্যে ধ্বনিত হতে পারে তবে এটাই তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি উপভোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়।

সঙ্গীত বা কবিতার বক্তব্য অনেক সময়ই নিরক্ষর বা অশিক্ষিত ব্যক্তির কাছে বোধগম্য হয় না,—কিন্তু সুরের স্পর্শ ও ছন্দই মনকে আকর্ষণ করে—তাই আদিকাল থেকেই কবিতা ও সঙ্গীতের জগৎ এত বিস্তৃত ও ব্যাপক। এমনকি অপরিবর্তিত ভাষায় রচিত সঙ্গীতের সুরেলা কণ্ঠ মনের গহনে আবেদন পৌঁছে দেয় ও মনপ্রাণকে আকৃষ্ট করে।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, মন্বন্তর-বিরোধী, ধর্মঘট ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষায় রচিত গানগুলো সহজতর পথে দেশবাসীর মনকে সুপ্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত করতে পারে। নৌবিদ্রোহের ঘটনার ওপর রচিত 'নীল সমুদ্র লাল হয়ে গেল নাবিকের রক্তধারায়' অথবা 'চাষী দে তোর লাল সেলাম', 'ও মোদের দেশবাসীরে' ইত্যাদি সঙ্গীতগুলো স্বাদেশিকতা, প্রীতি ও আন্তরিকতায় জনগণের মন ভরিয়ে তোলার বন্ধন-সেতু।

সঙ্গীত জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করে আছে যুগ যুগ ধরে। জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভাল-মন্দ, প্রয়োজনীয়তা—সব কিছুই কবিতায় যেটুকু অব্যক্ত থাকে সঙ্গীতে তার পূর্ণতা ঘটে। কর্মময় জীবনের পরিপূর্ণ ছবি কাব্য সঙ্গীতের আঙিনায় সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপন করে নিতে পারে তবেই কাব্য সঙ্গীতের শিল্পে নৈপুণ্যের প্রকৃত সার্থকতা আর জনগণেরও এটাই সবচেয়ে বড় দাবি।

প্রগতি সাহিত্যের আঙিনায় মহিলা লেখকদের ভূমিকা

সমাজ-সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি কখনই সমাজ-বহির্ভূত কিছু ভাবতে পারেন না। কারণ সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-সংস্কৃতি কর্মীরা তো সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। সামাজিক উন্নয়নমূলক চিন্তা-ভাবনায় এবং সঠিক পথে পরিচালনা করে অগ্রগতির পথে সমাজকে নিয়ে যেতে পারলেই সার্থক শিল্পী বা সাহিত্যিকের দায়িত্ব পালন করা হয়। আর প্রগতিমুখী চিন্তাধারার এটাই প্রকৃত নমুনা এবং সচেতন মানুষেরও তাদের কাছে এটাই বড় দাবি। স্বভাবতই সচেতন শিল্পীমাত্রই সমাজের মানুষের দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, ভাল-মন্দ ও জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়েই তাদের শিল্প-সৃষ্টিকে সার্থক করে তুলতে সক্ষম হন।

সমাজ-সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকদের শ্রেণীগত বা চিন্তাভাবনা-আদর্শের দিক থেকে পুরুষ ও নারীর মধ্যে মূলগত কোন প্রভেদ নেই। এই ঘুণে-ধরা সমাজ-কাঠামোর যাবতীয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সমাজ-সচেতন মহিলারাও পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা মিলিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁরাও সুন্দর সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে শিল্প-সৃষ্টি, সাহিত্য-সৃষ্টি, কাব্যচর্চা ও সংস্কৃতি চর্চায় যোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন, করছেন।

ডঃ উষা রায়-এর ভাষায় 'এ যুগ তো সে যুগেরই একান্ত সৃজন। সে যুগের মৃত্তিকায় রসপুষ্ট এ যুগের মন'—পংক্তি দুটির যথার্থতা বিচার করে একটু পিছন ফিরে তাকানো দরকার, তাহলেই দেখা যাবে আজকের সংগ্রামী মহিলা-কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে একটা মূল ভিত আছে। বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আঙিনায় ঠাকুর বাড়ির স্বর্ণকুমারী দেবী ও সরলাদেবী চৌধুরাণীর ঐতিহ্য স্মরণ করার মত। স্বর্ণকুমারী দেবীর কাব্য-উপন্যাস ও সাহিত্যের খ্যাতি সকলেরই জানা। দীর্ঘদিন তিনি 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সরলা দেবীর স্বদেশী গান-রচনা, কিছু কিছু গানে সুর সংযোজন তৎকালীন সময়ে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল এবং দেশবাসীর মনে সাড়া জাগিয়েছে। পরাধীন জাতির বেদনা ও যন্ত্রণাকে কাব্যে তুলে ধরলেন কামিনী রায়। ঘরোয়া জীবনকে কেন্দ্র করে কবিতা লিখলেন মানকুমারী বসু। তাছাড়া কাব্য-সাহিত্য চর্চার অঙ্গনে এক নজরে যাঁদের কথা স্মরণে আসে তাঁরা হলেন: অনুরূপা দেবী,

প্রিয়ম্বদা দেবী, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, ইন্দিরা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, আশাপূর্ণা দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী প্রমুখ। এছাড়া যারা প্রগতিমুখ সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে পুরানো সমাজব্যবস্থার গণ্ডিকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন তারা হলেন হেমলতা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী ও কুমুদিনী দেবী প্রমুখ।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক যন্ত্রণার কতগুলো দিক আছে অনুরূপা দেবী, সীতা দেবী ও শান্তা দেবীর উপন্যাসগুলোতে। এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজে নারী জাতির দাসত্ব, শৃঙ্খলাবদ্ধ শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা, সামাজিক কুসংস্কার এবং রীতিনীতির নির্মম নিষ্ঠুর অবস্থার বলি যে নারীসমাজ তার নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন অনুরূপা দেবী তাঁর 'মা', 'গরিবের মেয়ে', 'জ্যোতিঃহারা', 'চক্র' ও 'পথহারা' উপন্যাসে। সীতা দেবীর 'বন্যা', শান্তা দেবীর 'জীবন-দোলা' উপন্যাসগুলোতেও বাঙ্গালী সমাজের জীবন্ত চিত্ররূপ পাওয়া যায়। একদিকে সংস্কার নামক সামাজিক ব্যাধিগুলো কি রকম অভিশাপ হয়ে নারীজাতির জীবনে চেপে বসে আছে, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থলোলুপ, অর্থগৃধ্নু মনের বীভৎস চিত্র ফুটে উঠেছে তাদের সহজ সাবলিল কথা শিল্পে। সামাজিক ঘৃণ্য কুসংস্কারের প্রতি লেখিকাদের মনোভাব ছবির মত স্পষ্ট।

আর্থিক মানদণ্ডেই মূলতঃ সামাজিক অবস্থা নিরূপিত হচ্ছে। 'শুভ', 'অশুভ', 'পয়মন্ত', 'বিধি' শাস্ত্রীয় অনুশাসন ইত্যাদি ব্যাপারগুলোর ভারবোঝা প্রধানতঃ নারীজাতিকে এবং শোষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীকেই বইতে হয়, যা নাকি সামাজিক উন্নতির পথে অন্তরায়, পরিশীলিত চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটানোর পক্ষে বিরাট অন্তরায়। অনুরূপা দেবীর 'গরিবের মেয়ে' উপন্যাসে আছে, পিতা যথেষ্ট যৌতুক ও পণ দিতে না পারায় শ্বশুরবাড়িতে কন্যার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার চিত্র। সেখানে শাশুড়ি পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে বলছেন—"কিপ্‌টে বাপ মিন্‌সে লেপ দিলে না, তাঁর মেয়ের জন্যে ঘরের পয়সা ভেঙ্গে লেপ তৈরি করবো নাকি?" একই সঙ্গে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সমাজ-সংস্কারের ঊর্ধ্বেও এক ধরনের বিশ্রি ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা ও আর্থিক লোভের চিত্রও অনুরূপা দেবীর লক্ষ্য এড়িয়ে যায়নি। তাই দেখ 'গরিবের মেয়ে' উপন্যাসে ছেলে পড়াশুনা করছে না কিন্তু মেয়েকে পড়ানো হচ্ছে—"যে বাড়িতে ছেলের বিদ্যাশিক্ষা নিষেধ, সেই বাড়িতে মেয়ে চলিল স্কুলে ভর্তি হইতে?" এর মূল অভিপ্রায় হল কন্যাকে উচ্চবিত্ত-সম্পন্ন ঘরে-বরে সম্প্রদান।

অনুরূপা দেবীর 'পথহারা' উপন্যাসে আছে সন্ত্রাসবাদের প্রতি সমাজের যুবশক্তির আকর্ষণ,—রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের সংঘাত বেশ পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট। দেশের সমস্যা সম্পর্কে তিনি মোটেই উদাসীন ছিলেন না, শোষিতদের কথা ভেবে যন্ত্রণাও বোধ করতেন কিন্তু তার থেকে উদ্ধারের কোন পথনির্দেশ নেই।

শান্তাদেবী তাঁর 'জীবনদোলা' উপন্যাসে দেখিয়েছেন যে, এই সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে নারীকে বোঝা, ভোগ্যপণ্য ও যন্ত্র হিসেবেই দেখা হয়, এর বেশি নারীজাতির কোন মর্যাদা নেই, পুরুষই সমাজের প্রধান। উপন্যাসের একজায়গায় আছে—"জানেনই ত মেয়ে সন্তান হচ্ছে পূর্বজন্মের ঋণ, যতদিন ধরে রাখবেন ততদিনই সুদ বাড়তে থাকবে, টাট্‌কা পার করে দেওয়া ভাল, না হলে বুঝলেন কিনা মশায়, ঐ যাকে বলে চক্রবৃদ্ধির হার। পুরুষ সন্তান মূলধন, যত খাটাবে অর্থাৎ কিনা যত মাজবেন তত দাম বাড়বে।" অন্যত্র আছে: 'মেয়ে জাত হবে কেঁচোর জাত, মার খেলে গুটিয়ে যাবে, তবে না মেয়ের গুণ গাইবে লোকে।" এই সমাজে নারীজন্ম যে শুধুমাত্র পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্যে, তাদের ভোগবিলাস ও লালসা পরিতৃপ্তির জন্যে, মানুষ হিসেবে তাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বের মূল্য নেই তারই নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

সীতাদেবী তাঁর 'বন্যা' উপন্যাসে সেটা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তিনি ক্ষীণ আলোর আভাসও যেন পাচ্ছেন। তাই অনিন্দিতার মুখে তুলে ধরলেন: "আমাদের দেশের মেয়েরা ভাল স্বামী পাবার উপযুক্ত নয়। মার খেতে সর্বদা যারা পিঠ পেতে বসে আছে, তাদের অন্ততঃ একটা চাপড় মারবার লোভ কজনে সামলাতে পারে? আমাদের ছেলেরা ত পারবেই না, তারা বাইরে শাদা পায়ের লাথি খেয়ে যে রাগটুকু জমা করে তা এমন সহজে খরচ করবার সুবিধা তারা কি করে ছাড়বে? অত্যাচারের তলায় যাদের থাকতে হয় তারাতো সবচেয়ে বেশী অত্যাচারী হবেই, আর আমরা যে আদর্শ নারী ঠিক করে রেখেছি তাঁকে, যাঁর পিঠে সবচেয়ে বেশী জুতোর দাগ আছে।"

আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' বৃহৎ উপন্যাস খানিতে একজন দরদী কথাশিল্পীকে পাওয়া যায়। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ও শৈলবালা ঘোষজায়া-র উপন্যাসে সামাজিক সমস্যা আছে, দরদও আছে কিন্তু মুক্তিপথের কোন ইশারা নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে সামাজিক জীবনে বহুরকম উত্থান-পতন ঘটে গেছে। ভাঙা-গড়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে দীর্ঘদিন, মানুষ রাজনৈতিক ঝড়-ঝঞ্ঝায় কেউ মরণপণ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী, কেউ ভুক্তভোগী, কেউ সুযোগসন্ধানী, কেউ বাস্তুচ্যুত, কেউ বা দিশেহারা বেঁচে থাকার তাগাদায়—স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক জীবনেও অনেক পরিবর্তন এসেছে—এ রকম একটি টালমাটাল অবস্থায় কোন সচেতন সার্থক শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি শুধু নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেন না। প্রকৃত শিল্পীর দায়বদ্ধতা ও মানসিক সচেতনতাই সৃষ্টির খোরাক এবং প্রেরণা যুগিয়েছে, সমাজ-সচেতন মহিলাশিল্পীরাও তার থেকে বাদ পড়েননি। তাদের কেউ বা মানবিকতার তাগিদ নিয়ে এগিয়ে এলেন, কেউ বা সচেতন মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিল্প-সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত হলেন, জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, একাত্ম হয়ে, জনগণের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও সংগ্রামের সাথী হয়ে। শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবন যন্ত্রণার সমব্যথী হয়ে প্রগতিশীল শৈল্পিক চিন্তাভাবনায় বিশ্বাসী সচেতন মহিলারাও সুস্থ-সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। গল্প-উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও এক ধরনের নতুন মোড় নেয়, গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা রাজা-জমিদার বা দেব-দেবী নয়, নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ, বিষয়বস্তু হচ্ছে আমাদের চারপাশের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। জীবন-সংগ্রাম-শিল্প-সাহিত্য হয়ে উঠেছে জীবন-কেন্দ্রিক। এই আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে চলে সামাজিক সংঘাত, কখনও বা তার থেকে উদ্ধারের ইঙ্গিত।

সমাজ কল্যাণের নামে এক ধরনের ভাঁওতাবাজি, বিশ্রী রাজনীতি এই সমাজের বুকে চলে আসছে। একদল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী 'জনহিত' করার নাম করে মানুষকে প্রবঞ্চনা করছে, সমাজকল্যাণ নামক মুখোশের আড়ালে এক প্রকার জঘন্য মনোবৃত্তি কাজ করছে, যা সমাজকে পেছনের দিকে ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে যায়। শোষিত নির্যাতিত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের মনে যার তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। চল্লিশ বৎসরের অধিককাল জীবন সংগ্রামের শরিক ও মার্ক্সীয় চিন্তাভাবনায় বিশ্বাসী সংগ্রামী নেত্রী কনক মুখোপাধ্যায়ের 'ফিরে পাওয়া' গল্প-গ্রন্থের 'সমাজ সংহার' গল্পে একটি অংশ তুলে ধরছি :

"সিস্টিলাদেবী : আরে ছিঃ ছিঃ, আমার আশ্রমে এসব অধর্ম চলতে পারে কখনও ? কোথাকার কোন্ রিফিউজি নাকি, চাল নেই, চুলো নেই, জাতজন্মের

খবরই বা কে রেখেছে ওর বল ? হ্যাঁ-যত-সব-এখন বলে কিনা আপনিই আশ্রয় ! আর ঐ দুশ্চরিত্রা কুলটার জন্যে তোমাদের ঐ সুপারিনটেণ্ডেট মেয়েটারই বা কি কাঁদুনি। বলে কিনা, অনাথা মেয়ে, কোথায় বের করে দেব ? কোথায় বের করে দেবে তা আমরা কি জানি ? শেষটায় আমাদের নামেই যদি দুর্নাম রটে যায়। তবে বাইরের সাহায্যের টাকা নিয়ে গোলমাল হতে পারে না ?"

লেখিকা দেখিয়েছেন যে, এ ধরনের সমাজ কল্যাণের নামে অকল্যাণ চর্চাই অধিকতর মাত্রায় হয় এবং সভানেত্রী ও অন্যান্য সদস্যদের আচরণে এটা পরিষ্কার যে 'কল্যাণ' ব্যাপরটি তাদের কাছে পুরোপুরি ভড়ংমাত্র, শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতনের নামে একটি মুখোশমাত্র। গল্পের আলোচ্য বিষয় 'সমাজ-সংস্কার ও নারী প্রগতি'। বুর্জোয়া দৃষ্টিতে 'সংস্কার' ও 'প্রগতির' প্রকৃত চরিত্রের সুস্পষ্ট চিত্র লেখিকা তুলে ধরেছেন। দীর্ঘদিনের সংগ্রামী লেখিকা কনক মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতালব্ধ ফসল তাঁর বিভিন্ন গল্পে উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। তাঁর বন্দীদশায় লেখা 'বন্দী ফাল্গুন' উপন্যাসখানি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'শিল্পী', 'পদযাত্রী' গল্পগুলোর মধ্যে দিয়ে লেখিকা যেন সরাসরি একটি দরদী মন নিয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছে যান যে দরদী মন একটা সুস্থ সুন্দর পথ দেখাতে পারে।

শ্রীমতী নিরূপমা বরগোহাঞি-এর 'গোঁহানী আই গোঁসানী আই' একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সামাজিক অস্থিরতার বিষময় চিত্র এবং মাতৃস্নেহের অন্তলস্পর্শী গভীরতা কিভাবে পরিবার, সমাজ, জাতিকে অতিক্রম করে সমগ্র মনুষ্য সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়েছে তারই একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। তাই পুত্রের 'বিদেশী তাড়ানো' রাজনীতির প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রীমতী গোস্বামী বললেন,—"তুইও জেনে রাখবি অপু যে আমার জন্য সব মা এক মা, সন্তানহানি হলে, সে সব মায়ের অন্তরেও একই আগুন জ্বলে, তাদের চোখের জলও কোনদিন শুকায় না।" কন্যা রুণী মায়ের বিশ্বব্যাপী মাতৃত্ববোধে আবেগপ্রবণ হয়ে বলে,—"মা, মা, তুমি সত্যি করেই মা, সব্বারই মা, হলধরের মা, রজব আলীর মা—আমরা এই তিনটি ছেলেমেয়ে ছাড়াও তুমি পৃথিবীর সব সন্তানেরই মা"।

একটা মানুষের প্রথম পরিচয় তাঁর মনুষ্যত্ববোধের মধ্যে দিয়ে, আর বিশ্বব্যাপী দুটিই শ্রেণী—শোষক ও শোষিত। সকল শোষক ও সকল শোষিত শ্রেণীই মূলত একই চরিত্র, কাজেই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, জাতধর্মের ভেদাভেদ, দেশীয় ভেদাভেদ অথবা বিচ্ছিন্নতাবাদ সবটাই মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী পুঁজিপতি গোষ্ঠীর

মুনাফা লুঠে নেওয়ার মতলব ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রীমতী বর গোহাঞি-এর উপন্যাসখানিতে কন্যা রুণী তাই অপুর সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা-ভাবনায় অসন্তুষ্ট হয়ে বলে,—"আমাদের এই শোষণ কে করছে? বাংলাদেশী আর নেপালী বহিরাগতরা? না কি ভোটযুদ্ধে জেতার জন্য টাকার প্রয়োজনে দালানুদাস হয়ে থাকা সরকারের প্রকৃত মালিক বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণী—যে পুঁজিপতিরা আসামেও ভালো করে গুটিয়ে বসে জনসাধারণকে মূল্য-বৃদ্ধি, ভেজাল পণ্যদ্রব্য আরও বিভিন্ন প্রকারে শোষণ করে মারছে, আসামের সম্পদ লুটেপুটে খাচ্ছে?"

একটি বাঙালি দরিদ্র মেয়ে আত্মমর্যাদা ও সচেতনতায় কতখানি উজ্জীবিত তারই একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন ছবি বসু তাঁর 'কালো হরিণচোখ' গল্পে। গল্পের প্রধান চরিত্র যে মেয়েটি সে দারিদ্র্যের কাছে নিজের জীবনটাকে বিকিয়ে না দিয়ে আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলে,—"আমি কিন্তু এখনও নষ্ট হইনি কাকাবাবু, ব্লাউজ বেচে খাই সত্যি, আর কিছু তো বেচিনি।" সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে ছবি বসু তাঁর "রাজারানীর গপ্পো"-তে সংস্কার যে শুধুমাত্র সংস্কারই, তার বেশি কোন মূল্য নেই সেটাই তিনি গল্পটিতে তুলে ধরলেন। তাঁর ছোট গল্প 'আগুনরাঙা' এবং সদ্য প্রকাশিত 'প্রবহমান' গল্প-গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্তের 'অতসী পৃথিবী' উপন্যাসে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট—তা হল লেখিকার মতাদর্শ পাঠকের কাছে আয়নার মত স্বচ্ছ। শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে উপন্যাস পরিপুষ্ট হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের শ্রম ও সংগ্রামের মধ্যে—উপন্যাস রচয়িত্রী যেন প্রেরণালাভ করতে চেয়েছেন। জীবনের অসংগতি, বেদনা ও জীবনের কান্না, রিক্ত বঞ্চিতদের হাহাকার, ক্ষুধার্ত নিপীড়িত অত্যাচারিতের গুমের-মরা অভিমান আর বিদ্রোহের বড় নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র দীপ স্নেহ-ভালবাসার জোরেই যেন ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডি অতিক্রম করে বেরিয়ে এল বৃহত্তর সমাজের প্রয়োজনে, অপর প্রধান চরিত্র মালতী দেবী, যিনি মায়া-মমতার পরিপূর্ণ আধার। গোটা চরিত্রটির আড়ালে যেন লেখিকা নিজেই। মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্তের 'সুরঞ্জনা' ও 'অগ্নিপলাশ অন্যদেশ' উপন্যাস দুখানিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অজস্র ছোট গল্প রচনায় তাঁর সামাজিক সচেতনতাবোধ দক্ষ শিল্পীর পরিচয় দেয়। তার দু'চারটি উল্লেখ করা হল, যেমন-'চেনা', 'বুড়িমা,' 'দিনবদলের রং,' 'ভালমানি"

ইত্যাদি। তাছাড়া শিশু-কিশোরের লেখা 'গল্প শুধু গল্প নয়' গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য যাতে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষাতত্ত্ব নিহিত রয়েছে।

রেণুকা চক্রবর্তীর গল্প-রচনার মধ্যে তাঁর আদর্শ ও নিষ্ঠাকে তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে, পোস্টমর্টেম গল্পের একাংশে আছে—"একদিনের এক আদর্শবাদী চিকিৎসক যুবককে হারিয়ে এলাম যে আমায় বলেছিল—যুদ্ধে নামো সাহিত্যিক …লেখনীকেই হাতিয়ার করো……।"

এখনও যে বিয়ে ব্যাপারটা অনেক খানিই অর্থের মানদণ্ডের ওপরে নির্ভরশীল, প্রেম-ভালবাসা সেখানে অর্থহীন তারই একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন গুলশান চৌধুরী তাঁর বিপন্ন ঝর্ণাধারা গল্পে। প্রেমিকার আক্ষেপের সুর বড় মর্মবিদারক এবং নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য। প্রেমিকার আক্ষেপোক্তি: "আমি তার হব কি করে? আমরা যে বড় গরীব! ধনী-দরিদ্র কি গাঁঠছড়া বাঁধে, আর বাঁধলেও কি তা টেকে?"

গল্প রচনার ক্ষেত্রে দীপ্তি দেব-এর দরদী মন, সচেতন মন নতুন সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রেরণা যোগায়, সংগ্রামী জনগণের নিকট তাঁর 'অব্যক্ত কান্না' গল্পটি পাঠক মনের গভীরে সাড়া জাগায়। বিচ্ছিন্নভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না, মানুষ সামাজিক জীব—সুখে-দুঃখে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবেই এগিয়ে যেতে হবে, এই চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্য লিখলেন 'আমাদের বাঁচতে হবে' গল্প। তাছাড়া সংগ্রামী চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা গল্প রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করা যেতে পারে, রাণু চট্টোপাধ্যায়, শোভা দে, তানিয়া চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না কর্মকার, মঞ্জু রায়, ভারতী আচার্য, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মিনতি ঘোষ রায়, সংগ্রামী রায়, রেখা গোস্বামী, চেনীমাই শইকিয়া ও প্রণতি ঘোষ প্রমুখ লেখিকাদের।

বিদেশী গল্প অনুবাদের ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তাঁরা হলেন সুপ্রিয়া আচার্য, ছবি বসু, শিউলি মজুমদার, মীরা ভঞ্জ, শবরী ভঞ্জ প্রমুখ লেখিকারা।

কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও মহিলা কবিরা সমাজের প্রতি নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে কবিতা, ছড়া, গান রচনা করেছেন। অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে, জীবন-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য, দাসত্ব মোচনের জন্য, বন্দীদশা ঘোচাবার জন্য সংগ্রামী বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনাকে মহিলা কবিরা কবিতার মধ্যে

তুলে ধরেছেন। কোন রকম কৃপা-করুণা-অনুকম্পার প্রশ্ন নয়—স্বদেশবাসীর মুক্তির জন্য বিপ্লবী কবি বন্দী অবস্থায় লিখলেন :

"বন্ধু আমার একটি শপথ রেখো
বন্দী সাথীর একটি অহংকার
করুণ অশ্রু ফেল না আমার দুঃখে
আমার জন্যে কোরনা মুক্তি ভিক্ষা"

—(কনক মুখোপাধ্যায়)

সংগ্রামী কবি, জনদরদী কবি, সচেতন কবির কবিতায় মুক্তি-পথের সন্ধান মেলে, স্বচ্ছ ধারণা এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন,—

"বিনা যুদ্ধে রাজা দেয়না সুচ্যগ্র মেদিনী
শিল্পী বিনা যুদ্ধে দেয়না তুলি ও লেখনী
কবিতার শব্দ পদ অর্থ ব্যঞ্জনা করেনি
স্বেচ্ছাচার লাঞ্ছনার কোনো জয়ধ্বনি—"

—(ইরা সরকার)

১৯৭৮ সালের ভয়াবহ বিধ্বংসী বন্যায় বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, কেউ কেউ উদ্ধার কার্যে নেমেও প্রাণ হারিয়েছেন। বেদনার্ত অনুভূতিপ্রবণ কবির কলমে ছন্দময় ভাষায় ফুটে উঠল :

"সব অশ্রু-সমুদ্র
সব কথা-আর্তনাদ
সব অনুভূতি-অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম
সব শব্দ—বাঁচাও বাঁচাও !
... ...
কাল রাতে
সর্বগ্রাসী ধ্বংসস্তূপ ঠেলে
এসেছে নবজাতক
ফুটেছে নতুন ফুল,
সকালের সোনা রোদ্দুরে।"

—(কনক মুখোপাধ্যায়)

বিপ্লবী মায়ের তো পরম স্নেহের ধন শিশু সন্তানটিকে আঁকড়ে বসে থাকলে হয় না, তার তো নিজের সন্তানের মত বহু সহস্র সন্তানের মুখে হাসি ফোটাবার দায়িত্ব, তাই দরদী বিপ্লবী মা-এর কণ্ঠে শোনা গেল :

"তুমি কেঁদনা মামণি আমার—সামনে যে
ভয়ঙ্কর ক্ষুধার কান্না,
"তুমি আমার আঁচল ধরে টেন না সোনা—সামনে যে
সংগ্রামের টান,
তুমি অমন আধ আধ ডেকনা—সামনে যে
বিপ্লবের ডাক!
তুমি ঘুমিয়ে পড় যাদুমণি—ঘুম নেই যে
আমাদের চোখে!"
—(কনক মুখোপাধ্যায়)

বিপ্লবী কবি কবিতা লেখেন কবিতাকে জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার করে নেবার জন্য, বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার জন্য, সাধারণ মানুষের মনের গভীরে পৌঁছে যাবার জন্য; তাই কবি অসম সাহসিকতার সঙ্গে পথের নিশানা মেলে ধরে বললেন:

"ঘৃণায় জ্বলে ওঠো
পবিত্র শপথে সব
হও লেলিহান
শিল্পের সত্তায় আনো জীবনের ত্রাণ…"
—(লিলি সাধু)

যাবতীয় অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ, অশান্ত, অস্থির কবিচিত্ত কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাবার জন্য, ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্য সমস্ত ভেঙ্গে চুরে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, মানবতাবাদী বিশ্বকবিকে সামনে রেখে বললেন:

"মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় তোমার মতন
বিক্ষোভে চেঁচিয়ে বলি—
'ওরে চারিদিকে মোর একি কারাগারে ঘোর'
আঘাতে আঘাতে ভাঙি শত শত কারার প্রাচীর"
—(শিবানী কর্মকার)

দীর্ঘদিনের সংগ্রামী মহিলা রেবা ঘোষ অকুণ্ঠচিত্তে দরদী মন নিয়ে জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন:

"সবারে চাই করিতে আপন
মাটির মায়ের ঘরে

প্রাণে প্রাণে সবে বেঁধে দিতে চাই,
স্নেহ বন্ধন ডোরে।"

যন্ত্রণাকাতর কবিচিত্ত শত্রুর মোকাবিলা করতে শক্তি অর্জন করতে চায়, শির উন্নত করে মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়, অসম সাহসিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করে :

"তোমার প্রিয়ার শেষ আকুতি—'আমাকে বাঁচাও'
পারনি তো ঐ দুর্ধর্ষ হানাদারী, নর পিশাচের—
হাত থেকে তাকে বাঁচাতে ;
ঐ কাস্তেটা পড়ে আছে,
তুলে ধরো ওটাকে শক্ত করে,
এবার এগিয়ে চলো।

—(তাপসী ভট্টাচার্য)

মহিলা কবি জ্যোতির্ময়ী মিত্র জীবন-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির জন্য কবিতাকে আশ্রয় করে নিয়ে বললেন :

"কবিতা তোমাকে চাই শোষিত অরণ্যের মাঝে
আলো দিতে জল দিতে সবুজ বৃক্ষের প্রোথিত শিকড়ে
কবিতা তোমার বুকে হানয় স্পার্টাকাস বাজে
দাসত্বের বন্ধন ছিঁড়ে মুক্তি আনো কংকাল কবরে।"

তাছাড়া মহিলা কবিদের মধ্যে আরো যাদের সার্থক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তাঁরা হলেন : অনামিকা মাহাতো, অনীতা গুপ্ত, অপরাজিতা গোপ্পী, মানসী চক্রবর্তী, রমলা বড়াল, চিত্রা কর্মকার, অরুণা সরকার, মিনারা খাতুন, গার্গী দত্ত সরকার, প্রকৃতি ভদ্র, সুনীতা দাস এবং প্রণতি ঘোষ প্রমুখ।

গল্প-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধ রচনা, এবং পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনার কাজেও মহিলারা যোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। '৫০-এর দশকে 'ঘরে বাইরে', 'মহিলা মহল' ও 'মহিলা' প্রভৃতি প্রগতিশীল মহিলা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে লেখিকা গোষ্ঠী গড়ে উঠতে থাকে। পরবর্তীকালে প্রগতিশীল শিল্প চেতনায় উদ্বুদ্ধ 'একসাথে' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কবিতা-নাটক ও বিভিন্ন দিক নিয়ে সংগঠিত লেখিকা গোষ্ঠী সাহিত্যের আঙিনায় এসেছেন।

'একসাথে' পত্রিকাকে ঘিরে শুধু যে মহিলা কবি শিল্পীরাই সমবেত হয়েছেন

তাই নয়, প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী ও নেত্রীরাও লিখে চলেছেন মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্য। নিপীড়িত নারী-সমাজের মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ-সাহিত্য ইতিপূর্বে এভাবে বিকশিত হয়নি। এই বিভাগে অগ্রণী লেখিকাদের মধ্যে রয়েছেন কনক মুখোপাধ্যায়, মঞ্জরী গুপ্ত, অপর্ণা পাল চৌধুরী, পঙ্কজ আচার্য, মাধুরী দাশগুপ্ত প্রমুখ।

বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায় গণতান্ত্রিক চেতনা-সম্পন্ন লেখিকারা প্রগতি শিবিরের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে যেভাবে সকল গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এবং সংগঠিতভাবে সাহিত্যকে সমাজ প্রগতির পথের অন্যতম হাতিয়ার করে নিয়ে সম্মুখপানে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে এগিয়ে চলেছেন, নিশ্চিতভাবে বলা যায় সেটা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য এবং উত্তরকালের কাছে প্রেরণাদায়ক।

জাতীয় সংহতির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার সীমা-পরিসীমা নেই ; কত বৈঠকী আলাপ, কত বিতর্ক ! আলোচনা সভায় কত ঝড়-তুফানই না উঠেছে, উঠেছে দীর্ঘকাল ধরে, তাঁর বিপুল রাশি রাশি রচনাসম্ভার ও চিন্তা-ভাবনাকে কেন্দ্র করে কত শত-সহস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচিত হয়েছে, কত সমালোচনা-মূলক গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। সৃষ্টি সম্ভারের শুরু থেকে মৃত্যুর ৪৪ বৎসর অতিক্রান্ত হবার পরেও একই ভাবেই চলেছে, কখনও কোথাও থেমে থাকেনি। বিশ্বকবির খ্যাতিও যেমন বিশ্বব্যাপী, তেমনি তাঁকে কেন্দ্র করে আলোচনা-সমালোচনাও দেশ-কালকে অতিক্রম করে গেছে ! কেউ বা রবীন্দ্রনাথের অন্ধ-গুণগ্রাহী, কতক স্বার্থান্বেষী বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথকে কখনও নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে কাজে লাগাতে তৎপর, কখনও বা প্রয়োজনবোধে জনগণকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভুল বোঝাতে সচেষ্ট। আর এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষ যারা সুস্থ চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী তারা রবীন্দ্রনাথের মানবিক মূল্যবোধকে শ্রদ্ধা করেন এবং তারই আলোকে তাঁর সচেতন চিন্তা-ভাবনা, শিল্প-সাহিত্য ও শিক্ষাচিন্তাকে জনগণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে প্রয়াসী।

কোন সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকই মানবিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেন না। আর মানবিক মূল্যবোধ কখনই মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সম্ভব নয়, সুস্থ সুন্দর সৃষ্টি সম্ভারের প্রধান প্রেরণা তো মানুষ, আর তাই যদি হয় তাহলে তো মানুষে মানুষে সংহতির সূত্র-বন্ধন একান্ত কাম্য ও অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ এই সূত্র সন্ধান করে বেড়িয়েছেন সারা জীবন ধরে। কিশোর রবীন্দ্রনাথ অমানবিকতার বিরুদ্ধে, অসভ্যতার বিরুদ্ধে নির্ভীক চিত্তে কলম ধরেছেন। কলমের মুখে বেরিয়ে এসেছে,

"তবু মানুষ বলি গর্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহংকার।"

রবীন্দ্রনাথ দু'চোখ ভরে অন্তরের আলোকে সমাজ-শহর-গ্রামকে দেখেছেন, মানবিক দরদ ও সুযুক্তিসহকারে এবং প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন শোষণ-বঞ্চনার বিভিন্ন কৌশল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করেছেন মুষ্টিমের একটি গোষ্ঠীর শিকার আত্মম্ভরিতা, স্বদেশপ্রীতির নামে ভণ্ডামি, কল্যাণ কর্মের নামে

অকল্যাণকে বিভিন্ন কায়দায় আবাহন, 'সংহতি' নামের আড়ালে পোষাকী কায়দায় বৈষম্য, বিভেদ ও অসমতাকে ইন্ধন যোগানো। একই দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করে, একই জলবায়ুর আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হওয়া সত্ত্বেও কত বৈষম্য—কি নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুর তার রূপ! এই অসমতার একটা স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথ বললেন,—"শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে, তারাই হল এনলাইটেনড, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজী পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তারা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিত সমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, রোগ বলো, আকাল বলো, জমে উঠল কাংস্যবাক্যমন্ত্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক। গ্রামে গ্রামে নগরী হল সুজলা সুফলা, টানা পাখা শীতলা; সেই খানেই মাথা তুললে আরোগ্য নিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছবি আর কোনদিন চালানো হয়নি"—শিক্ষার বিকিরণ।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ভারতবর্ষে ভারতীয়দের জীবন অশান্ত হয়ে ওঠার প্রধান কারণ হচ্ছে সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধি। যতদিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত না হবে ততদিন দেশে সুস্থ সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে না, সংহতি তো অলীক কল্পনামাত্র। ইংরেজ জাতি তার কলকাঠি নাড়িয়ে চলল অন্তরাল থেকে, প্রাণপণে চেষ্টা চালাতে লাগল দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল ধরাতে ও দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করতে, সফলও হল অনেকটাই। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মগত পাহাড়-প্রমাণ বাধা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্বকবির বিশ্বাস হল, একদিন এই সম্প্রদায়গত সমস্যারও সমাধান ঘটবে, এবং শুধুমাত্র মানুষ হিসেবেই পরস্পরের আপনজন হয়ে পাশাপাশি বসবাস করবে। তাঁর স্পষ্ট অভিমত হল, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই যদি বিভিন্ন প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বৈঠকী আলাপের মধ্য দিয়ে আন্তরিক প্রচেষ্টা নিলে নিশ্চয়ই ব্যবধান ঘুচে যেতে পারে। উন্মাসিকতা ত্যাগ করে সম্প্রীতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেই জাতীয় সংহতি সম্ভব।

বিশ্বকবি দেশবাসীকে চিন্তার ঐক্যে, ভাষার ঐক্যে, সাহিত্যের ঐক্যে একত্রিত হওয়ার আবেদন জানান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিজয়া সম্মিলন ভাষণে

বলেন,—"হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলা দেশের সর্বত্র প্রেরণ করো…যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, অস্তসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো।…

রবীন্দ্রনাথ দেশের উন্নয়ন বা প্রগতির ক্ষেত্রে এবং জাতীয় সংহতিকে মজবুত করে গড়ে তোলার জন্য জাতিগত, ধর্মগত, আচারগত ও সম্প্রদায়গত বিভেদকে বিলুপ্ত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা যদি প্রতিমুহূর্তে ফাঁক-ফোকর দিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তাহলে সংহতি আসবে কোন পথে? রবীন্দ্রনাথ তার বিভীষিকাময় রূপের কথা ভেবে আশঙ্কিত হতেন। হিন্দু-মুসলমানের ধর্মগত ও সংস্কারগত বিভেদের কথা ভেবে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণমাসে হিন্দু-মুসলমান প্রবন্ধে লিখলেন: "সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে ক্রমে পৌঁছেছে, হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। আমাদের মানস প্রকৃতির মধ্যেও অবরোধ রয়েছে, তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না; শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে—ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে—তারপরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু-মুসলমানদের মিলন যুগ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে।" আবার অন্যত্র বলেছেন—"বিদেশাগত শাসক মুসলমানকে মধ্যযুগের হিন্দুনিগূঢ় প্রাণশক্তির সাহায্যে যে আপন করে নিয়েছিল তার প্রমাণ আছে সে যুগের চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, সূচিশিল্প, ধাতুদ্রব্য নির্মাণ, দন্তকার্য, নৃত্যগীত, রাজকার্য প্রভৃতি সকল কিছুতে। এগুলির কোনটাই একমাত্র মুসলমান বা একমাত্র হিন্দুর স্বতন্ত্র সৃষ্টি নয়—উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত সৃষ্টি।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালান্তর গ্রন্থে খেদের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, ধর্মীয় ও সংস্কারগত কারণেই অনেকটা পরিমাণে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি হয়, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে সকল মানুষ যদি সমান সুযোগ পায়, কুসংস্কার দূরীভূত হয়, তাহলে অতিসহজেই স্বাভাবিক গতিতেই বিভেদ ঘুচে গিয়ে সংহতি গড়ে উঠবে, মৈত্রীর পথ সুগম হবে এবং ঐক্য সুদৃঢ় হবে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন।

রবীন্দ্রনাথের মন পীড়িত হত যখন তিনি দেখতেন শিক্ষাক্ষেত্রের প্রাঙ্গণেও ছাত্রদের রান্না-খাওয়ার পৃথক পৃথক ব্যবস্থা। বিশ্বমানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ তার থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করে চলেছেন। একদা কবির দৃষ্টিতে এল—একজন মুসলমান ও একজন সাঁওতাল ছাত্র বাঁধাইয়ের কাজ শিখছে, আহারাদির ব্যবস্থা পৃথক।—কবি বড় বেশি মর্মাহত হলেন, মনের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে শান্তিনিকেতনে এক পত্রে লিখলেন—"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে—ঐখানে সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে—স্বজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে—ভবিষ্যতের জন্য যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন ঐ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।" কিয়ৎকাল পরে শিক্ষক সুহৃৎ মুখোপাধ্যায়কে লিখলেন, "ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ মুছে যাক, সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক—সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন।" বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক একে একে এসে জড়ো হলেন শুধু ভারতবর্ষের নয় বিশ্বের বহু দেশ থেকে—বিভিন্ন ধর্মের মানুষ, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-ব্রাহ্ম—এক সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণ, ভোজন সবই চলতে থাকে নির্দ্বিধায়। শ্রীহট্ট থেকে মুজতবা আলি, লাহোর থেকে জিয়াউদ্দীন, নাগপুর থেকে খ্রীষ্টান বিনায়ক মাসোজি এলেন শিক্ষার্থী হয়ে,—মহাখুশিতে একই সঙ্গে চলতে থাকে সবকিছু একাসনে বসে। ভারবর্ষে ইতিপূর্বে এমন দৃষ্টান্ত আর নেই। বিশ্বকবি জানতেন মানবধর্মের চেয়ে বড় ধর্ম নেই। কবি স্বপ্ন দেখছেন ভেদ বিলুপ্ত মনুষ্য সমাজের, যেন ব্যগ্র হয়ে রয়েছেন সঙ্কীর্ণতামুক্ত মনুষ্য সমাজকে দেখার জন্য, আন্তরিক আকুতি রয়েছে সংহতি স্থাপনের জন্য, ব্যাকুল হয়ে বলছেন,—

"ভেদচিহ্নের তিলক পরা
সঙ্কীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে,
হে মহান পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতি হারা।"

কবি এমনও ভেবেছিলেন,—"...স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে—ভবিষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।...পৃথিবী থেকে স্বাদেশিক অভিমানে নাগপাশ বন্ধন ছিন্ন করাই আমার শেষ বয়সের কাজ।"

রবীন্দ্রনাথ সর্বজাতির মহামিলনের আশায়, ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধতার একাগ্র কামনা নিয়ে উদাত্ত আহ্বান জানালেন :

"সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

পতিত, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ ও নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি অপমান ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে বললেন :

"দেখিতে পাওনা তুমি, মৃত্যু দূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,—
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে না যদি ডাক, এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যু-মাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।"

জীবনের শুরুতে যিনি বলেছিলেন "রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়াই রাজা হতে হয়।" তিনিই মৃত্যুর প্রায় চার মাস আগেও জাতিহারা মানুষের জয়গান গেয়ে বললেন,—

'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।'

মানব দরদী রবীন্দ্রনাথ যথার্থ শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকের দায়িত্ববোধ থেকেই সংহতি, সম্প্রীতি, ঐক্য ও মিলনের জন্য সারা জীবনব্যাপী চেষ্টা চালিয়েছেন।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

জীবনের শেষ সীমায় (১৯৩৭) পৌঁছে যে কবি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত মর্মে বিষোদ্গার করেছেন, সেই কবির কিশোরকালের রচনার মধ্যেও সেই হিংস্রলোলুপ মূর্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হয়েছে নির্দ্বিধায় ও নির্ভীকতার সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আয়ুষ্কালের মধ্যে একদিকে লক্ষ্য করেছেন ফ্যাসিবাদী হিংস্র চক্রান্তের বীভৎস রূপ, অন্যদিকে মেহনতী খেটে-খাওয়া মানুষের মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা ও তারই বিজয়ের ইঙ্গিতে আকৃষ্ট হয়েছেন।

মাত্র ১৭ বছর বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী বর্বরতা, হিংস্রতার বিরুদ্ধে উন্মুক্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সভ্যতার নামে অত্যাচার-নিপীড়ন, শোষণকে তিনি কোনদিন ক্ষমার চোখে দেখেননি। ১৮৭৮ সালে কিশোর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

'কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্যজগতে,
দিতেছে মানবমনে বিষ মিশাইয়া!
... ...
"তবু মানুষ বলি গর্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহংকার।"

ফ্যাসিবাদের উন্মাদনায় কিশোর কবির মন আশঙ্কায় ক্ষত-বিক্ষত।

মাত্র কুড়ি বছরের রবীন্দ্রনাথ চীনে যে ফ্যাসিবাদী নারকীয় তাণ্ডব চলছে তার বীভৎস রূপের কথা ভেবে আতঙ্কিত হলেন, বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে, একটা জাতির মেরুদণ্ডকে বিষক্রিয়ায় কিভাবে তিলে তিলে নিঃশেষ করে ফেলায় কি উদগ্র লালসা ইংরেজ বণিক গোষ্ঠীর! আর সেই মানসিক প্রতিক্রিয়া তাঁর

কলমের মুখে বেরিয়ে এল—"একটা সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বলপূর্বক বিষপান করান হইল। এমনতর নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কখনো শোনা যায় নাই। চীন কাঁদিয়া কহিল, 'আমি অহিফেন খাইবনা', ইংরাজ বণিক কহিল, 'সে কি হয়'? চীনের হাত দুটি বাঁধিয়া তাহার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল, দিয়া কহিল, 'যে অহিফেন খাইলে, তাহার দাম দাও।' বহুদিন হইল ইংরাজেরা চীনে এইরূপ অপূর্ব বাণিজ্য চালাইতেছে।..."

১৯২৫ সালে তুচ্চি এবং কর্মিচির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ইটালি ভ্রমণের আমন্ত্রণপত্র পেলেন। ঠিক সেই সময়ে ফ্যাসিজমের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে অনেকেই উদাসীন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রায় একপক্ষকাল ইটালি ভ্রমণ করে এলেন। রবীন্দ্রনাথেরও এই সাময়িক বিভ্রান্তি ঘটেছিল। রঁমা রোলাঁর সাবধানবাণীতে সে ভুল অচিরেই ভেঙ্গে গিয়েছিল, এবং চিন্তার জগতে আর একটা নতুন মোড় নিল, যার ফলশ্রুতি হলো ১৯২৬ সালে মুসোলিনীর মুখপত্র Popolod Italia বিশ্বকবিকে উদ্দেশ করে বললো,—"এই অসৎ তুরতুকটি যাকে দুনিয়ার গর্দভগুলি মহত্ত্বের আসনে বসাইয়াছে···।"

বিশ্বশ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক রোমাঁ রোলাঁ যখন ইতালি ভ্রমণের ভুল ভাঙিয়ে দিলেন, তখনই মিসেস সালভাদোরির ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের মনে ফ্যাসিবাদ বিরোধী এক তীব্র প্রতিক্রিয়া জাগে। ১৯২৬ সালের ২০ জুলাই সি. এফ. এণ্ড্রুজকে পত্রে লিখলেন :

"...এই ফ্যাসিবাদের কর্মপন্থা ও আদর্শ সমগ্র মানব গোষ্ঠীর চিন্তার বিষয় ; এবং যে আন্দোলন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নির্দয়ভাবে দলন করে, ব্যক্তিকে বিবেক-বিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণে বাধ্য করে, এবং হিংসার রক্তমাখা পথ দিয়ে হেঁটে বেড়ায়, সেই আন্দোলনকে আমি কখনও সমর্থন করতে পারি এটা কল্পনা করাও অযৌক্তিক, পত্রটি ৫ই আগস্ট ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত।

আগ্রাসনী নীতির বিরুদ্ধে মানবিক মূল্যবোধের উপলব্ধিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্রতিবাদমুখর করে তুলেছেন অকুণ্ঠচিত্তে। ১৯২৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি প্যারিতে ফ্যাসিবিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়। অনুষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করেন আইনস্টাইন, বারবুস ও রোঁমা রলাঁ। বারবুস রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : "আপনার নাম হলো সেই সব মহান সৎ ও বরণীয় নামগুলোর অন্যতম যারা ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ও সংগ্রামে উন্নতমস্তক

হয়ে দাঁড়াবে,…"উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের বর্বরতাকে ধিক্কার জানিয়ে লেখেন: "বলা বাহুল্য যে আপনার আবেদনের প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি রয়েছে, আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস এর পশ্চাতে আছে অগণিত মানুষের কণ্ঠস্বর যারা সভ্যতার অন্তস্থল থেকে বর্বর হিংসার আকস্মিক আবির্ভাবে হতচেতন।"

প্রথম মহাযুদ্ধের দানবীয় রূপ রবীন্দ্রনাথের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তিনি তাঁর কালান্তর গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। সভ্যতার মুখোশ কিভাবে সহজেই উন্মোচিত হয় ফ্যাসিবাদী চিন্তাভাবনায় এবং তার কুৎসিত মূর্তি কিভাবে জনগণকে গ্রাস করে একের পর এক তার এক নিখুঁত চিত্র ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে বললেন,—"তারপরে মহাযুদ্ধ এসে অকস্মাৎ পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসের একটা পর্দা তুলে দিলে, যেন কোন মাতালের আব্রু গেল ঘুচে, এত মিথ্যা, এত বীভৎস হিংস্রতা নিবিড় হয়ে বহু পূর্বকার অন্ধ যুগে ক্ষণকালের জন্য হয়তো মাঝে মাঝে উৎপাত করেছে, কিন্তু এমন ভীষণ উদগ্র মূর্তিতে আপনাকে প্রকাশ করেনি।"

য়ুরোপ ও আমেরিকার আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বিক্ষুব্ধ হয়ে ১৯৩৩ সালে লেখেন: "একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠেছে।"

সমাজ তথা দেশের তথা সমগ্র বিশ্বের কোনরকম সংকট মুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথ উদাসীন থাকেননি, শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি হিসাবে তিনি যথোচিত দায়িত্ব পালন করেছেন তার লেখনীর মাধ্যমে, তাঁর লেখনী হয়েছে গর্জনমুখর। ১৯৩১ সালে হিজলী জেলে নিরস্ত্র বন্দীদের হত্যা ও অত্যাচারকে রবীন্দ্রনাথ 'শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব' বলে ধিক্কার জানিয়েছেন। ফ্যাসিজমের ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধিতে রবীনন্দ্রাথ আতঙ্কিত হয়ে 'কালান্তরে' লিখলেন,—"চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকায় যে য়ুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কীকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজমের নির্বিচার নিদারুণতা।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ফ্যাসিবাদের কালোছায়া যখন গ্রাস করতে উদ্যত, তার ভয়াল রূপের কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছেন। চীনের সংগ্রামী জনগণের প্রতি তাঁর তখন সহমর্মিতা ও আন্তরিকতা বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। তিনি ফ্যাসিজমের গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ দিয়ে বললেন: "মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসীজমের কলংকপ্রলেপ আর সহ্য হয় না, কিন্তু সবচেয়ে বেদনা পাই চীনের জন্যে, কেননা সাম্রাজ্যিকদের অফুরন্ত অর্থ আছে, সামর্থ আছে; আর সহায়শূন্য চীন লড়ছে প্রায় শূন্য হাতে, কেবল তার নির্ভীক বীর্যে ভর করে।"

১৯৩৫ সালের ২রা অক্টোবর আবিসিনিয়া আক্রান্ত হলে মুসোলিনীর আগ্রাসী নীতির তীব্র বিরোধিতা করে ন্যায় নীতিহীন বর্বর সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদের তীব্র নিন্দা ক'রে সি. এফ এণ্ডুজকে পত্র লিখলেন এবং ইতালীর পৈশাচিক আক্রমণের শিকার হয়ে লণ্ডনে পলাতক সম্রাট হাইলি সেলাসির অনুরোধে নির্যাতিত অত্যাচারিত আফ্রিকাবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন:

"হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নিচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে?"
(আফ্রিকা)

আফ্রিকার লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, পরাধীন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষের জন্য কবিচিত্ত বেদনার্ত, কখনও তিনি অসহায় বোধ করেন, কখনও সহানুভূতিশীল ও দরদী লেখনী উঁচিয়ে প্রতিবাদের চেষ্টায় বলেন,—

"এসো যুগান্তরের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ঐ মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো 'ক্ষমা করো'
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।"

১৯৩৬ সালে রোমাঁ রোলাঁর আহ্বানে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন, স্পেনের নির্বাচিত সরকার জেনারেল ফ্রাঙ্কোর

অভিযানকে প্রতিরোধ করতে বিশ্ববাসীর কাছে রবীন্দ্রনাথ আহ্বান জানান। তাঁরই সভাপতিত্বে গড়ে উঠেছিল 'ফ্যাসিজম ও যুদ্ধবিরোধী সংঘ"। বিশ্বশান্তি সম্মেলনের যে প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছিল তার কিয়দংশ তুলে ধরা হল: "ফ্যাসিস্ট ডিকটেটরি খাদ্যের পরিবর্তে অস্ত্র যোগাইয়া এবং সংস্কৃতির সুযোগের পরিবর্তে সাম্রাজ্য গঠনের প্রলোভন ধরিয়া নিজের জঙ্গীবাদীরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছে। আবিসিনিয়াকে পদানত করিবার জন্য ইতালি যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহা যুক্তিসঙ্গত ও সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসবান সকলকে কঠিন আঘাত করিয়াছে।" প্রতিবেদনটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জওহরলাল নেহরু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, নন্দলাল বসু ও প্রেমচাঁদ।

১৯৩৭ সালে আন্দামানে অনশনকারী বন্দীদের সমর্থন জানিয়ে কলকাতার টাউন হলের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন এবং এই বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, "দেশের বিধিবদ্ধ আইন ও মানুষের স্বাধীনতার বিধিসঙ্গত দাবির প্রতি ভারত সরকারের শ্রদ্ধাহীন মনোভাবই ফ্যাসিস্ট মনোভাব।"

১৯৩৮-এ জাপানীদের চীন আক্রমণে কবি বড় বেশি ব্যথিত হয়েছিলেন। জাপানের আগ্রাসনী নীতি ও কার্যকলাপের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, তিনি সরাসরি তার প্রতিবাদ করলেন। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডালিকা'র অভিনয় করালেন চীনের সাহায্যকল্পে। অভিনয় করিয়ে তার থেকে ৫০০ টাকা চীনাবাসীদের দান করেন। কোন এক সময় জাপানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মোহ ছিল। কিন্তু জাপানের আগ্রাসনী কার্যকলাপে তাঁর মোহমুক্তি ঘটল। তিনি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করলেন: "আজ জাপানই অসহায় প্রাচ্যের সবচেয়ে বড় শত্রু"। তিনি জাপানীদের বুদ্ধভক্তিকে ব্যঙ্গ করে বললেন:

"দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসার উষ্মায় দারুন অধীর
ওরা তাই চলে
বুদ্ধের মন্দির তলে।'

(বুদ্ধভক্তি)

[illegible] জাপান চীন আক্রমণ করলে যারা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন তাঁরা হলেন: জন ডিউয়ি, আইনস্টাইন, বারট্রাণ্ড রাসেল, রঁমা রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৭ সালে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় রবীন্দ্রনাথ ভাষণে বললেন:

"উন্মাদ, নিষ্ঠুরতা ভীষণাকার মৃত্যুকে জাগিয়ে তুলছে সমুদ্রের তীরে তীরে ; দৈত্যেরা জেগে উঠছে মানুষের সমাজে, মানুষের প্রাণ যেন তাদের খেলার জিনিস। মানুষের ইতিহাসে এই দানবিকতাই কি শেষ কথা। মানুষের মধ্যে এই যে অসুর এই কি সত্য ? এই সংঘাতের অন্তরে অন্তরে কাজ করছে শান্তির প্রয়াস। সে কথা বুঝতে পারি যখন দেখি, এই দুঃখের দিনেও কত মহাপুরুষ দাঁড়িয়েছেন শান্তির বাণী নিয়ে—সেজন্য মৃত্যুকে পর্যন্ত স্বীকার করেছেন।"

চীনের সংগ্রামী জনগণ যখন ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ লড়াই করছে তখন তাকে পর্যুদস্ত করার জন্য বৃটিশ উঠে পড়ে লেগেছে। রবীন্দ্রনাথ তখন বৃটিশদের জঘন্য আগ্রাসনী মনোভাবকে ধিক্কার জানিয়ে ইউনিটি (শিকাগো শহরে) পত্রে লেখেন—"চীনের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বর্তমান অভিযান প্রকৃতপক্ষে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, এবং দাবার ঘুঁটির মত ভারতবর্ষকে এই চক্রান্তে জড়িয়ে ফেলা আমাদের পক্ষে চরম লজ্জার…। বৃটিশ রাষ্ট্রনায়কগণ হরদম আমাদের একথা শোনাচ্ছেন যে চীনে ইংল্যাণ্ড আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করছে। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি কারা সংঘর্ষের সূত্রপাত করল ? · কেন বলপ্রয়োগ করে চীনের জনগণের হাত থেকে হংকং ছিনিয়ে নেওয়া হলো ?…মূলে ইংরেজরাই আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে।"

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে অমিয় চক্রবর্তীকে ফ্যাসিস্ট দস্যুদের হিংস্র থাবার জ্বালাময় অবস্থার কথা চিঠিতে লিখলেন : "দেখলুম দূরে বসে ব্যথিত চিত্তে, মহী সাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগলো জাপানের করাল দংষ্ট্রা শক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুশ্রী অপমান বার বার স্বীকার করলো যা তার প্রাচ্য সমাজের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনো ঘটেনি।"

হিটলারি আগ্রাসন চলছে উন্মত্তের মত, অস্ট্রিয়াকে গ্রাস করে, চেকোস্লোভাকিয়াকে কালো ছায়া গ্রাস করে ফেলেছে। রোগভারে জর্জরিত রবীন্দ্রনাথ হিংস্রতার বলি অসহায় মানুষদের কথা ভেবে গর্জে উঠে বললেন :

"কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা 'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন…'

চেকোস্লোভাকিয়াকে হিটলারের নখদন্ত গ্রাস করল, অধ্যাপক লেসনিকে কবি লিখলেন—"মানুষ যখন পশুতে পরিণত হয় তখন একদিন না একদিন তারা পরস্পরের মাংস ছিঁড়ে খাবেই।" দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলেন,

"তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্ত পঙ্কে ধরার অঙ্কলেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুল বীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।"

ইউরোপের ফ্যাসিবাদী দুটি রাষ্ট্র ইতালি ও জার্মানি আর এশিয়ার জাপান—এই তিনটি রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাভাবনা কবিকে আকুল করে তুলেছিল। 'ফ্যাসিজমের নির্বিচার নিদারুণতায়' কবিচিত্ত উৎকণ্ঠিত, তিনি ঘোষণা করলেন—"দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি তুমি অশ্রদ্ধেয়, অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি 'বিনিপাত'।

স্পেনে যখন গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ করছেন, আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ অঢেল অর্থ সরবরাহ করছে ও সৈন্য সরবরাহ করছে তখন কবির কলম প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠছে: "আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের এই উপপ্লাবী তরঙ্গ প্রতিরোধ করতেই হবে। স্পেনের মাটিতেই জাতিগত অহমিকা, লুণ্ঠন এবং সমরবাদী তামসিকতার ভয়াবহ অমানুষিক পুনঃপ্রকাশকে চূড়ান্ত আঘাত হানতে হবে। সভ্যতাকে বাঁচাতে হবে বর্বরতার প্লাবন থেকে।"

বিশ্বসংস্থার সঙ্গে প্রীতিময় মিলনসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশে 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম এণ্ড ওয়্যার'-এর বাংলায় যে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার পক্ষ থেকে ব্রাসেলস শান্তি সম্মেলনে যে প্রতিবেদন পেশ করেন রবীন্দ্রনাথ তাতে সই করেন ও পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে লীগের সহযোগী সংস্থা হিসেবে যে কমিটি তৈরি হয় রবীন্দ্রনাথ তার সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩৮-এ জন্মদিনে কবিতায় তাঁর ক্রোধাগ্নি বর্ষিত হলো ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে:

"...... মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখ বিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, এ প্রহসনের
মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের
নাট্যের কবর রূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধ শেষ মশালের আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।"

১৯৪০ সালে ফ্যাসিজমের হিংস্র উগ্র স্বরূপ উদঘাটন করে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন,—

"এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,
বীভৎস তাণ্ডবে
ঐ পাপ যুগের অন্ত হবে,..."

মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে ব্যাকুল কবি-হৃদয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—"প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার।"

সর্বশেষে বলা যায় দেশের বা বিশ্বের কোন বড় কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক দেশের সঙ্কটাবস্থায় উদাসীন থাকতে পারেন না, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিপুল সৃষ্টি-সম্ভারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অজস্রবার কলম ধরেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কবি মন সর্বদা সচেতন ও সদাজাগ্রত। মানবিক মূল্যবোধের উপলব্ধি থেকেই তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন আমরণ।

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে নারীচরিত্র

রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেও মনে হয় সর্বোপরি তিনি কবি ও শিল্পী, তার দু'একটি উপন্যাস তো মনে হয় পুরোপুরিই কবির কলমে লেখা। তাই তাঁর চিত্রিত নারীচরিত্রের প্রধাণতঃ দুটি রূপ—জননী মূর্তি ও প্রেয়সী মূর্তি। কখনও বা তেমন দু'একটি নারীচরিত্র সৃষ্টি হয়েছে তার কলমে যাদের কণ্ঠে ও ব্যবহারে ধ্বনিত হয়েছে অবমাননার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্রোহ—যার মূলে প্রধানত কাজ করেছে রবীন্দ্রনাথের কবি ও শিল্পী-জনোচিত একটা স্বাভাবিক কল্যানবোধ—আর তাই তাঁর সৃষ্টি নারীরা বাস্তব ও আদর্শের সমন্বয় ঘটিয়ে চলেছে—এরা সকলেই মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের—আশপাশের অতিপরিচিত। সমাজ-সংস্কারকে কেন্দ্র করে একটা মনস্তাত্বিক সমস্যা তিনি তার উপন্যাস ও ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন।

সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে মাত্র ষোল-সতের বৎসরের লেখা তাঁর 'করুণা' উপন্যাস প্রকাশিত হল। অপরিণত বয়সের লেখা বলেই পূর্ণ উপন্যাসের রূপ এতে পাওয়া যায় না। করুণা চরিত্রের পূর্ণ বিকাশই ঘটেনি। 'ভিখারিণী'-ও একই সময়ের রচনা, তাই মূলতঃ একই সুর দুটো কাহিনীতেই বেজে উঠেছে। দুটো কাহিনীরই দুটো প্রধান নারী চরিত্র সহজ-সরলতার মূর্ত প্রতীক। কমল অমরসিংহকে ভালবাসত—ভাগ্যের বিড়ম্বনায় বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হল মোহন-লালের সঙ্গে—নিষ্ঠুর বাস্তবের কাছে তার পরাজয় ঘটল। 'ঘাটের কথা' গল্পে বিধবা কুসুম তার প্রেমের কথা অকপটে স্বীকার করেছে,—এখানে যেন রবীন্দ্রনাথ এক ধাপ অগ্রসর হলেন।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের গল্পগুলো মানবজগৎ ও নিসর্গ চিত্র নিয়ে। 'ত্যাগ' গল্পের নায়িকা কুসুম—কুসুমের চরিত্রে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব রয়েছে, যার ফলে প্রণয়ের ক্ষেত্রেও দ্বিধাগ্রস্ত। আর তাই হেমন্ত যখন কায়েত জেনে তাকে অবহেলাভরে ত্যাগ করেছে তখন সেটাকে সহজভাবেই গ্রহণ করেছে প্রতিদিনের ঘটনার মত। একজায়গায় আছে—"সমাজ যেমনি একটু আঘাত করিল অমনি ভালবাসা চূর্ণ হইয়া একমুষ্টি ধূলি হইয়া গেল। .... ভালবাসা আমা অপেক্ষাও মিথ্যা-বাদিনী, মিথ্যাচারিণী।" ভালবাসা কিভাবে সমাজ-সংস্কারের বলি হয় তারই

একটা রেখাচিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। নারী এখানে মুক্তির কোন পথ খুঁজে পায়নি।

'মধ্যবর্তিনী' গল্পে মানবচিত্তের বিশ্লেষণধর্মী একটা রূপ পরিস্ফুট হয়েছে। 'শাস্তি'-ও এই পর্যায়ের গল্প। গল্পটিতে চন্দনার চরিত্র অনেকটা নাট্যধর্মী। জীবনের পরিণতিটাকেই এখানে চিত্রিত করা হয়েছে। একটি যন্ত্রণাকাতর জীবনের অভিমান, জ্বালা-যন্ত্রণা সমগ্র কাহিনী জুড়েই রয়েছে।

ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'দুরাশা' গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে যে পরিণতি চিত্রিত হয়েছে তা সত্যিই অপূর্ব। 'দিদি' গল্পে একটি গ্রাম্য নারীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারাই ঘটনার অগ্রগতি। শশির মুখে যখন শুনি 'এমন স্বামীর মুখে আগুন'—তখন একজন তেজস্বিনী মহিলাকেই খুঁজে পাই যে নাকি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ক্রমে ক্রমে কঠিন বাস্তব থেকে সরিয়ে নিয়ে এলেন ভাবলোকের দিকে। শশি চরিত্রের মধ্যে একজন আন্তরিক স্নেহময়ী ও প্রেমিকা নারীসত্তা পরিস্ফুট হয়েছে।

নষ্টনীড় রচনা করে রবীন্দ্রনাথ একটি নতুন দিকের দিকে অগ্রসর হলেন—এতকাল তিনি সমাজ-সংস্কারকে স্বীকার করেই সৃষ্টি করেছেন তাঁর গল্পগুলোকে। এবার তিনি তার থেকে উত্তরণের পথ খুঁজলেন যা অপ্রত্যাশিত হলেও মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কাহিনীর শুরুতেই চারুলতার জীবনের এক শূন্যতা ও ও উদাসীনতা ধরা পড়ে। অমলকে ঘিরে চারুর ভালবাসাই মুক্তিপথের সন্ধান করেছে, আর এখানেই সামাজিক সমস্যা ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সূত্রপাত বলা যেতে পারে।

'বউঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি'—দুইই প্রায় কাছাকাছি সময়ের মধ্যে রচিত, দুটোই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস।—দুটোই অপরিণত বয়সের রচনা বলে খাঁটি উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত হতে পারেনি স্বাভাবিক কারণেই। দুটোতেই বিশ্বপ্রেম ও মানবিকতার দ্বার হয়েছে উন্মোচিত। রবীন্দ্রনাথ নতুন পথে যাত্রা করলেন। পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলোতে তারই পরিণত চিত্র ধরা দিয়েছে। 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর বিভা চরিত্রটি পরবর্তী উপন্যাসগুলোতে ব্যক্তিত্বশালিনী হয়ে ধরা দিয়েছে।

'নৌকাডুবি'তে হিন্দু সংস্কারই প্রাধান্য পেয়েছে। নলিনাক্ষের পদপ্রান্তে কমলার আত্মসমর্পণের মধ্যে নারীর অধিকার স্বীকৃত হল না, সংস্কারের জয়,

ঘোষিত হল এমনকি নারীচরিত্র বিশ্লেষণেও তেমন নৈপুণ্য নেই। 'নৌকাডুবি'র সমগ্র ঘটনাটিই একটা ভুলের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে—ট্র্যাজেডি সংঘটিত করার জন্যই যেন এ ভুলের সৃষ্টি। আর নারীর বিশ্বাসের ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে যেন ঐ একই কারণে। কমলার মনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত মোটেই সক্রিয় নয়—একটা নির্জীব পদার্থ, স্রোতের টানে ভেসে যাওয়ার মত। বাদ-প্রতিবাদের কোনরূপ ক্ষমতা নেই—এত বেশি নির্জীব যে বহুসময়ই অবাস্তব মনে হয়। বিভিন্ন ঘটনার পরিস্থিতিতেও, হেমনলিনীর চারিত্রিক মহিমা ও গাম্ভীর্য পূর্বাপর একই রকম—কোনরকম পরিবর্তন নেই বিভিন্ন ঘটনার পরিস্থিতিতেও। কমলার অন্তর্নিহিত বেদনা ঝড়ের রাতে যেন বিদ্রোহের আকার ধারণ করলো—"পথহীন প্রান্তরের প্রান্ত হইতে বাতাস কেবল 'না না' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নিশীথ রাত্রে ছুটিয়া আসিতেছে—একটা কেবল প্রচণ্ড অস্বীকার। কিসের অস্বীকার? তাহা নিশ্চিয় বলা যায় না—কিন্তু না, কিছুতেই 'না, না, না, না?" তার অন্তরের আঘাতটাই প্রচণ্ড বিক্ষোভের আকার ধারণ করেছে। কমলা চরিত্রের কোনরূপ সংঘাত সৃষ্টি হয়নি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও—নলিনাক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে তার মনে কোন রকম দ্বিধা-সঙ্কোচ দেখা দেয়নি—এটা একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। হেমনলিনীর চরিত্রে ব্যক্তিত্বের তেমন বিকাশ হয়নি। তবে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের নায়িকা বা প্রধান নারীচরিত্র অঙ্কনের একটা বিশেষ ইঙ্গিতবহ হেমনলিনী চরিত্র। সুচরিতা, লাবণ্য, কুমুদিনী—এদের সংকেত পাওয়া যায় হেমনলিনীর চরিত্রে।

চতুরঙ্গ উপন্যাসে দামিনী চরিত্রে কোনরূপ সংস্কারের দাসত্বকে ভাবাই যায় না—তার মানসিক গঠনই যেন সামাজিক সংস্কারের ঊর্ধ্বে—কষ্ট করে অর্জিত নয়। হিন্দু নারীর সমস্ত সংস্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীনতায় কোথাও দ্বিধা-সংকোচ নেই, পাঠকমহলে কেউ কেউ এটিকে অস্বাভাবিক চরিত্র বলে মনে করেছেন। কোন কোন সমালোচক মনে করেন,—"এই চরিত্রটিকে সৃষ্টি করা হয় নাই, আমদানি করা হইয়াছে।

'চতুরঙ্গে'র দামিনীর চরিত্রের সঙ্গে মনে হয় যেন Doll's House-এর নায়িকা নোরার সাদৃশ্য রয়েছে।

'নষ্টনীড়' গল্পে রবীন্দ্রনাথ যা অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছেন, তিন বৎসর পরে 'চোখের বালি'তে সেটাই প্রসার লাভ করেছে। এখানে জটিল দ্বন্দ্বমুখর মানব-চরিত্রই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কিছু কিছু সমালোচক 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিনীর

সঙ্গে 'চোখের বালি'র বিনোদিনীকে যমজাতীয়ক করে গেলেন কিন্তু মোটেই সম-শ্রেণীর নয়—রবীন্দ্রনাথের যুগে নারীর অবস্থা বঙ্কিমের যুগের মত এমন বিপন্ন নয়, তাই রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর চরিত্রাঙ্কনে আর একধাপ এগিয়ে গেছেন। বিনোদিনীর প্রেমবোধের মধ্যে এক ধরনের মহত্ত্বকেই রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। নারীর জীবনকে হেয় প্রতিপন্ন করার বদলে তার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিই রেখেছেন। বিনোদিনী চরিত্রের মধ্যে দ্বৈতরূপ ধরা দিয়েছে যা নাকি বিহারীই প্রথম অনুভব করেছে—"এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিবার নহে। কিন্তু শিখা একভাবে ঘরের প্রদীপরূপে জ্বলে, আর একভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়…।" "বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে।" এই দ্বৈতসত্তার মধ্য দিয়েই বিনোদিনী চরিত্রের ভাল-মন্দ দুটো দিকই পরিস্ফুট হয়েছে।

নারীহৃদয়ের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ দ্বৈতসত্তার চিত্র রবীন্দ্রনাথের পূর্বে কেউ কোথাও অঙ্কন করেননি। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চিন্তাধারার মধ্যেই একটা কল্যাণবোধ কাজ করত। তাই নারীর স্নেহময়ী কল্যাণীমূর্তিটি তার হাতে সার্থক রূপ পেয়েছে। শ্রীবিমান বিহারী মজুমদার তাঁর Heroine of Tagore (P 245)-এ লিখেছেন, "While Benodini refused to marry, Behari lest she should lower down his social prestige, Damini was bold enough to accept the offer of marriage from Srivilas. An utter disregard of social opinion, she engaged herself in the uplift of Moslnem tanners. The difference between Binodini and Damini measures the degree of Liberalism and Universalism to which Rabindranath moved between 1901 and 1915."

সমাজ-সংস্কার দামিনীর মনে কোনরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেনি, তাই তার আগেকার বিবাহিত জীবন শ্রীবিলাসকে গ্রহণ করার পক্ষে কোনরূপ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

'চোখের বালি'র বিনোদিনীর মধ্যে বিদ্রোহের যে নির্ভীকতা আছে, 'গোরা'র ললিতা চরিত্র-চিত্রণে ঔপন্যাসিক আর এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। সেখানে ললিতা নিজের মর্যাদায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। 'নৌকাডুবি'র হেমনলিনীর চরিত্রে যার পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল, সুচরিতার মধ্যে তার পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশিত হল। 'গোরা'র কঠোর ঔদাসীন্যের প্রতি সুচরিতার আকর্ষণ যতটা

বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বিপরীত দিকে হারাণবাবুর ক্রূরতার প্রতি ক্রমশই বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে থাকে—আর এখানেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। গোরার আন্তরিকতা ও স্বাদেশিকতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় সুচরিতার মনে হয়েছে—"সে মানুষ সামান্য মানুষ নহে। তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে যে হাত ওঠে না, অত্যন্ত একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া সুচরিতার কান্না আসিতে লাগিল।" গোরার মতবাদকে কুসংস্কার মনে করে সেই পথ পরিহার করাটাই স্বাভাবিক বলে মনে হতো কিন্তু গোরার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জেগে ওঠে এবং গোরার প্রতি আকর্ষণও তীব্রতর হয়। গোরা যখন আহ্বান জানিয়েছে—"তোমাকে নহিলে চলিবে না, তোমাকে লইবার জন্য আসিয়াছি, তুমি নির্বাসিত হইয়া থাকিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে না।" তখনই সুচরিতা গোরার আহ্বানে নিজেকে উজাড় করে তুলে দিয়েছে এবং গোরার জীবনকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে।

'ঘরে বাইরে' রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত, আর সেই পটভূমিকাতেই দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার দিকগুলো উদ্ভাসিত হয়েছে। বিমলার আত্মকথা দিয়ে কাহিনীর শুরু, তারপর বিমলার মোহে আবদ্ধ হবার পালা, পরবর্তীকালে বিমলার মোহবৃদ্ধির চরম অবস্থা। বিমলার চরিত্র যতটা আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিত, বিদ্রোহের সে প্রকট রূপ রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত অন্য কোন চরিত্রে দেখা যায়নি। অভিজাত পরিবারে নিখিলেশের সঙ্গে বধূ বিমলার স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সন্দীপের মোহে আবিষ্ট হল, শুরু হল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্জ্বালা। 'চোখের বালি'র অন্তর্জ্বালা 'ঘরে বাইরে' এসে আরও প্রকট হল।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও মনুষ্যত্ব সম্পর্কে চেতনাবোধ দেখা যায় তা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধাদিতে আছে এবং মহুয়া কাব্যের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। এখানেও উপন্যাসের নায়িকা কুমুদিনীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। পরিচিত সমাজ-সংসারের কাহিনীকে অবলম্বন করে মানবমনের জটিল দ্বন্দ্বকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ঠিক এভাবেই Doll's House-এর নায়িকা নোরাও বলেছিল, "I believe that before all else I am a human being,......I must make my mind which is right—Society or I."

'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' ও 'যোগাযোগ' তিনটি উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ

বিভিন্ন ধরণের নারী চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং সামাজিক আচার-আচরণ-সংস্কারকে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসগুলোতে যে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়, সেটা তার বলাকা কাব্যের গতিবাদকেই ইঙ্গিত করে।

'হালদার গোষ্ঠী', 'হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', 'ভাই ফোঁটা', 'শেষের রাত্রি', 'অপরিচিতা', 'তপস্বিনী', 'পয়লা নম্বর', 'পাত্র-পাত্রী' গল্পগুলোর মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মানবমন সম্পর্কে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের প্রধান চরিত্র হলো মৃণাল—সে তার বিবাহিত জীবনে বিন্দুকে কেন্দ্র করে নারীর যে অমর্যাদা ঘটছে এই সমাজে তার প্রতিই তার বিক্ষোভ আর পরিত্রাণের পথ না পেয়ে গৃহত্যাগ। এই গৃহত্যাগের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়, কিন্তু মুক্তিপথের কোন সন্ধান মেলে না। 'অপরিচিতা' গল্পে যে মুক্তির ইঙ্গিত মেলে তা নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক পথে। 'তপস্বিনী'তে কোন সমস্যা বা জটিলতা নেই,—সমাজের সংস্কারাচ্ছন্ন একটা চিত্র মাত্র।

'শেষের কবিতা'য় রোম্যান্টিক অমিতের প্রেম নিবেদনে লাবণ্যের মনে সাড়া জেগেছিল কিন্তু তার প্রেমকে সে যৌক্তিকতাহীনভাবে প্রশ্রয় দেয়নি; প্রতিটি পদক্ষেপে সে অগ্রসর হয়েছে বিবেচনার সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসগুলোর নারীচরিত্রেই কোথায় যেন অসংগতি থেকে যায় যে সূত্র ধরে সমস্ত জটিলতার সৃষ্টি হয়—লাবণ্য চরিত্র সেদিক থেকে একটু স্বতন্ত্র—যে যেন সব ব্যাপারে আগে থেকেই হুঁসিয়ার। মানসিক দ্বন্দ্ব তেমন তীব্র নয়। 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' উপন্যাসে যে প্রেমের ছবি চিত্রিত হয়েছে তাতে যেন কোনরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই, রবীন্দ্রনাথ যেন এখানে দেখাতে চেয়েছেন দাম্পত্য-জীবনের বাইরেও দেহক্ষুধাকে উপেক্ষা। শুধুমাত্র ভালভাসার তাগাদাতেই প্রেম দানা বাঁধতে পারে। নারীর জননী ও প্রেয়সী রূপ দুটো পৃথক সত্তাকে ঔপন্যাসিক উক্ত দুটো উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। দুটোই ছোটগল্পের পর্যায়ভুক্ত বলা যেতে পারে, খাঁটি উপন্যাস পর্যায়ভুক্ত নয়। চারিত্রিক পরিপূর্ণতা ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত নেই।

'শেষের কবিতা'য় যেটি পরিষ্কার তা হলো—বিবাহিত জীবনযাত্রার কর্তব্য ও অপার্থিব রোম্যান্টিক প্রেমের স্বপ্ন-রচনা—এ'দুটোর যোগসাজস অসম্ভবই বলা চলে, তাই শেষপর্যন্ত অমিত কেটী মিত্রের ও লাবণ্য শোভনলালের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চিরাচরিত ধারায় জীবন অতিবাহিত করতে লাগল।

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হল 'চার অধ্যায়' উপন্যাস।

অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দুটি এলা ও অতীনের প্রেম-ভালবাসা বিকশিত হয়েছে। সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ যেন তাদের স্পর্শও করতে পারেনি। 'তিন সঙ্গী'র ল্যাবরেটরী গল্পের মোহিনী চরিত্রটি অন্যান্য কথাকাহিনীর নারী চরিত্র থেকে একটু স্বতন্ত্র—কোন বিশেষ ছক বা সংস্কারের কাছে মাথা নত করেনি—নারীত্বের জয় ঘোষিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের নায়িকারা গতানুগতিক না হলেও পাঠক চিত্তকে মুগ্ধ করে। তাঁর সৃষ্টি নারীচরিত্রগুলো কখনও প্রিয়া, কখনও জননী; তবে 'যোগাযোগে'র কুমুদিনী, 'স্ত্রীর পত্রে' মৃণাল, 'ল্যাবরেটরী'র মোহিনী এবং 'পয়লা নম্বরের' অনিলা কিছুটা ভিন্নধর্মী—নারীত্বই তাদের প্রধান পরিচয়। তাই মৃণাল ও অনিলার চিঠির মধ্যে যে নীরব প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়—তা' নারীত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

শরৎ সাহিত্যে মুক্তি ও অনুভূতি

সাহিত্য 'মানবাত্মার বন্ধনহীন অভিব্যক্তি', এই সাহিত্যকেই শরৎচন্দ্র মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে। তাই তো শরৎচন্দ্র সাহিত্যে মুক্তিবাদী হৃদয়ের সত্যিকার অনুভূতি আনন্দ-বেদনার আলোড়নকেই সাহিত্যের একমাত্র বিষয় বলে নির্দেশ করেছেন।

বঙ্কিম-রবীন্দ্রযুগের পর শরৎচন্দ্রের হাতেই বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় পর্বের সূত্রপাত। বঙ্কিমচন্দ্র সংযমের জয়গান করেছেন, শরৎচন্দ্র মানবাত্মার মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরেই সাহিত্যের আঙিনায় শরৎচন্দ্রের প্রবেশে সাধারণ মানুষ ও সচেতন পাঠক মাত্রই আগ্রহী হয়ে উঠলেন। সাহিত্যের ধারা যেন ভিন্ন গতিপথে প্রবাহিত হতে লাগল।

শরৎচন্দ্রের অনুভূতি ও মুক্তিচিন্তা মূলতঃ মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণীকে কেন্দ্র করে এবং দীর্ঘকাল ধরে নিপীড়িত, নির্যাতিত নারী জাতিকে কেন্দ্র করে। সামন্ততান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ-কাঠামোর যাঁতাকলে নিষ্পেষিত নারী সমাজের কথা ভেবে শিল্পী মন, সাহিত্যিক মন আকুল হল—তাদের 'না বলা বাণী'কে তাঁর কলমের মুখে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়েছেন শিল্পীর বেদনা নিয়ে, মানবিক যন্ত্রণাবোধের থেকে। তাই তিনি কথাশিল্পী।

আদর্শ ভারাক্রান্ত সাহিত্যকে শরৎচন্দ্র তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মনের দ্বারা মুক্তি দিলেন, সাহিত্যের বাঁধাধরা বেড়াজাল ভেঙে দিতে চাইলেন। তাঁর মতে সাহিত্যে যে অনুভূতির প্রকাশ পায় তা ধরা-ছোঁয়ার অতীত কিছু নয়, তা আমাদের চতুষ্পার্শ্বের ব্যাপার মাত্র। তিনি দেখিয়েছেন যে, সাহিত্য অনুভূতির অভিব্যক্তি, আর এই অনুভূতির জন্ম হয় বাস্তবের মধ্যেই। শরৎচন্দ্র বলেছেন, —"সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা, সকল দিক দিয়া তাহাকে উন্নত করা।"

প্রচলিত সংস্কারে যে নারী সমাজের কাছে, পরিবারের কাছে অসতী, শরৎচন্দ্র তাকে অসতী না করে মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। পাঠকের এবং মানবদরদীদের সহানুভূতিও সেই আকর্ষণ করেছে—আর এখানেই সাহিত্যিক হিসেবে শরৎচন্দ্রের সার্থকতা। শরৎচন্দ্র চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুভূতির

সঙ্গে অন্ধকারের কারা ঘুচিয়েছেন নিষ্ঠাভাবে, মুক্তি পথের সন্ধান করেছেন সারাজীবন ধরে।

সমাজের হাতে, পুরুষের হাতে শতশত বছর ধরে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত, অসম্মানিত, লুণ্ঠিত নারী মুক্তি পেল শরৎসাহিত্যে—শরৎচন্দ্রের অনুভূতিপ্রবণ মন লেখনীর মাধ্যমে নারীকে দিয়েছে মুক্তি, নারীকে তিনি স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। 'পথের দাবী'-তে তিনি নারীর হাতে তুলে দিয়েছেন আগ্নেয়াস্ত্র। তৎকালীন সমাজে বৈধব্য জীবনযাত্রা নির্বাহ করা ছিল সর্বাপেক্ষা দুঃখের। সংস্কারের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে তারা কখনও শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছাতো। এ প্রসঙ্গে 'বড়দি'র মাধবী, 'পথনির্দেশে'র হেম, 'শেষ প্রশ্নে'র নীলিমা, 'শ্রীকান্তে'র রাজলক্ষী, 'পল্লীসমাজে'র রমা, 'চন্দ্রনাথে'র সুলোচনার কথা বলা যেতে পারে। সতীত্বের নামে নারীর ওপর পীড়ন চলেছে কত কাল ধরে। সতীদাহের বীভৎসতার কথা ভেবে তৎকালীন সমাজের নারীরা নারীজন্মের দুঃসহ জীবনযাত্রার কথা চিন্তা করে আতঙ্কিত হতেন। নারীকে দমন করবার জন্য কত সংস্কার, কত রীতিনীতি, কত কিছুরই সৃষ্টি হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের অনুভূতিপ্রবণ মন সাহিত্যে নারীকে আপন গৌরবে গৌরবান্বিত করে তুললো,—নারী পেলো তার যথার্থ সম্মান,—সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে পেলো মুক্তি। শরৎচন্দ্র নিজে তাঁর চরিত্র-সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন, 'কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ জানেনা, আমি তো জানি।" এমন কি নারীবিদ্বেষী Schopenhaur-ও বলেছেন,—"She pays the debt of life, not by what she does, but by what she suffers."

নারীজীবনের এই নিয়তিই শরৎচন্দ্রকে বিশেষ করে অভিভূত করেছে, নারীর সেই ক্রুশবিদ্ধ অবস্থাই তাঁর প্রাণে অপরিসীম সহানুভূতির উদ্রেক করেছে।

তাঁর যন্ত্রণাকাতর চিত্ত মনে করতো "সমাজের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে তার ভিতরের বাসনা-কামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য।" 'সমাজে যারা শুধু দিলে পেলে না কিছুই'—শরৎচন্দ্র তাদের জন্যই কলম ধরেছিলেন।

দারিদ্র্যপীড়িত দেশের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, বৃহৎ সংখ্যক রিক্ত বঞ্চিত মানুষের হাহাকার কথাশিল্পীর মনে যন্ত্রণার আলোড়ন তোলে, যন্ত্রণাবিদ্ধ শিল্পী জনগণের সামনে তুলে ধরলেন তাঁর 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাস। শরৎচন্দ্রের শিল্পী-ব্যক্তিত্বে আলোড়ন তোলে শিশুর কোমল হৃদয় ও

মাতৃত্বের নিবিড়তম স্নেহ ও বাৎসল্য যার শ্রেষ্ঠ ফসল তাঁর 'বামের সুমতি'।

তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতাকে শুধু বাইরের ঘটনা হিসেবেই দেখেননি, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনার অন্তরালে অনুভূতির অনুধাবন। তখন তিনি সুকৌশলে সাধারণকে অসাধারণের পর্যায়ে তুলে ধরেছেন, স্বৈরিনীকে আত্মত্যাগে পরিশুদ্ধ করেছেন, লম্পটকে মনুষ্যত্ববোধের উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে তুলে ধরেছেন, মত্তপের প্রতি সহানুভূতির করুণ রস জাগিয়ে তাকে অপূর্বতা দান করেছেন। সেদিক থেকে যথার্থ পন্থাই ধরেছিলেন। তাই তার গ্রন্থে হুইটম্যান বা দস্টয়ভস্কির মতো মানব সমাজের কাছে মানব দুঃখ নির্যাতনের বিরুদ্ধে নালিশ জানানো হয়েছে বটে, কিন্তু তার ফলশ্রুতি হচ্ছে শিল্পি-সৃষ্টি, রসের আনন্দদান। তিনি বলতে চেয়েছেন, সমাজ ও চরিত্র-নীতির চাপে কত নর-নারীর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, সেই বিনাশ ও ব্যর্থতার বেদনা-মধুর ছবি এঁকে তিনি যুগোপযোগী এক প্রকার নব্য মানবতাবাদের রসরূপ আঁকতে চেয়েছেন। শরৎচন্দ্র ছিলেন নীচের তলার কাছের মানুষ। সমাজের দারিদ্র্য, দাসত্ব, লাঞ্ছনাকে প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন শিল্পীর দায়িত্ববোধ থেকে।

দেশের পরাধীনতা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, বঞ্চনা, নিষ্পেষণ, অশিক্ষা ইত্যাদি অনগ্রসরতার সমস্ত দিকগুলোর অনুভূতির দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী মানবদরদী কথাশিল্পীর প্রশ্ন—"বেদনার কি আর কোন বস্তু দেখতে পাওনা? মানবজীবন সমস্ত সংসার, এত বড় পরাধীন জাতি, এসব তো রয়েছে, এর বেদনা কি তোমরা অনুভব কর না? আমরা সব চাইতে দরিদ্র, আমাদের মধ্যে শিক্ষার কত অভাব, সামাজিক ব্যাপারে কত ত্রুটি আছে, এসব নিয়ে তোমরা কাজ কর না কেন? এর অভাব, বেদনা কি তোমাদের লাগে না? এর জন্য প্রাণটা কাঁদে না কি?"

সমাজের গতানুগতিক বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের মন বিদ্রোহ করত, দীর্ঘকাল ধরে যখন সমাজে বাল্যবিবাহ, অকাল বৈধব্য, স্বামীর দাসত্ব, পরিবারের বোঝা, সমাজের বোঝা হয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে, মেয়েদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের কোন সুযোগ নেই, ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই, শরৎচন্দ্র তখন নারীর অন্তর্বেদনাকে উপলব্ধি করলেন এবং ব্যক্তিত্বশালিনী সন্ধ্যার মুখে তুলে ধরলেন: "......সেদিন আমিও বড় উতলা হয়ে পড়ছিলাম অরুণদা, কিন্তু আজ আমারও মন স্থির হয়েছে, মেয়ে মানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো কাজ আছে কিনা, আমি সেইটে জানতে বাবার সঙ্গে যাচ্ছি।"

শরৎচন্দ্রের আঁকা নারীচরিত্রগুলো যেন লেখকের একান্ত মনের কথা হয়ে ফুটে উঠেছে। যেমন, অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী, কমল, অচলা, অভয়া, কিরণময়ী, কমললতা, রমা, সন্ধ্যা, জ্ঞানদা, বিশেশ্বরী, নারায়ণী, বড়দিদি, মেজদিদি প্রমুখ।

গতানুগতিক সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধে শ্রীকান্তের উদ্দেশ্যে অভয়ার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়—"…একদিন আমাকে দিয়ে মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা? এত বড় অন্যায়, এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার একেবারে কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই—সমাজ সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচার স্বামী বিনা দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্বে ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া চাই?"

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শোষণ-নিপীড়ন-অত্যাচার-অবিচারের বিষময় দিকগুলো কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে ভাবিয়ে তুলেছে। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, শোষিত নারী-সমাজের গুমরে-মরা ক্রন্দনকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। তাঁর সমস্ত গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের মধ্যে এই গুমরে-মরা ক্রন্দনকে উপলব্ধি করা যায়। নারীর শৃঙ্খলিত জীবন তাঁকে ব্যথাতুর করেছে, ভাবিয়ে তুলেছে, তাই তিনি 'নারীর মূল্য'-তে লিখলেন: "নারীর মূল্য কি? অর্থাৎ কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখ-কষ্টে মৌনী, অর্থাৎ তাঁহাকে লইয়া কি পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী, অর্থাৎ পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবেন। দাম কষিবার এছাড়া যে আর কোন পথ নাই, সে কথা আমি পৃথিবীর ইতিহাস খুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।"

শরৎচন্দ্রের উপলব্ধি বা অনুভূতির খেই কোথাও হারিয়ে যায়নি বা দিকভ্রষ্ট হয়নি, ব্যথার সুর শেষ পর্যন্তই প্রাণস্পর্শী, তাঁর অনুভূতি ও মননশীলতা একই সুরে জেগে ওঠে।

বর্তমানকালে দাঁড়িয়ে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি আরও বহুকাল ধরে শরৎসাহিত্য সাহিত্য-পিপাসু মনের আনন্দের খোরাক যোগাবে এবং অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র বাঙালীর হৃদয়ে চির অম্লান হয়ে থাকবেন।

একসাথে: বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩

কবি নজরুল সামাজিক বোধে, অনুভূতিতে, আবেগে ছিলেন বহুল পরিমাণে পরিচালিত। সবচেয়ে আশ্চর্য এই খেয়ালসর্বস্ব মানুষ নজরুল, তাঁর সরল নিরভিমান চরিত্রের মাধুর্যের সকল খেয়ালী ভাবই মনে হয় একটি অকৃত্রিম অন্তর ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। তাঁর ছাত্রাবস্থায় দেখা গেছে পদে পদে ভুল, বুদ্ধিহীন কাণ্ড, আজীবন পরোপকার প্রবৃত্তি, অথচ সাধ্য কি এই জগৎভোলা মানুষকে, সংগীতজ্ঞকে, রাজনীতিবিদকে, সাহিত্যিককে, পরোপকারীকে শ্রদ্ধা বা সমাদর না করে? সে মানুষ উদ্ভট হোক্, ক্যাপা হোক্, পাগল হোক্ কিন্তু তাঁর সৃষ্টি-প্রাচুর্য জীবন-প্রাচুর্যেরই সাক্ষী। যেখানে নজরুল সেখানেই হাসির জোয়ার বয়ে চলেছে, নজরুল প্রাণ খুলে হাসতেন এবং হাসাতেন। হাস্য-কৌতুকে তাঁর জন্মগত অধিকার। জাতির মনের সঙ্গে যে এক হতে জানে সে শ্রেষ্ঠ গুণেরই অধিকারী। তিনি তাঁর রচনায় শিল্প-কৌশলের জন্য ব্যস্ত হননি বা শিল্প-বিশুদ্ধতাও দেখাতে চাননি, তাঁর সব কিছুর মূলেই কাজ করেছে শিশুর মতো মনের সরলতা, কোমলতা এবং সামাজিক চেতনা। সেদিনের নিম্নশ্রেণীর মর্মান্তিক জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল, আর নিজের দরদও তিনি গোপন করেননি, আর সেই গুণেই তিনি দেশের মানুষের আপনার হতে পেরেছেন। জীবন-দৃষ্টিতে গভীরতা হয়তো নজরুলের বেশি নেই কিন্তু যাঁর সমাজ-চেতনা এত প্রবল, সংগীতে সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর মনের নিবিড় সম্পর্ক, মানুষের জন্য যাঁর প্রাণ-ঢালা দরদ রয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাঁর রুখে দাঁড়াবার মতো ক্ষমতা রয়েছে বা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যাঁকে বুক পেতে নিতে হয়েছে চরম দণ্ড, সেই মানুষকে কি কোন মানুষ দূরে রাখতে পারে?

দৈন্যের সঙ্গে নজরুলের আজন্ম পরিচয়, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে তাঁকে চলতে হয়েছে। আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র, কাজেই দরিদ্র শ্রেণীর সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিলেন, বুক দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন তাদের ব্যথা-বেদনা। দারিদ্র্যের হাত থেকে রেহাই পাবার পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, তাই তো তিনি সমাজের সকলের আপন জন। নজরুলকে বলতে শুনেছি— "মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব—অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষাণ স্তূপের মতো জমা হয়ে আছে—এই

অসাধারণ, এই ভেদভাব দূর করতেই আমি এসেছিলাম।" সকলের সামনে কৃষক মজুরের দাবী জানাতেও পশ্চাদপদ হননি, কবিকে ঘোষণা করতে শোনা যায়,—'আমি গাহি তাদের গান, ধরণীর হাতে যারা দিল আনি ফসলের ফরমান'। তিনি মজুর স্বরাজ পার্টির অন্যতম সভ্য ছিলেন, 'লাঙলে'র ছিলেন মুখ্য সম্পাদক, নজরুলের কবিতাই ছিল 'লাঙলে'র বিশেষ সম্পদ।

কবি নজরুলের জীবন ও কাব্য দুইই বিস্ময়কর ও অভিনব। শিক্ষা-দীক্ষায় পোষাকীভাবে বেশী হয়তো অগ্রসর হননি, কিন্তু শিক্ষার যে ফল জ্ঞানলাভ, তা তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল অবলীলাক্রমে। কবি ঘর বাঁধলেন বটে, কিন্তু ঘরের মায়া তাঁকে কখনও বেঁধে রাখেনি। বন্ধুবৎসল নজরুল বন্ধুদের আড্ডায় ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হতেন। ধূমকেতু পত্রিকা কবির জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। জনসাধারণ 'ধূমকেতু' বলতে নজরুলকেই জানতো। বিদেশী সরকারের রক্তচক্ষু অবহেলা করে দুরন্ত কবি কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে ও সাময়িক পত্রে আগুনের ফুলকি ছড়াতে লাগলেন, যার সামান্যতম স্পর্শে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড শুরু হতে পারত। এর জন্য তাঁকে কিছুকাল কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছিল। রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে ইদানীং আর কোন সারস্বত সাধক এতটা উদ্দীপনা, উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস সঞ্চার করতে পারেননি। হিন্দু-মুসলমানের স্বাভাবিক ভেদ-বিচারকে অবহেলাভরে উপেক্ষা করে কবি যে শুভ আদর্শ প্রচার করেছেন, তার দাম দেবে ভাবীকাল।

একদিকে পাখীর ডাক, ফুল-ফলগাছ এবং ছোট্ট শিশুর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁর কবিতাকে শান্ত আনন্দরসে স্নিগ্ধ করেছে। নজরুলের 'কাঠবিড়ালী' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'কাঠবিড়ালী, কাঠবিড়ালী, পেয়ারা তুমি খাও'—এই কবিতাটি শিশু মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। অন্যদিকে তাঁর কবিতা ও সঙ্গীতকে প্রেরণা দিয়েছে তাঁর স্বাভাবিক ঔচিত্যবোধ, পরোপকার প্রবৃত্তি, অকৃত্রিম দরদ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার মতো বেপরোয়া সাহস। আর বিরল গুণসমূহের অধিকারী নজরুল বাংলার মানুষের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের প্রাণের মানুষ। একই সঙ্গে একটি মানুষের ভেতরে সকল শক্তির স্ফূরণ হয়েছে। এ'রকম একটি মানুষ কত সাধারণ মানুষের সঙ্গে কত সহজ সরলভাবে প্রাণ দিয়ে মিশেছেন। মানুষকে তিনি মানুষ ভেবেই শ্রদ্ধা করেছেন, ভাল-বেসেছেন, স্নেহ করেছেন, কোন পাপ-পুণ্য, দোষ-ত্রুটির বিচার-বিশ্লেষণে মাথা

ঘামাননি, তাই তিনি খাঁটি মানুষ। নজরুল তীব্রকণ্ঠে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঘোষণা করলেন,—

"মানুষের ঘৃণা করি
ওরা কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি,
ও মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে
যাহারা আনিল গ্রন্থ কেতাব সেই মানুষেরে মেরে
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল !"

বিদ্রোহী নজরুল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন,—

"মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ আমি সাইক্লোন,—
আমি ধ্বংস
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথিবীর
আমি দুর্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার।"

সমাজে নিপীড়িতা, লাঞ্ছিতা নারীকে পুরুষের সম মর্যাদা দেবার জন্য দুর্দম সাহস বুকে নিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন,—"যে ঘোমটা তোমায় করিয়াছে ভীরু। ওড়াও সে আবরণ"। কবি নজরুল নতুন সৃষ্টির আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, —"ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চিরসুন্দর!" তাঁর সঙ্গীতের মধ্যে তিনি পূর্ণতা এবং সেই চিরসুন্দর রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর 'আগমনী' এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সৈনিক কবি ঝংকার তুললেন,—

"আমি বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
যবে অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীমরণভূমে রণিবে না।"

হায়! মানুষটি আরও বহু বৎসর আগেই দেহে মনে শান্ত ক্লান্ত হলেন, বাঙালী তার প্রাণের মানুষটিকে সক্রিয়রূপে অনেক আগেই হারিয়েছে। অত্যাচারীর অত্যাচারের শেষ হলো কিনা জানিনা, কিন্তু নজরুল বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন। শারীরিক ক্ষমতা হারালেন, মস্তিষ্ক অসুস্থ হলো, জীবনসঙ্গী লেখনী

চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেল, বহু বৎসর ধরে নির্বাক কবি উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলে শুধু দেখেছেন, যেন পরীক্ষা করেছেন বাঙালী তাঁর সঙ্গীতে, কবিতায়, বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছে, কতটুকু চেতনা তিনি বাঙালী মনে জাগাতে সক্ষম হয়েছেন, জানিনা মনে মনে তিনি কতটুকু তৃপ্ত হতে পেরেছেন! কখনও মনে হয়েছে তাঁর দুচোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন আরও কিছু বলতে চায়, জানতে চায়। বাঙালী কিন্তু নজরুলের চলৎশক্তিহীন, ক্ষমতাহীন, মানুষটি শুধু প্রাণবন্ত, এটুকু দেখেও যথেষ্ট উৎসাহ, উদ্দীপনা পেয়েছে, তাঁর শেষ জীবনের না বলা বাণীটুকুও বাঙালীর জীবনে মূল্যবান ছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, বাকরুদ্ধ নজরুলকে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের মাটিতে নিয়ে গেল, সেই সঙ্গে অবশ্য নিতান্ত অহেতুক সুপ্ত অধিকার ফলাও-এর চেষ্টাও ছিল। তখন যেন নজরুলের আয়ত চোখের দৃষ্টি দুর্দমনীয় মহিমায় ইংরেজ কবি Daniel Webster-এর ভাষায় বলতে চেয়েছে,—

"My Soul, I like a ship in black storm
Is driven, I know not whether."

এ'পার বাংলার মানুষ নজরুলকে আর তাঁর জন্মভূমিতে ফিরিয়ে আনবার সুযোগ করতে পারল না, নজরুল বাঙালী জাতিকে বেদনা-সমুদ্রে ভাসিয়ে চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন। দুরন্ত কবি তাঁর জন্মস্থান চুরুলিয়ায় শেষ নিঃশ্বাসটুকুও ফেলবার অবসর পেলেন না। তিনি যেন 'মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করতে' চাইলেন। বাঙালীর শেষ বাসনা পূর্ণ হলো না। কবি পরিবার তাদের আপনজনকে শেষ বারের মতো একটু দেখতে পেল না, প্রমীলা দেবীর শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রইলো, চুরুলিয়াবাসী চোখের জল দিয়েই কবি-আত্মার শান্তি কামনা করলো। বাংলাদেশের মাটিতে যেখানে কবিকে কবর দেওয়া হয়েছে সেখান কবি-পুত্রের নিয়ে আসা এক মুষ্টি ধূলি পেয়েই কবি পরিবার, চুরুলিয়াবাসী তথা এ'পার বাংলার সকল মানুষকে সন্তুষ্ট হতে হয়েছে। কবি যেন মৃত্যুকে আশ্রয় করেই বলতে চাইলেন,—

"আমিও রেখে যাব কয় মুষ্টি ধূলি
"আমার সমস্ত সুখ-দুঃখের শেষ পরিণাম
রেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী
সকল পরিচয়গ্রাসী
নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে।"

কবি, গীতিকার ও সুরকার নজরুল

ইংরেজ কবি Wordsworth কবিতাকে বলেছেন, Spontaneous overflow of powerful feelings—কবি নজরুলের কবিতা সেই অকৃত্রিম হৃদয়ভাবেরই আবেগোচ্ছল প্রকাশ। কিন্তু সেই অকৃত্রিম হৃদয়ভাবে মানবমনে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চারক তাঁর কাব্য ও সঙ্গীতে বিচিত্র চিন্তা ও ভাবের আত্মোচ্ছ্বাস প্রকাশিত। তাঁর সৃষ্টি-প্রাচুর্যে দুর্দম তেজ ও অসমসাহসিকতার সুর পরিস্ফুট, এখানে পাণ্ডিত্যের কচকচানি এবং সনাতন অনুষ্ঠান অবহেলিত।

কবি নজরুলের সৃষ্টি-প্রাচুর্য বড় বেশি অভিনব ও আশ্চর্যজনক; দুর্দান্ত ও অফুরন্ত যৌবনবেগে ধাবিত হয়ে তিনি প্রাণস্পর্শী কবিতা ও সঙ্গীত রচনা ক'রে এবং তাতে অপূর্ব সুরসংযোজনের দ্বারা জনগণের কাছে পরিবেশন করে বাংলার প্রাণের মানুষ হয়ে অপরিমেয় শ্রদ্ধা কুড়িয়েছিলেন। বিদ্রোহী কবি যে কি করে প্রেম ও প্রকৃতির এমন আবেগপূর্ণ কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় সক্ষম হলেন, তা নিতান্তই অচিন্তনীয় ও অভাবনীয়। এই বিদ্রোহী মানুষটির অন্তরে যে ভক্তির ফল্গুধারাও প্রবাহিত ছিল, তা তাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীত ও ইসলামী গান থেকেই বোঝা যায়। প্রেমবিষয়ক গজল গান তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি, দেশ ও কালের সঙ্গে নজরুলের কাব্য ও সঙ্গীতের বিশেষ সম্পর্ক। কবি নজরুলের দরিদ্রের প্রতি, ঘৃণিতের প্রতি, সর্বহারাদিগের প্রতি যে সমবেদনা তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে, তা চিরস্থায়ী। উর্দু কাব্যে যে গজল গীতের প্রচলন ছিল, তা নিখুঁতভাবে বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন করেন। সর্বহারা গ্রন্থের সাম্যবাদী কবিতাবলী সর্বকালেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। 'সাম্যবাদী', 'ঈশ্বর', 'পাপ', 'মানুষ' শীর্ষক কবিতাগুলোর মধ্যে মানবমনের অকপট সত্যজিজ্ঞাসা এবং তার সদুত্তর নিখুঁতভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

নজরুলের কবিসত্তা ছিল উভয়খাতে প্রবাহিত। একদিকে নির্যাতিত মানবাত্মার প্রতি সমবেদনা, আবার অন্যদিকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুক্ষ প্রতিবাদ, একদিকে অপমানিতের জন্য সমবেদনাবোধ, অন্যদিকে গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি ছল করে দেখা অনুখন-এর প্রতি আগ্রহ, একধারে বেদুঈনী বিদ্রোহ, অন্যধারে ওমরখৈয়াম প্রেম। কবি আধ্যাত্মিক জীবনেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁর জীবনটাই ছিল একটা বিরাট দর্শন। শুধু কবি হিসেবেই নন, গীতিকার

আর সুরকার হিসেবেও তিনি যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, তা অবিস্মরণীয়। চারণ কবির যতটুকু গুণ থাকা প্রয়োজন, কবি নজরুলের তার সবটুকুই ছিল। দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে নজরুলের দেশপ্রেমমূলক গান ভারতবাসীর প্রাণে প্রেরণা জাগিয়েছিল।

নজরুল সাহস, বীর্য, আশা ও জীবনে বিশ্বাস নিয়ে রেখেছিলেন অপরাজেয় এবং তাই তিনিও যেন ব্রাউনিং-এর মতোই বলতে চাইলেন,—'One who never turned his back but marched breast forward" সমগ্র মানবজাতির জন্য কল্যাণচিন্তা, মানুষে মানুষে ভেদ, সম্প্রদায়গত ভেদ, ধর্মভেদকে কবি কোনদিন মাপ করেননি, অভিজাত ও অভিজাত মোহাবিষ্ট শ্রেণীর ভণ্ডামি, কৃত্রিম শিষ্টাচার, ইতর রুচিকে তিনি কোনদিনই আমল দেননি, তাই তো তিনি কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "গাহি সাম্যের গান।" কবিকণ্ঠে স্ফুরিত হলো,—

সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা,
খুলে দেখ নিজ প্রাণ।

Robert Browning যেমন তেজস্বিতা ও অসম সাহসিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন,

"Strive and thrive "Cry" Speed, fight on fare ever There as here !"

ঠিক তেমনিভাবে নজরুলও দেশমাতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য দৃপ্তকণ্ঠে গাইলেন,

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁসিয়ার।"

চিরবিদ্রোহী বীর কবি অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় কোন কালে কখনও পশ্চাদপদ হননি,—

"আমি চির বিদ্রোহী বীর
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির।

বিশ্বকবির কাছে যেরূপ নূতন ভীষণ এবং মধুর, বিদ্রোহী কবিও সেরূপ ধ্বংসের করাল মূর্তিকে বরণ করে নিয়েই নতুনের সুন্দর মূর্তি দেখতে আগ্রহী। বিশ্বকবির মতে সৃষ্টি যদি ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে না আসে তবে সৃষ্টির পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও স্থায়িত্ব রক্ষা হয় না। বিশ্বকবিকে তাঁর বর্ষশেষ কবিতায় বলতে শুনেছি,

"হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন্ ঝনন্,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।"

বিদ্রোহী কবিও সৃষ্টির চিরসুন্দর রূপকে ফুটিয়ে তুলতে ধ্বংসকে মেনে নিয়ে নির্বিবাদ নির্ভীক চিত্তে নতুনকে প্রাণভরে আহ্বান করলেন,—

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—
প্রলয় নূতন সৃজন বেদন,
আসছে নবীন জীবন-হারা
অসুন্দরে করতে ছেদন।"

কবি যে অন্ধকারের দুর্গম পাড়ি পথ দিয়েই আলোর সন্ধান করেন ও শান্তি কামনা করেন, তাইতো কবিকে বলতে শোনা যায়, "আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।"

নজরুলের কাব্যে ও সঙ্গীতে মধুর রসেরও অকৃত্রিম প্রকাশ ঘটেছে। তিনি তন্বী কুমারীর বেণীতে নয়নের বহ্নিতে, হৃদয়ের প্রেমে আত্মপ্রকাশ করেছেন, তিনি উপলব্ধিও করেছেন উদাসীর উন্মন মন, বিধবার ব্যথা, হুতাশীর হাহুতাশ এবং ব্যথিতের অন্তরের ব্যথা। প্রিয়লাঞ্ছিত নায়িকার বুকের ব্যথায়, চিরক্ষুব্ধ হৃদয়ের কাতরতায়, আবার প্রথম পরশে কুমারী হৃদয়ের যে লজ্জা-প্রেমে কম্পন তাও তিনি প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছেন। প্রিয়ার গোপন চকিত দৃষ্টিতে, চপল মেঘের প্রেমে তিনি চিরশিশু আবার চির কিশোর, পল্লী কিশোরীর অঞ্চলে, কাঁচুলিতেও তিনি অবস্থান করছেন,

"গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি,
ছল করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেঘের ভালবাসা
তার কাঁকন চুড়ির কনকন,
আমি চির-শিশু, চির কিশোর,
আমি যৌবনভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর"

উদ্দাম যৌবনশক্তির প্রকাশক কবি কুমারীর তন্বীর ষোড়শীর বিধবার চেতনার সঙ্গে স্বীয় চেতনার সামঞ্জস্য অনুসন্ধান করেছেন,—

আমি বন্ধনহারা কুমারীর বেণী, তন্বী নয়নে বহ্নি
আমি ষোড়শীর হৃদি সরসিজ প্রেম উদ্দাম আমি ধন্যি।
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস হা হুতাশ
আমি হুতাশীর।"

একদিক থেকে নজরুলকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের হাফিজ বলা যেতে পারে। এত অধিক সংখ্যক রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে বা মুখস্থ রাখতে আর কাউকে কখনও শোনা যায়নি। জীবনের প্রথম দিকে তো তিনি মূলত রবীন্দ্রসঙ্গীতই গাইতেন। তখন তাঁর স্বরচিত সঙ্গীত ছিল না বললেই চলে। কেবল মাত্র একটি স্বরচিত গান তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হোত,—" পথিক ওগো চলতে পথে তোমায় আমায় পথের দেখা।" দু'একটি হিন্দুস্তানী গান তিনি নিজে রচনা করেছিলেন। কোনো হিন্দুস্তানী বস্তির নিকটবর্তী অঞ্চলে গেলে হিন্দুস্তানী গানও গাইতেন। তাঁর গান ও আবৃত্তি শোনার জন্য কৃষক-মজুর শ্রেণীর কাছ থেকেও অনবরত অনুরোধ আসতো। নজরুল ইসলামের নতুন নতুন কবিতা ও গান সাহিত্য ও রাজনীতিকে উভয় ক্ষেত্রেই উদ্দীপ্ত করে তুললো। নজরুলের প্রতিভায় যেন সারা বাংলা জেগে উঠলো। তাঁর কণ্ঠ যে খুব বেশি মধুর ছিল তা বলা চলে না, কিন্তু তার স্বরচিত সঙ্গীত তার কণ্ঠে যেন অপূর্ব মহিমায় সঞ্জীবনী সুধা রূপে ধ্বনিত হতো। তিনি তাঁর গানের মর্মার্থকে গানের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট করতে সক্ষম হতেন, যার ফলে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার গান শুনতেন। সুষ্ঠু ছন্দ-বন্ধন, আলঙ্কারিকতার অপূর্ব সমাবেশ, কথা, ভাব ও ভাষার বৈচিত্র্যই নজরুল-গীতিকাকে চিরস্থায়িত্ব দানে সহায়তা করেছে। তার সুরের সুন্দর ভঙ্গিমা ও মধুরতা সাংস্কৃতিক জগতে একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে।

১৯২৫ সাল থেকে নজরুল-গীতি গ্রামোফোন রেকর্ডে শোনা যায়। 'হিজ মাস্টার্স ভয়েসে' নজরুলের প্রথম গান হলো 'জাতের নামে বজ্জাতি সব'। ১৯২৬ সালে তার আরও দুটি গান শোনা যায়,—"পুঁথির বিধান যাক্ পুড়ে তোর বিধির বিধান সত্যি হোক্" এবং "দোহাই তোদের, এবার তোরা সত্যি করে সত্যি বল।" ১৯২৮ সালে শারদীয়া পূজায় নজরুলের স্বকণ্ঠে 'নারী' কবিতার আবৃত্তি মুক্তিলাভ করে, প্রায় একই সঙ্গে রেকর্ডে প্রকাশিত হয়,—"বাগিচায় বুলবুলি তুই" এবং "আমারে চোখ ইসারায় ডাক দিল হায়।" মেগাফোনে প্রথম যে গান রেকর্ডিং হয় তা নজরুলেরই রচিত, তখন নজরুলের মোট ২৮টি গান রেকর্ডিং হয়। তন্মধ্যে চারটি গান খুবই জনপ্রিয়। গান চারটি হলো,—

(১) 'দিতে এলে ফুল হে প্রিয়', (২) 'কেন আসিলে ভাল বাসিলে'; (৩) 'দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি'; (৪) 'পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি সোনার ছোঁয়ায়'।

গুরু জমিরুদ্দিন খাঁর নিকট থেকে নজরুল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ভালভাবে আয়ত্ত করেন। হিন্দুস্তানী ও ইসলামী সঙ্গীতের বহু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তিনি রেখে গেছেন। বাংলা গজল গানে নজরুলের অবদান চিরস্মরণীয়। প্রতিটি গান কথা, সুর এবং ভাবের সুষ্ঠ সমন্বয়ে অপূর্বতা দান করেছে। 'দিতে এলে ফুল' এবং 'পাষাণের ভাঙালে ঘুম' প্রসঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানীর মন্তব্য হলো,—"এই গান তাঁর আগ্রা দুর্গের জন্য নয়, আমাদের কবিও অমরত্ব লাভ করবেন তাঁর প্রেমিক প্রাণের সহজ সরল অনাড়ম্বর প্রাণস্পর্শী প্রেম গাথায় ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কিছুদিন হইতে বাঙ্গালী পরিপূর্ণভাবে সঙ্গীতরসের পরিচয় পাইয়া আসিতেছে কবির রচিত শত শত জনপ্রিয় সঙ্গীতে। যে কণ্ঠ একদিন বাংলার পথে-প্রান্তরে নগরে-গ্রামে গঙ্গার পদ্মার তীরে নবপ্রাণের বাণী শুনাইয়া ফিরিয়াছে, প্রাণ-উন্মাদিনী সেই কণ্ঠকে চিরস্থায়ী ভাবে রেকর্ডে রেখাবদ্ধ করা হয় নাই, আজ প্রত্যেক দেশবাসীর দ্বারে আমরা সেই সুবিধা লইয়া আসিয়াছি।" রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর নজরুলের স্বকণ্ঠে রেকর্ডে 'রবিহারা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়, যার উল্টো দিকে ধ্বনিত হয়েছে, "ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে"। রেকর্ডে মুক্তি প্রাপ্ত এটিই নজরুলের শেষ গান।

এক হিসেবে নজরুলকে জন্মকবি, গীতিকার ও সুরকার বলা যেতে পারে। গান তাঁর কস্টসাধ্য, আয়ত্ত করা কিছু নয়,—ঐ ব্যাপারে তাঁর সহজাত অধিকার বলা যেতে পারে। যেখানে যেতেন, সেখানেই নিঃসঙ্কোচে প্রাণ ঢেলে গাইতেন, এই গানের বৈশিষ্ট্য হলো বলিষ্ঠ মন প্রাণের প্রাণ মাতানো আকুতি, আর এটিই হলো তাঁর ব্যক্তিত্বের মহান প্রকাশ। উত্তর ভারত ও পাঞ্জাব অঞ্চলের নানান ধরনের সুর বাংলা গানে প্রয়োগ করেছিলেন। তার মধ্যে গজল ছিল অন্যতম প্রধান রীতি। এই সুললিত ধারাই তাকে এত জনপ্রিয় করেছিল। সম্ভবতঃ কবিতা অপেক্ষাও তিনি গীতিকবি ও সুরকার হিসেবে অধিকতর শ্রেষ্ঠত্বের এবং চিরকালীন সম্মানের অধিকারী।

গজল রচনায় নজরুল এক বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। হাফিজ রীতিতে গান রচনা করে এবং ফার্সী গজলের সুর ও ভাষা প্রদান করে শ্রুতিমধুর গান গেয়েছেন। ভাল উর্দু গজলের প্রয়োগও তাঁর গানে যথেষ্ট সংখ্যক। সেই

অনুপাতে ইসলামী সঙ্গীত কম রসোত্তীর্ণ হয়েছে। সেই কাজরী, দাদরা ইত্যাদি বিচিত্র রকমের গান তাঁর রচনার মধ্যে আছে। জনপ্রিয় নাটক 'কারাগারে'র কয়েকটি গানে তিনি সুর দিয়েছিলেন, সেগুলো শ্রোতাদের অভিনন্দন লাভ করেছিল। তার সঙ্গীতের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো পুরাতনকে অবহেলা না করে, আবার নতুনত্বের উগ্র খোঁচা না দিয়ে এক অপূর্ব ভঙ্গিমায় সুখশ্রাব্য কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করা।

সঙ্গীতের মধ্যে কবি এক সুন্দর সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন। 'কালো মায়ের পায়ের তলায় আলোর নাচন' দেখলেন। তাঁর শ্যামা সঙ্গীত প্রকৃত লিরিকে উত্তীর্ণ হয়েছে। এখানে তিনি বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র শক্তিকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁর মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি বা ভণ্ডামি নেই, আছে সহজ সরল চিত্তের প্রাণের আকুতি, যার দ্বারা জনগণ জাগ্রত হতে পারে, শক্তি ও প্রেরণা অর্জন করতে পারে। 'রক্তাম্বর ধারিনী মা'-এর মধ্যে তিনি রুদ্রাণী রূপকে অনুসন্ধান করলেন। সমাজের প্রয়োজনে মানুষকে জাগিয়ে তুলতে জগজ্জননীকে 'ভদ্রকালী'তে পরিসজ্জিত করলেন,—

"দেখে যারে রুদ্রানী মা
সেজেছে আজ ভদ্রকালী।"

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য, দেশ জননীর সন্তানবর্গকে দুঃখ, অপমান, লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করতে, কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কবি সর্বপ্রথমে দেশ জননীকে তাঁর মনের মতো করে সাজাতে চাইলেন,—

"রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক্ শ্বেত বসন।
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনন্-ঝন্।"

মায়ের এলোকেশে কালবৈশাখীর ভীম-তুফান প্রত্যক্ষ করলেন,—

"এলো কেশে তব দুলুক ঝঞ্ঝা
কালবৈশাখী ভীম তুফান।"

কবি ভীমাভয়ঙ্করী মাতাকে শ্মশানচারিনী শঙ্করীর মতো রূপ ধারণ করতে অনুরোধ করলেন,—

"হাস খল খল, দাও করতালি
বল হর হর শঙ্কর।
আজ হতে মাগো অসহায় মম
ক্ষীণ ক্রন্দন সম্বর।"

কবি বরাভয়দায়িনী মহামায়ার এক অপূর্ব রূপ 'আগমনী'তে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'আগমনী'তে তিনি প্রমাণ করলেন দানবীয় শক্তি ও পশুশক্তি মিথ্যা, মানবীয় শক্তিই সত্য।

তাঁর রচিত শাক্তপদাবলীতে সংসারের দুঃখ-ক্লান্ত, নিপীড়িত, প্রবৃত্তি-তাড়িত সন্তানের যে মর্মভেদী আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে, তা' কর্মে বিপুল উদ্দীপনা সঞ্চার করে। শহরের লোককে মাতিয়েছে তাঁর মাতৃসঙ্গীত। নির্বিচার পীড়নের মুখে নিস্তেজ, ভাববিহ্বল জড়ীভূত জীবনে তাঁর সঙ্গীত সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করেছিল, হতোদ্যম জীবনে এই সঙ্গীতই উৎসাহের সঞ্চারক।

তাঁর সঙ্গীতে পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, ন্যায় অন্যায়, ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামির অবকাশ নেই, মন-প্রাণই সব কিছুর স্রষ্টা,—

"The mind is its own place and itself
Can make a heaven of hell, of a hell of heaven."

অথবা, যেন প্রমাণ করতে চাইলেন,—

"There is nothing good or bad, but
Thinking makes it so."

জীবনের মূল্যায়ণে সব খানেই একটা সুস্থির ধর্মবোধ আছে,—আর নজরুলের সেই ধর্মবোধ সাহস, বীর্য, আনন্দ ও আন্তরিকতা এবং অসমসাহসিকতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর জীবন, কাব্য ও সঙ্গীত তারই ভিত্তিতে গঠিত। আর তার সৃজন-ধর্মিতা ও সুরেলা কণ্ঠ তাই সকল বয়সের জন্য সর্বকালে আদরণীয় ও শ্রদ্ধার্হ।

"পেতেছে বিশ্বে বণিক-বৈশ্য অর্থ-বেশ্যালয়,
নাচে সেথা পাপ-শয়তান-সাকী, গাহে যক্ষের জয়!"
—নজরুল ইসলাম

বর্তমান সমাজ কাঠামোতে নারীর অবস্থান

শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় নারীর কোনরকম স্বাধীনতাকেই শাসকগোষ্ঠী মেনে নিতে পারে না। শাসকগোষ্ঠী নিচুতলার মানুষ ও নারীকে সমজ্ঞানেই শোষণ করে সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই। নারীকে দাসী ও ভোগ্যপণ্যস্বরূপই ধরে নেওয়া হয়, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনুকম্পার পাত্রী, বড়জোর ভাববাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য জগতের খোরাক। যে সামাজিক কাঠামোতে নারীকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শোষণ করা হয়, সমচিন্তাশক্তির অধিকারী বলে যাকে ভাবতে পারা যায় না, যার মূল্যবোধ শুধুমাত্র নারী হিসেবেই, মানুষ হিসেবে নয়—সেইখানে দাঁড়িয়ে নারীজাতির কোনরকম স্বাধীনতা আছে ভেবে নেওয়া অলীক কল্পনামাত্র।

বুর্জোয়া গণতন্ত্রে দেখা গেল, এই যে, শিক্ষা গ্রহণের সামান্যতম সুযোগ পেয়েও মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশায় শিক্ষাদানে ও শিক্ষাগ্রহণে, অফিসে-আদালতে, প্রশাসন ব্যবস্থায়, সাহিত্য শিল্প-সংস্কৃতির জগতে, ক্ষেতে, খামারে, কারখানায়, বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ-গ্রহণ করছে এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হচ্ছে। সর্বোপরি রয়েছে সমস্ত কাজের মধ্যে স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসার রসসিঞ্চন। তারপরেও যুগ যুগ ধরে বলে আসা হচ্ছে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের বুদ্ধি কম।

শিক্ষার আলো থেকে যুগযুগ ধরে বঞ্চিত মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। কিন্তু তাতেই আর কি হল! শিক্ষা গ্রহণকে রাষ্ট্র যদি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি না দেয় তাহলে কয়জন নারীর পক্ষে এই সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব? অর্থাভাবই সেখানে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। সহরাঞ্চলে বা গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র মা-বাবা কষ্ট করে হলেও ছেলেকে শিক্ষিত করার জন্যই অর্থব্যয় করেন, মেয়ের বেলায় আর সেই ঝুঁকি নিতে চান না, কখনও আবার ঔদাসীন্য, ভাবখানা এই—'মেয়ে মূর্খ হলেই বা কি যায় আসে, কোনরকমে কারুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলেই হল।' সংসারের প্রয়োজনে মেয়েকে দিয়ে সংসারের হাল টানানো হয়। শিশুকাল থেকেই মেয়েটিকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় ছেলেদের বুদ্ধি মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি, চিন্তাশক্তিও তাদেরই বেশি, অতএব, মত প্রকাশের স্বাধীনতাও তাদেরই,

যাবতীয় সুখভোগের অধিকারী পুরুষরাই। আপাত দৃষ্টিতে বহু সৌখীন পরিবার দেখে মনে হবে কেন মেয়েরা তো বেশ সেজেগুজে আনন্দে ঘর-সংসার চালাচ্ছে, কিন্তু তারও মূলে রয়েছে পুরুষের মনোরঞ্জন এবং পুরুষের দয়া-কৃপা,—সম অধিকার নয়, সমান স্বাধীনতা নয়—শুধু মাত্র আত্মোৎসর্গের তৃপ্তি। দীর্ঘকাল ধরেই এই ব্যবস্থা চলে আসছে, তাই মেয়েদেরও মোটামুটি এটাই মজ্জাগত হয়ে গেছে। মেয়েরা মনে করছে পিতা-ভ্রাতা-স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা থাকুক আর নাই থাকুক দাসীর মত সেবা করতে পারলেই পুণ্যিলাভ অনিবার্য। যুগ যুগ ধরে ব্যাপারটা যন্ত্রবৎ চলে আসছে আর সকল দায়িত্ব, কর্তব্য, শোষণ-বঞ্চনা যখন নারীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন দেখা যায় রীতি-পদ্ধতি সবই ঠিক আছে শুধু ভালবাসা নামক বস্তুটি উধাও হয়ে যায় পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে। সমাজে নারীর মর্মান্তিক অবস্থানের প্রতি দৃষ্টি রেখে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তার 'নারীর মূল্য'তে বললেন, "অনুপাতের উপর নারীর সম্মান বা অসম্মান নির্ভর করে না। করে পুরুষের এই ধারণার উপর—নারী সম্পত্তি, নারী শুধু ভোগের বস্তু। তাই নিজের কন্যা বধ, তাই পরের কন্যা হরণ করিয়া আনিবার প্রথা! নিজের কন্যা পরে লইয়া গেলে মহা অপমান, পরের মেয়ে কাড়িয়া আনিতে পারিলে মহা গর্বের।"

বিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে দাঁড়িয়েও ভারতবর্ষের অধিক সংখ্যক জনগণ নিরক্ষর। ৭১ সালের লোকগণনার রিপোর্টে জানা যায় ভারতে নারীশিক্ষার হার শতকরা ১৮·৪৪, গ্রামাঞ্চলে ৮ শতাংশেরও কম। শিক্ষার আলো না পাওয়ায় ন্যায়-অন্যায়বোধ, সমাজসচেতনতাবোধ, মর্যাদা-অমর্যাদাবোধ জাগ্রত হচ্ছে না। বিপরীত দিকে বরঞ্চ কুসংস্কার, ধর্মভীতি, প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক আচরণ মজ্জায় মিশে গিয়ে শেকড় গেড়ে বসেছে, যার ফলশ্রুতি হল পুরুষের অর্থচিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধির ওপরে নির্ভর করে নারীজীবনের সার্থকতার পথ খোঁজা আর নারীসমাজ তারই খেসারত দিয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে দৈহিক নির্যাতনও সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছে।

১৯৫১ থেকে ৭১ সালের এই ২০ বছরের মধ্যে চাকুরিজীবী মহিলার সংখ্যা ১২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে প্রতি ১ হাজার চাকুরিজীবী পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা হচ্ছে ২১০ জন, কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত মহিলার সংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ থেকে কমে ২ কোটি ৫০ লক্ষে দাঁড়ায়। অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত নারীর সংখ্যা ৯৩ লক্ষ থেকে কমে ৬২ লক্ষে দাঁড়ায়। কৃষি-

সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞ কমিটির ওয়ার্কিং গ্রুপের রিপোর্টে প্রকাশ, গ্রামাঞ্চলে বেকার নারীসংখ্যা হল ১ কোটি ১৬ লক্ষ। শিক্ষার হার ৫১ সালের ৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭১ সালে ১৮.৬ শতাংশ হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এই সময়ে নিরক্ষর সংখ্যা ১৫ কোটি ৮৭ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২১ কোটি ৪৭ লক্ষে পৌঁচেছে। ৩৫২টি জেলার সমীক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় ১৯৬টি জেলার শিক্ষিত নারীর সংখ্যা ১০ শতাংশেরও কম। এখন পর্যন্ত শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ১ কোটি ৪০ লক্ষ নারী দরিদ্রসীমার নীচে এবং তারা নিরক্ষর।

যে পণপ্রথা নিয়ে আজ এত তোলপাড় সহরে ও গ্রামে, তার কতটুকু সুরাহা করা সম্ভব হয়েছে? এমনকি স্বাধীনতার উত্তরকালে মেয়েদের অধিকারের কথা চিন্তা করে নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে আইন রচনা হওয়া সত্ত্বেও! যে সমাজে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, সেই সমাজে মেয়েদের তো পণের বলি হতেই হবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কারণ কিসের ওপর দাঁড়িয়ে মেয়েরা মর্যাদা বা স্বাধীন চিন্তার কথা ভাববে? পায়ের তলায় তো তাদের মাটি নেই, ধরে দাঁড়াবার মত শক্ত খুঁটি নেই যাতে ভর দিয়ে উন্নত জীবনযাত্রার স্বপ্ন দেখবে! পণপ্রথার দর কষাকষি চলছে পুরোদমেই, সহরের ভদ্র-শিক্ষিত সম্প্রদায় থেকে গ্রামের নিরক্ষর দরিদ্রদের মধ্যেও। সৌখিনভাবে মাঝে মাঝে শুধু কথার রকমফের হয় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আজও তো মেয়েরা পরাধীন—স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হল নির্বুদ্ধি মেয়েদের বোঝা যখন বইতেই হবে তাহলে আর কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কাছ থেকে অন্তত সখ-আহ্লাদ মেটাবার মত ধন-সম্পদ তো নেওয়া চাই,—এই সুযোগে যতটুকু পাওয়া যায়—এই আর কি!

১৯৬১ সালে পণপ্রথা বিরোধী আইন তৈরি হল—Dowry Prohibition Act। বলা হল বিয়ের শর্তাধীনে কন্যাপক্ষ থেকে কিছু গ্রহণ করলে তবেই তা যৌতুক হিসেবে গণ্য করা হবে, তা নাহলে এই আদান-প্রদানে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, যৌতুক নিলে ছয়মাস জেল অথবা ৫০০০ টাকা জরিমানা—দুইই হতে পারে। কথার মার-প্যাঁচের মধ্যে দিয়ে মেয়ের সুখ-শান্তি হতে পারে ভেবে অর্থবান ব্যক্তিদের অনুকরণে গরিব পিতাও নাভিশ্বাস তুলে জামাইকে সন্তুষ্ট করতে চাইলেন, সমাজে সামান্য প্রতিষ্ঠা খুঁজলেন। সবকিছুর পরেও মেয়ের জীবনের সুখ-শান্তি কিন্তু লটারির টাকা পাবার মতই হয়ে দাঁড়াল। মেয়েদের ক্ষেত্রে যতগুলো আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর অধিকাংশ ঘটনাই পণ নামক

অর্থ লালসাকে কেন্দ্র করে। ১৯৭৪-এ আইনের সংশোধন হয়েছিল কিন্তু আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকেও মুক্তি নেই। হিন্দু প্রথার অনুকরণে মুসলিম সমাজেও পণপ্রথার প্রতিফলন ঘটেছে।

সমাজের পতিতা বা বেশ্যাবৃত্তির মূলেও তো অর্থনৈতিক পরাধীনতাই প্রধানত দায়ী। কতক অভিভাবক অর্থের অভাবে হয়তো কন্যাকে পাত্রস্থ করতে পারেননি, কন্যা পিতা-ভ্রাতার সংসারে গলগ্রহ, দিন-রাত গঞ্জনা শুনে শুনে কান ঝালাপালাতে সদুপায়ে জীবিকা নির্বাহের পথ পায়নি, তারপর জীবনক্ষুধা মোচনের জন্য নেমে এসেছে দেহ বিক্রির পথে। নারীদেহকে বিজ্ঞাপনের কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়ী মুনাফাবাজরা অর্থ লুটেপুটে নিচ্ছেন। প্রথমদিকে অর্থাভাবে কতক মেয়ে মুনাফাখোরদের হাতের পুতুল হয়, তারপর একসময় এটা নেশায় দাঁড়িয়ে যায়। শিক্ষার অভাব এবং সমাজসচেতনতার অভাবে এরা অন্ধকারের গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। হোটেল-ক্যাবারের নর্তকীরাও একই অবস্থার শিকার হচ্ছেন। অবক্ষয়িত সমাজের এটাই তো রীতি।

সমান কাজে সমান মজুরির দাবিকে আইনে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে সেটা প্রযোজ্য হয় না। নারী-শ্রমিকের ক্ষেত্রে সমান কাজ করিয়ে পুরুষের তুলনায় কম মজুরি দেবার প্রবণতা রয়েছে মালিকদের মধ্যে। প্রয়োজনে নারী-শ্রমিককেই আগে ছাঁটাই করা হয়। চা-বাগিচা ও চটকলের নারী-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই নিষ্ঠুরতা সবচেয়ে বেশি দেখানো হয়,—অন্যান্য ক্ষেত্রেও এভাবেই চলে আসছে। কৃষিকাজের জন্য নিযুক্ত গ্রামের মহিলাদের বৎসরে কয়েকমাসের জন্য মাত্র কাজের সুযোগ থাকে। চটকলে ২৫০০০-এরও অধিক সংখ্যক নারী-শ্রমিক নিয়োজিত ছিল, বর্তমানে সম্ভবত ৩০০০-এর বেশি নয়। ৬১ সালে মোট শ্রমজীবী মানুষের শতকরা ২৭ ভাগ ছিল নারী-শ্রমিক আর এখন শতকরা ১৮ ভাগ।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৩৬ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও সমানাধিকার ভোগ করার সুযোগ নারীসমাজ পায়নি।

১৮৫৭ সালে ম্যারেজ এ্যাণ্ড ডিভোর্স এ্যাক্টে (Marriage and Divorce Act, 1857) স্ত্রী-পুরুষ আইনত সমান অধিকারে অধিকারী বলা হল। ১৮৮২তে Married Women's Property Bill পাশ হয়। ১৮৬৫তে জন স্টুয়ার্ট মিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইনত সমানাধিকারের ওপর বেশি জোর

সেন। ১৮৬৫তে Ladies Discussion Society প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৭ সালে Women's National Suffrege Society প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫-এ মিসেস প্যাংখার্স্ট (Mrs. Pankhrist)-এর নেতৃত্বে সাফ্রেজিস্ট আন্দোলনের মধ্যে জন স্টুয়ার্ট মিলের বিখ্যাত বই Subjection of Women, 1869-এ আছে,— "That the principle which regulates the existing social relation between the two sexes—the legal subordination of one sex to the other is wrong itself, and now one of the chief hindrances to human improvement .. (বর্তমানে যে নীতির ওপর নারী পুরুষের সামাজিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত, একের কাছে অপরের বশ্যতা তা ভুল এবং মানব সভ্যতা বিকাশের পথে অন্তরায়।)

১৯৫৬ সালে পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন তৈরী হল, আইনে বলা হল এই ব্যবসা চালালে ৩ থেকে ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ২০০০ টাকা জরিমানা ইত্যাদি। কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় বা আবাসিক ব্যবস্থা, হাসপাতাল ও নার্সিংহোম থেকে ২০০ গজের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি চললে তিনমাসের কারাদণ্ড, প্রয়োজনে এদের 'Protective home'-এ রাখতে হবে। আইনে আরও বলা হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্পেশাল পুলিশ অফিসার, বেসরকারি উপদেষ্টাপর্ষদ, ৫ জন সমাজসেবী মহিলা নিয়োজিত থাকবেন এবং ২১ বছরের কম বয়সী মেয়েকে দিয়ে ব্যবসা চালালে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করবেন। কিন্তু কার্যত কিছুই হচ্ছে না—সবই চলছে পুরোপুরি। যে দেশে শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে সে দেশে আইন করে ঐগুলো বন্ধ করা সম্ভব নয়।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল যে, ধনী এবং উচ্চবিত্ত ঘরের মেয়ে-বৌ-রা সামাজিক অবস্থার ততটা বলি হয় না কারণ অর্থের প্রাচুর্যের মধ্যে দিয়ে স্বেচ্ছাচারিতা অথবা আমোদ-আহ্লাদেই জীবনটা কোন রকমে কেটে যায় কতকটা নেশার ঘোরের মতই, সমাজের কথা ভাববার অবকাশই থাকে না। আবার উল্টোদিকে, একেবারে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পুরুষ মহিলা দুজনেই হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটে জীবিকা নির্বাহের জন্য—অর্থের বিনিময়ে অন্যের বাড়ির কাজ, মাটি বয়ে আনার কাজ অথবা চাষ-আবাদ, ক্ষেত মজুরের কাজ, স্বাভাবিকভাবেই এই সমাজেও পারিবারিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক স্বাধীনতাও তাদেরই বেশি হয়। পেটের ক্ষুধা তো আর সমাজের রক্ত-চোষা শাসনকে বেশি মানতে পারে না। সামাজিক প্রতিষ্ঠার ধারও তারা ধারে না, মান-অপমানের তোয়াক্কাও

করে না, কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণীই সবচেয়ে বেশি শোষিত হয় এই সমাজের যাঁতাকলে। তারা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণেও আগ্রহী, সামাজিক পারিবারিক রীতি-নীতি লঙ্ঘন করবার স্পর্ধাও নেই, ন্যায়-অন্যায় বোধ, মান-অপমান বোধও আছে, একটু ভালভাবে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় জীবিকানির্বাহের তাগাদায়, একটু ভালভাবে সন্তান লালন-পালনের আশায় পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটিও চাকুরির অনুসন্ধান করে হন্যে হয়। কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাকুরি জোটে না, যাদের জোটে তাদের সনাতন প্রথায় পারিবারিক সব কিছু বজায় রেখে চাকুরিটি টিকিয়ে রাখা, সন্তান পালন, সামাজিক আচার-নিয়ম-কানুন বজায় রাখতে তাদের নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। ঘর-বাহির দুটো সামাল দিতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। এই সমাজে তো পুরুষের ঘরের কাজে সাহায্য করা বা সন্তান পালনে সমান অংশগ্রহণ করা রীতিমত লজ্জাকর ব্যাপার এবং অপমানজনকও বটে। ফলে শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক সমস্ত দিক থেকেই মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে-বৌ-এরাই সবচেয়ে বেশি শোষিত হচ্ছে। শুধুমাত্র গৃহবধূ হয়ে যারা দিনাতিপাত করছেন তারাও গৃহশান্তি বজায় রাখার জন্য ও পরিবার পরিজনদের সুখবৃদ্ধির জন্য সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছেন বিনা পারিশ্রমিকে, তাদের তো বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক কিছু থাকে না বললেই চলে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বা অধিকার প্রতিষ্ঠার তো প্রশ্নই ওঠে না। সামাজিক সংস্কার, সামাজিক অনুশাসনে তারা সম্পূর্ণ আবদ্ধ। ঘরে বসে অবসর সময়ে আপনজনদের মঙ্গল কামনায় ঈশ্বর ভজনা বা ধর্মচিন্তা।

শোষণ জর্জরিত এই সমাজব্যবস্থায় নিম্নবিত্ত শ্রেণী ও নিচুতলার মানুষ এবং নারীসমাজ হল শোষণ বঞ্চনার শিকার। তাই শোষিত জনগণের পক্ষে যাবতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামিল হয়েই খুঁজতে হবে নারীমুক্তির পথ ও সমানাধিকারের মর্যাদা। পুরুষ মহিলা উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে।

"বিবাহের ক্ষেত্রে তখনই সাধারণভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথার অবসান হবে, আর সেই উৎপাদন প্রথা থেকেই উদ্ভূত মালিকানা সম্পর্কও বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক ছোটখাট বিষয়, যেগুলি এখন বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক প্রভাব বিস্তার করে আছে। তখন বিবাহের ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রেম ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যই থাকবে না।" —এঙ্গেলস

শিশুশিক্ষা ও মধ্যবিত্ত ঘরের মায়েরা

সামন্ততান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজ কাঠামোতে নারীরা দীর্ঘকাল ধরেই শোষিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, সময়ের পরিবর্তনে শুধু তার রকমফের হয় মাত্র। বর্তমান এই সমাজ কাঠামোতে ধনী, উচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, গরীব—সকল শ্রেণীর মানুষই আছেন। স্বাভাবিকভাবেই বিত্তের পরিমাপ অনুযায়ী শিশুশিক্ষা ও সন্তান পালনের পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। অবক্ষয়িত এই সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, সামাজিক কুসংস্কারের বিষময় দিকগুলো। ধনী বা উচ্চবিত্ত ঘরের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়েরা বহু সময়ই নিজেদের আর্থিক প্রাচুর্যের মধ্যে দিয়ে শিশুকে মানুষ করেন, সেই ক্ষেত্রে নিজেদের ভাললাগা মন্দলাগা ব্যাপারটাই প্রাধান্য পায়। তারা সামাজিক কাঠামো, নাগরিকতা, দেশ ঐ সব নিয়ে মাথা ঘামানো বেশি পছন্দ করেন না আর যেটুকু করেন, সেটুকু সৌখীন বিলাসিতার মত উপভোগ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। শিশুও ঐ চিন্তাভাবনাতেই পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হতে থাকে। গরীব ঘরের মায়েরা তো তার সন্তানকে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিতে পারবে কি না সেই দুশ্চিন্তাতেই তার জীবন কেটে যায়, সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম চলে। কাজেই তারও শিশুশিক্ষার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ কোথায়? সেই অর্থে এই অবক্ষয়িত নিষ্ঠুর যাঁতাকলে মধ্যবিত্ত ঘরের মায়েরা নানা কারণেই ভুক্তভোগী অনেক বেশি, আর সব কিছুরই মূলে অর্থনৈতিক সমস্যা। কাজেই শিশু সন্তানকে প্রকৃত শিক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে লালন-পালন করতে মধ্যবিত্ত ঘরের মায়েরাই আজ সবচেয়ে বেশি হিমসিম খাচ্ছেন। সেদিক থেকে তাদের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও সতর্কতামূলক হওয়া দরকার।

মধ্যবিত্ত ঘরের মায়েদের সমাজের তাৎক্ষণিক গতি-প্রকৃতি ও আবহাওয়ার দিকে যেমন ঝুঁকে যাবার প্রবণতা থাকে, তেমনি থাকে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মায়েদের নকল করার দিকে ঝোঁক। কিন্তু আর্থিক সামর্থ্য ততটা থাকে না, তাদের রুচিবোধও আছে, শিক্ষা-দীক্ষাও আছে। তাদের কেউ কেউ চাকুরীজীবী, অধিকসংখ্যকই স্বামীর চাকুরীর ওপরে নির্ভরশীল। শিশু সন্তানটিকে ভাল খাওয়ানো, ভাল পোষাক পরানো, সমাজে মানমর্যাদা বজায় থাকে তেমন একটা

স্কুলে পড়ানো, সব কিছুরই ব্যবস্থা করতে সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় একেবারে প্রাণান্তকর অবস্থা। আবার সামাজিক ঠাটও যাতে বজায় থাকে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। নিম্নবিত্ত বা গরীব মায়েদের শিশুদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দিতে ঘোর আপত্তি। সেই অর্থে তাদের যন্ত্রণা ও দ্বন্দ্ব নানারকম—বিপরীতমুখী, ত্রিমুখী এবং চতুর্মুখীও হয়। চাকুরীজীবী মায়েদের সমস্যা আরও তীব্র। এই রকম একটি অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গী, প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করবার মত শিক্ষা ও সুস্থ চিন্তা চেতনা-সম্পন্ন মায়েরাই পারেন শিশুদের প্রকৃত শিক্ষা ও সুস্থ সংস্কৃতির পথ দেখাতে।

আজকের এই পচা-গলা ক্ষয়িষ্ণু সমাজে যুগসংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। অধিকসংখ্যক মানুষ অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। সংস্কৃতিকে কলুষিত করবার জন্য অথবা অপসংস্কৃতির জোয়ার বইয়ে দেবার জন্য একদল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চলছে। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের হুংকার, অস্ত্রের ঝনঝনানিতে শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক মানুষ আতঙ্কিত। সেখানেও মায়েদের নির্বিকার থাকলে চলে না। সেখানেও মায়েদের কাজ হচ্ছে সংগ্রামী আদর্শে অবিচল থেকে প্রতিনিয়ত শিশুটিকে ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায়বোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলায় সচেষ্ট হওয়া, যুদ্ধের বিভীষিকা সম্পর্কে শিশুটিকে অবহিত করা। মায়েরা যদি দিশেহারা হয়ে যান, আত্মসমর্পণ করেন পরিবেশ ও পরিস্থিতির কাছে শিশু তাহলে তো গড্ডালিকার প্রবাহে ভেসে যেতে পারে অনায়াসেই। শিশুটির বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুচিবোধটাও ক্রমশ নিম্নগামী হতে থাকবে, জীবনটা সুন্দর সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশ পঙ্কে নিমজ্জিত হতে থাকবে, সমাজকে আরও কলঙ্কিত করবে। কাজেই শিশুটিকে শিশুর বোধগম্য করে বোঝাবার দায়িত্ব মায়েদের থাকে। শিশু কিছু বোঝে না এটা ভাববার কোন কারণ নেই। একটি ছোট্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—একটি ছয় বছরের শিশু মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বক্তৃতা শুনে আসার পর তার দিদিমাকে প্রশ্ন করছে—"আচ্ছা দিম্মা, জ্যোতি বসু কেন বললেন কংগ্রেস দেশের সর্বনাশ করে দিচ্ছে?" এ'রকম বহু শিশুই আছে। কাজেই মায়েদের দায়িত্ব হচ্ছে যথোপযুক্ত উত্তর দিয়ে সচেতনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, শিশুর জানবার আগ্রহ যাতে ক্রমশ বাড়তে পারে সেই ভাবে সাহায্য করা।

হালে শিশুটিকে কোনরকমে একটা ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়ে ভর্তি করে

দেবার জন্য কতক মধ্যবিত্ত ঘরের মায়েদের মধ্যে রীতিমত একটা প্রতিযোগিতার পালা শুরু হয়ে যায়।—মায়েদের এই অন্ধ মোহ তো শিশুর ওপরে প্রভাব ফেলতে বাধ্য। যে শিশুটির মুখ ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিদেশী শব্দ শেখানো হতে থাকল মাতৃভাষার পরিবর্তে, সেই শিশুটিই প্রথমেই যা বুঝলো তা হচ্ছে মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা দেখানোই কৃতিত্ব। তোতাপাখির মতো তাকে বিদেশী শব্দ, বিদেশী ভাষা শেখানোর প্রাণান্ত চেষ্টা চলতে লাগলো, বিদেশী কায়দায় অভ্যস্ত হতে শেখানো হল, যার ফলশ্রুতি মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা, স্বদেশীদের প্রতি অবজ্ঞা, মাতৃভাষায় অভ্যস্ত সমবয়সী শিশুদের ঘৃণার চোখে দেখা—কাজেই এই শিশুটি বড় হয়ে সমাজকে কিছু দিতে পারবে—এটা আশা করা বৃথা। যদি অন্যরকম হয় তাহলে সেটা অসাধারণ ঘটনা। পরিণত বয়সে বিভিন্ন ভাষা শেখাও সহজ হয়, আর শেখার উপযোগিতাও তৈরী হতে পারে। কিন্তু অপরিণত বয়সে বিদেশী ভাষা ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া অবৈজ্ঞানিক এবং অস্বাস্থ্যকরও বটে। শিক্ষাগ্রহণের মূলেই ত্রুটি থেকে যায়। প্রথমে পাড়ার সমবয়সী শিশুদের থেকে পৃথক হয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়, তারপরে আত্মীয়জন-পরিবারের আর দশজনের সঙ্গেও পার্থক্য গড়ে উঠতে থাকে। বিদেশী কায়দাকানুনে অভ্যস্ত শিশুটি যত বড় হতে থাকে ততই তার আপনজনদের সঙ্গে বহু ব্যাপারেই সংঘাত সৃষ্টি হয়। মায়েরা তো অধিকাংশই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন তাই মায়েদেরও দোটানায় পড়ে গিয়ে নানারকম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। মধ্যবিত্ত ঘরের মায়েদের আর্থিক ক্ষমতাও তো সীমিত—অর্থ ব্যয় করে যে নকলের কাজেও পুরোপুরি সফল হবেন তেমন উপায়ও নেই। কিন্তু স্বপ্ন দেখছেন বিদেশী ভাষা ও বিদেশী কায়দায় শিক্ষিত হয়ে-ওঠা শিশুটি নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে বিদেশে পাড়ি জমাবে। বড় চাকুরী পাবে অথবা নিদেনপক্ষে দেশেই সামাজিক ঠাঁট নিয়ে বেশ বড় চাকুরী করবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা মিলবে;—স্বপ্ন হয়তো সার্থক হলো কিন্তু সার্থকতার সঙ্গে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার দরুণ মিলে-মিশে থাকলো না তার আপনজন, আত্মীয়জন, সংগ্রামী সচেতন দেশের মানুষ। দেশের নাগরিক হিসেবেও তার চরম ঔদাসীন্য। মাও হয়তো তখন অনন্যোপায়।

মায়েরা যদি শিশুদেরকে রূপকথার গল্প, অলৌকিক গল্প, ডিকেটটিভ গল্প বেশি না পড়তে দিয়ে মনীষীদের জীবনী, দেশপ্রেমিকদের জীবনী, দেশের জন্য সংগ্রামী মানুষের জীবনী এবং বিখ্যাত গবেষক, চিকিৎসক, লেখিকা, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক এঁদের কথা মুখে মুখে বলেন, অথবা এ ধরণের শিশুপাঠ্যগুলো পড়তে সাহায্য করেন, তাহলে শিশুটির মানসিক গঠনও অনেক ভাল হয়।

এই প্রসঙ্গে একজন সংগ্রামী মায়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি 'ভিয়েতনামের মা' কবিতা থেকে,—

"ভিয়েতনামের মা হওয়া—সে তো সহজ কথা নয়।
অন্যদেশে তোমরা যখন শিশুদের শেখাও ফুল তুলতে
আমাদের দেশে শেখাতে হয় তাদের
কেমন করে যেতে হয় ট্রেঞ্চের ভিতর।
অন্য দেশে মায়েরা যখন শিশুদের বোঝায়
কোন্‌টা পাখির ডাক
আমরা তাদের বুঝতে শেখাই
কোন্‌টা বি-৫২ এর গর্জন, আর কোন্‌টাই বা
'ফ্যানিটম' জেট বিমানের।"
"কেমন করে হবে তারা বীর বীরাঙ্গণা,
এমনি করেই শিশুদের গড়ে তোলে
আমার দেশ—ভিয়েতনামের মায়েরা।"—(হাং ডাং)

একজন সংগ্রামী, বিপ্লবী মা তার স্নেহের ধন শিশুটিকে ঘরে রেখে বৃহত্তর প্রয়োজনে কিভাবে বাইরে বেরিয়ে আসেন সংগ্রামের সাথী হয়ে তা ছন্দবদ্ধ হয়েছে 'সোনামণি' কবিতাটির মধ্যে যা শিশুমনকেও স্পর্শ করে:

"তুমি কেঁদনা মামনি আমার—সামনে যে
ভয়ঙ্কর ক্ষুধার কান্না।
তুমি আঁচল ধরে টেননা সোনা—সামনে যে
সংগ্রামের টান
তুমি অমন আধ আধ ডেকনা—সামনে যে
বিপ্লবের ডাক!
তুমি ঘুমিয়ে পড় যাদুমণি—ঘুম নেই যে
আমাদের চোখে!

(কনক মুখোপাধ্যায়)

উক্ত কবিতা থেকে শিশুটির বয়স ও বুদ্ধি যত বাড়তে থাকে পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে 'মিছিল', 'বিপ্লব', 'দেশ' এগুলোর সঙ্গেও পরিচিত হতে থাকে, মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে ক্রমশঃ, আর মানবিকতাবোধও তার মনের মধ্যে স্থায়ী ছাপ ফেলে।

মধ্যবিত্ত ঘরের সংগ্রামী সচেতন মহিলারা যদি শিশুশিক্ষা ব্যাপারটা শ্রেণীসচেতনতার মধ্যে দিয়ে দিতে পারেন তাহলে ভবিষ্যতে সে সঠিক পথ বেছে নিতে পারে সহজেই। কবি সুকান্ত শিশুমনের ভিতকেও গড়ে তুলতে চেয়েছেন শ্রেণীসচেতনতা দ্বারা। তিনি শিশুর মুখে তুলে দিলেন :

"বলতে পারো ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য
ধনীর পায়ের তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য ?"

মায়েরা যদি সমাজের এই নির্মম নিষ্ঠুর দিকগুলো মুখে মুখে শিশুকে শেখান বা শিশুদের পড়তে সাহায্য করেন তাহলে সমাজের এই বৈষম্যমূলক ভাবনা সম্পর্কে শিশু সচেতন হয়ে উঠতে পারে, সমাজের যন্ত্রণাটা কোথায়। ভবিষ্যতের সুস্থ নাগরিক তৈরি হওয়ার পক্ষে শিশু-উপযোগী এই ছড়াগুলো অমূল্য সম্পদ।

সামাজিক কুসংস্কার থেকে মায়েরা মুক্ত হতে না পারলে শিশুর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ত্রুটি থেকে যায়। যে শিশুটি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে শুনে অভ্যস্ত হয় একটা অজানা অদেখা কারণে 'ছুঁতে নেই', 'ধরতে নেই', 'ছুঁলে পাপ হয়,' 'অস্পৃশ্যতা' ইত্যাদি আরও অনেক কিছু, সেই শিশুটি স্বাভাবিকভাবেই যুক্তির বিশেষ ধার ধারে না, পাপ-পুণ্যের ওপরে নির্ভরশীল হতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়, মনোবল বলে কিছু থাকে না, একটা অজানা কিছুর কাছে আত্মসমর্পণ অথবা চরমভাবে অদৃষ্টবাদী হয়ে ওঠে। ফলে ভবিষ্যত জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপেই তাকে ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে চলতে হয়, আর যখন সেটুকুও পারে না তখন সান্ত্বনা খোঁজে 'মানুষের অসাধ্য' এই ভেবে। শিশুটিকে বুঝিয়ে তুলতে হবে আজকের যুগযন্ত্রণা কোথায়, অসমতা বা বৈষম্য কিভাবে সমাজের রন্ধ্রের মধ্যে ঢুকে রয়েছে। যে শিশুটি শুনে অভ্যস্ত হয়েছে 'ধনীর পায়ের তলায় থাকতে কেন বাধ্য ?' সেই শিশুটির মনে প্রশ্ন জাগবে, বুঝতে শিখবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নির্মম রূপ।

যে দর্শন সমাজের কুশ্রীতা, বৈষম্য, অসমতা, অন্ধত্ব, সামাজিক ব্যাধিসমূহ দূর করতে পারে, সুস্থ সুন্দর জীবনের পথ দেখাতে পারে মায়েদের কর্তব্য হল শিশুকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাগ্রহণে সাহায্য করা। মার্কসীয় দর্শন বিজ্ঞানভিত্তিক, আর এই বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শনই পারে একটি সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার পথ দেখাতে। সমস্যা জর্জরিত সামাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার দিক নির্দেশ করতে পারে। কাজেই মায়েরা যদি মার্কস-লেলিন-স্তালিনের জীবনী, কর্মকাণ্ড ও তাঁদের শৈশবকাল সম্পর্কে

শিশুর বোধগম্য করে শিশুকে বোঝাতে পারেন তাহলে শিশুটি একটা উন্নত চিন্তা ভাবনার পথ পায়।

অতীতের রূপ-রস-সুন্দর ঐতিহ্যও যাতে শিশুর দৃষ্টির বাইরে না যায় সেটাও লক্ষ্য রাখা দরকার।

মায়েদের দায়িত্ব হচ্ছে দেশ-বিদেশের খবরাদি সম্পর্কে শিশুকে অবহিত করা; সমাজতান্ত্রিক দেশের মায়েরা কিভাবে তাদের শিশুদের শিক্ষাদানের কাজ করছেন সচেতন-সংগ্রামী মায়েদের দায়িত্ব হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি রাখা। যদিও বর্তমান শোষণ জর্জরিত ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-কাঠামোতে অনেকটাই সম্ভব নয়, তবুও আজকের সমাজতান্ত্রিক দেশের মায়েরা বিপ্লবের আগে এবং বিপ্লবের পরে কি ভূমিকা পালন করেছেন শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার।

সংহতিমূলক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রেও শিশুর মানসিক গঠন যাতে সঠিকভাবে পরিপুষ্ট হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। "নানাভাষা, নানামত, নানাপরিধান" সত্বেও কিভাবে একতার সূত্রে, সংঘবদ্ধতার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সকল মানুষ মিলেমিশে পাশাপাশি বাস করতে পারে সেইভাবে শিশুকে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শিশু লালন-পালনের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ঘরের মায়েদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়, মনের ওপরও চাপ থাকে যথেষ্ট। সুতরাং মায়েরা যদি বিশেষ আদর্শে অবিচল থেকে সংগ্রামী আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে স্থির লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন এবং যাবার মত মনোবল থাকে, তাহলে শিশুও পথভ্রষ্ট হবে না, দিক বিভ্রম ঘটবে না, বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকবে না, স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারবে। সংগ্রামী আদর্শের জয় অনিবার্য। উত্তরসূরীর হাতে সেই নিশানা তুলে দেওয়াই মায়েদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মার্চ, ১৯৮৬

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নারীর ভূমিকা

ফ্যাসিস্টদের দানবীয়, বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতা যখন সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করেছিল তখন বিশ্বব্যাপী শুরু হয়েছিল ফ্যাসিবিরোধী লড়াই। জার্মানী, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লাভাকিয়া, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন এবং চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি ফ্যাসিবিরোধী ও নাৎসীবিরোধী লড়াই ও আন্দোলনে পুরুষের সঙ্গে নারী-বাহিনীরও রয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গৌরবোজ্জল ভূমিকা। সর্বশক্তি দিয়ে দীর্ঘদিন এ লড়াই চালিয়ে যাবার পর তার পরিসমাপ্তি ঘটল। ১৯৪৫-এ ফ্যাসিবাদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল।

সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধে দেশের সর্বস্তরের মানুষ পুরুষ-নারী নির্বিশেষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ফ্যাসিস্টদের আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে জীবনকে তুচ্ছ করে রুখে দাঁড়িয়েছেন নর-নারী সকলেই। তখন সোভিয়েত নারীরা যে শুধু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাই নয় তাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশে সংগঠন আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রেরণা জুগিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দিকে দিকে ফ্যাসিবিরোধী নারী আন্দোলন সংগঠিত হল, গঠিত হল বিশ্বনারী সংঘ।

১৯৪৪ সালে স্তালিন বলেছেন—"মাতৃভূমি রক্ষার কাজে সোভিয়েত নারীরা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তার মূল্যও অপরিমেয়।"

দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করার কাজে জীবনপণ লড়াইয়ে এগিয়ে এলেন লক্ষ লক্ষ মহিলা। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গেরিলাবাহিনীতে যোগ দিলেন। বন্দুক চালনা থেকে শুরু করে যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরির মালমশলা পর্যন্ত সব কাজেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা এগিয়ে এলেন। লালফৌজের সঙ্গে সঙ্গে বীরাঙ্গণারা সংগ্রামে এগিয়ে এলেন বীরত্বের সঙ্গে। সোভিয়েতের জয়া, কাসমোভিস্কায়া, ওলগা বারবোলজ, নাতাশা কভসোভা, মারিয়া পরিভানোভা, মারিয়া রাম কোভা, এলিজাবেথ সাইকিলা, ত্রিনাপোপোভা—এঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং স্মরণীয় কারণ সংগ্রামী নারীসমাজকে এঁরা প্রেরণা যুগিয়েছেন।

পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইতালি এবং অন্যত্রও যেখানেই ফ্যাসিবাদের দানবিক আক্রমণ নেমে এসেছে সেখানেই নরনারী

সকলেই তার প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছেন। মহিলারা দৃঢ় প্রত্যয়ে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। ইতালি, জার্মানি ও স্পেনে সহস্র সহস্র মহিলা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার অপরাধে কারাবরণ করেছেন। স্পেনের ফ্যাসীবিরোধী সংগ্রামে লা-পাশিওনারার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং আজও তার সংগ্রামী মানসিকতা অটুট আছে। এখনও তিনি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করছেন। বুলগেরিয়ার বীর নারী জোলা ড্রাগোয়িক হেবা ও রুমানিয়ার এ্যানা পোকারের ওপরে নেমে এসেছিল ফ্যাসিবাদের নৃশংস আক্রমণ। দীর্ঘদিন তারা কারার অন্তরালে ছিলেন, তারপরে ফ্যাসিবাদী শক্তি মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসে হাজির হয়েছিল কিন্তু নারী বাহিনীর সাংগঠনিক শক্তির কাছে পর্যুদস্ত হয়।

১৯৪১-৪৫ সালে নাৎসী হানাদারদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ নারী জীবন বিপন্ন করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দেশমাতৃকাকে উদ্ধারের সংকল্প নিয়ে। এ' প্রসঙ্গে ৪ জন দুঃসাহসিক মহিলার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—ইয়েলেনা মাঝানিক, ভেরা গোন চারোভা, বারবারা মাতিউশকো ও ভেরা ভিতুশকো।

শিশু বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন ইয়েলেনা জীবিকার দায়ে একজন নাৎসী প্রধানের অফিসে ঝাড়ুদারণী হিসেবে কাজ করতে লাগলেন। পরবর্তীকালে একজন নাৎসী প্রধান সংস্পর্শে এসে নাৎসী প্রধানের বাড়িতে কাজ জোগাড় করে—উদ্দেশ্য নাৎসী প্রধানকে হত্যা করা। ইয়েলেনা দুঃসাহসিকতার সঙ্গে হত্যা কাজটি সম্পন্ন করে বনে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁকে 'অর্ডার অব লেনিন', বীর ও সমাজতান্ত্রিক পদক ও খেতাবে ভূষিত করে।

ভেরা গোন চারোভা জীবিকায় শিক্ষিকা ছিলেন। ফ্যাসিস্ট বর্বরতার মোকাবিলা করার জন্য বিদ্রোহী দলে যোগ দিলেন। গোপনে তিনি নাৎসী বাহিনীর প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে নাগরিকদের জানাতে লাগলেন, কাগজপত্র গোপনে চালাচালি করেছেন শিশুসন্তানকে কোলে নিয়ে পর্যন্ত। একবার ফ্যাসিস্টরা তাঁর শিশুসন্তানটিকে কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। ভেরা গোন চারোভা যুদ্ধের সময় নাৎসীবাহিনীর গুপ্তচরদের নাম, ঠিকানা, সাংকেতিক নামগুলো অনেকই উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার ফলে অনেক নাৎসী ঘাঁটি ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছিল।

তিনি দেশরক্ষার মহাযুদ্ধের অর্ডার, লেনিন জয়ন্তী পদক ও প্রবীণ কর্মীদের পদকে সম্মানিত হন।

নাৎসীদের বিরুদ্ধে সংগঠন গড়ে তোলা ও সংগ্রামে টেনে আনাই ছিল বারবারা মাত্তিউশকোর কাজ। জীবন বিপন্ন করে তিনি নাৎসী বাহিনীর সদর দপ্তরে যাতায়াত করতেন। ১৯৪৩ বিয়েলো রাশিয়ার সর্বোচ্চ সোভিয়েত ডেপুটি হিসেবে রণাঙ্গনের উপর দিয়ে তিনি যখন মস্কোর সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর বিমানে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। কিন্তু তিনি অক্ষত অবস্থাতেই সভায় যোগদান করেন। ভেরা ভিতুশকো গোপন জিলা কমসোমল কমিটির সম্পাদিকা ছিলেন। কৌশলে ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে নাৎসী প্রধানের হাত থেকে আদেশ বের করে একজন বন্দীকে মুক্ত করেন। জার্মান বন্দীদশা থেকে ৩০০ ছেলেমেয়েকে মুক্ত করেছেন শ্রীমতী ভেরা। যুদ্ধ চলাকালীন তিনি নাৎসী সদর দপ্তর উড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং অনেক জার্মান সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করেছেন।

ফ্যাসিবাদের বর্বরতা, বীভৎসতার বিরুদ্ধে ক্লারা জেটকিন হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, তাকিয়ে দেখ জার্মানীর দিকে—যেখানে সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণ পরিণতি ফ্যাসিবাদ কায়েম করার মধ্যে। জেটকিন মেয়েদের উদ্দেশ্যে বললেন, "মনে রেখো ফ্যাসিবাদ তোমাদের বঞ্চিত করে সেই অধিকার থেকে—যা তোমরা অর্জন করেছ কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে—কেড়ে নেয় তোমাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার।....

৩০-এর দশক থেকে ফ্যাসিস্ট শক্তি গোটা ইউরোপ জুড়ে তাণ্ডব চালায়। হাজার হাজার নারী শিশুকে দুঃসহ বন্দীজীবন যাপন করতে বাধ্য করে, তারপরে গ্যাসচেম্বারে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। হিটলার জার্মান মেয়েদের উপর নামিয়ে আনলো এক ভয়াবহ ফর্মান, বললো—"কিণ্ডার, 'কিরচে', কুচে," মেয়েদের জীবন কাটাতে হবে শিশু, গীর্জা ও রান্নাঘর নিয়ে।"

এড্‌লফ্‌ হিটলারের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে মহিলারা সচেতনভাবে সংগঠিত হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। এমনকি কিছু সংখ্যক নাৎসী মেয়েরাও হিটলারের এই হুকুমের বিরোধিতা করলেন। নাৎসী উইমেনস্ লীগের নেত্রী আলাজ ক্লিঙ্ক ১৯৩৭ সালে পার্টি সমাবেশে ঘোষণা করেন,—"আমাদের একমাত্র অস্ত্র যদিও সুপের হাতা তাই দিয়েই আমরা অস্ত্রের কাজ করব। নারীদের স্থান গৃহে কিন্তু পুরো জার্মানীই আমাদের গৃহ...।"

স্তালিনের আবেদনে সাড়া দিয়ে সোভিয়েতের মধ্যে নারীরা ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করেন। ১৯৪১ সালে ৭ সেপ্টেম্বর মস্কোতে ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সোভিয়েত নারীদের ফ্যাসিবিরোধী সংঘ (Soviet Womens' Anti Fascist Committee) গঠিত হয়। আহ্বান জানানো হয় বিশ্বের নারীসমাজকে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সাথী হওয়ার জন্য। আবেদনে বলা হয়, "সোভিয়েতের লক্ষ লক্ষ নারীর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের রাজনৈতিক মতবাদ, জাতি, ধর্ম, সামাজিক স্তর নির্বিশেষে সকলের কাছে আমরা আবেদন করছি।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মেয়েদের নিকট দুটি পথই ছিল—হয় ফ্যাসিস্ট দানবীয় অত্যাচারের কাছে মাথা পেতে দিতে হবে, মায়ের সামনে তাঁর সন্তান হত্যা দেখতে হবে এবং গেস্টাপো বাহিনীর অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হবে নয়তো প্রতিরোধের সংগ্রামে নামতে হবে। মহিলারা সংগ্রামের পথই বেছে নিয়েছিলেন।

ফ্যাসিস্ট আক্রমণের দানবীয় মূর্তি যত ভয়ঙ্কর হতে থাকল মেয়েরা দ্বিগুণ-ভাবে শক্তি অর্জন করে সমাজ সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশে দেশে ঐক্যের সূত্রে আবদ্ধ হলেন। গঠিত হল আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী সংগঠন (Womens' International Democratic Federation)। ১৯৪৫ সালের ২৬শে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশ্বের ৪০টি দেশের ১৮১টি নারী প্রতিষ্ঠানের ৮৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বব্যাপী মোট সদস্যসংখ্যা ৮ কোটি ১০ লক্ষ নারী। যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত রাশিয়া, ইটালী, পোলাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন, আলবেনিয়া থেকেও প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। স্পেন, গ্রীস, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী থেকেও যোগদান করেছেন। মুসলিম লীগ ইজিপ্ট, আল-জিরিয়া, মরক্কো থেকেও গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের নিখিলবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে এলা রীড প্রতিনিধি হয়ে যান, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের পক্ষ থেকেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লা-পাশিওনারা স্পেনের সম্মেলনে পুরোভাগে ছিলেন। এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাদাও জোলিও কুরিও উপস্থিত ছিলেন। সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউজেন কটন। মারিয়া কুদ ভ্যালিয়া কুতুরি সাধারণ সম্পাদিকা হয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের নিনা পোপোভা ছিলেন বিশ্বনারী সংঘের অন্যতম নেত্রী।

১৯৪১ সালে রেঙ্গুনে জাপানী বোমা বর্ষণ শুরু হল। তারপরে মাদ্রাজ, সিংহল, চট্টগ্রাম ও কলকাতায়। এই আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য সর্বস্তরের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, মহিলারা সংগঠিত হলেন, আন্দোলনে নেমে পড়লেন।

বিশ্বের সমস্ত দেশে দেশে মহিলাদের সঙ্গে ফ্যাসিবিরোধী ঐক্যের সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে লা পাশিওনারা বললেন,—"…একটিমাত্র দাবি তাদের কাছে, পৃথিবীতে শান্তি ও গণতন্ত্রকে তাঁরা রক্ষা করবেন, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁরা সংগ্রাম করবেন।"

১৯৪৭ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর নোকরাশী পাশার অভ্যর্থনাকে ধিক্কার জানিয়ে ফ্যাসিবিরোধী মহিলা সংগঠন নেমে এসেছিল পথে। ফ্যাসিস্ট প্রতিষ্ঠান 'মুসলীম ভ্রাতৃলীগ' হুঙ্কার ছেড়ে বলেছিল—'মেয়েরা ঘরে ফিরে যাও'—কিন্তু কেউ সেদিন এই হুঙ্কার ধ্বনিকে পরোয়া করেনি।

হিটলারের ফ্যাসীবাদী দানবীয় পৈশাচিক বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে লেখক-কবি-ঔপন্যাসিক-শিল্পী সোচ্চার হয়েছিলেন তাদের সৃষ্ট সাহিত্য-শিল্পে ফ্যাসিবাদের নির্মম-নিষ্ঠুর-নজিরবিহীন অত্যাচার যার বিরুদ্ধে মহিলাদের বলিষ্ঠ দুঃসাহসিক ভূমিকা চিরকালের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে এবং বিশ্বের ইতিহাসে সে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। এ' প্রসঙ্গে এল. কাসমোডেমিয়ানস্কায়ার 'জয়া ও মুরার কাহিনীটি' উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে একজন মহিলা কিভাবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়েও শত্রু শক্তির কাছে মাথা নত করেননি বা পরাভব মেনে নেননি, তার চিত্র আছে। দৃঢ় প্রত্যয়ে তানিয়া (জয়া) বলেছিলেন—"তোমরা এখন আমায় ফাঁসি দেবে, কিন্তু আমি একা নই। আমরা হাজারে হাজারে লাখে লাখে আছি—আমাদের সবাইকে তো তোমরা ফাঁসি দিতে পারবে না। আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এখনো সময় আছে, আত্মসমর্পণ কর তোমরা। জয় আমাদের হবেই।"

ফ্যাসিবাদ পর্যুদস্ত হল, সমাজতন্ত্রের পতাকা উড্ডীন হল, মানবজাতির জয় ঘোষিত হল, অশুভ শক্তির পরাভব ঘটল। কিন্তু ফ্যাসিবাদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, ফ্যাসিবাদ সুযোগ-সন্ধানী, ফাঁক পেলেই তার করাল গ্রাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। তাই মহিলাদের আন্দোলন সংগঠন সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামিল হয়ে আরও মজবুত করে গড়ে তুলতে হবে। ক্লারা জেটকিনের সাবধানবাণী স্মরণযোগ্য; "ফ্যাসিবাদ আনে রক্তাক্ত অত্যাচার, ত্রাস, বুভুক্ষা ও যুদ্ধ, যতদিন না তার ধ্বংস হয় ততদিন আমাদের একজনেরও বিশ্রাম নাই।"

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি নারী দিবস প্রসঙ্গে

১৯৭৫ সালকে রাষ্ট্রসংঘ 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছে। নারীবর্ষ ঘোষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল—শান্তি, সংহতি ও সমানাধিকার। আর এই মহৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে কর্মসূচি গ্রহণ করার কথা ঘোষিত হয়েছিল তা হচ্ছে, নারীজাতির কল্যাণে যথোপযুক্ত আইন পাশ করে সমমর্যাদা ও কর্মক্ষেত্রে নারীর সুযোগ লাভের ব্যাপকতা বৃদ্ধি।

শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের সূত্রপাত হল ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ মার্চ, নিউইয়র্কের দর্জি মেয়েরা নারীর ভোটাধিকারের জন্য ঐতিহাসিক আন্দোলন শুরু করে। ১৯১০ সাল থেকেই মহান বিপ্লবী নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে ৮ মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯১৭ সালের ৯ মার্চ রাশিয়ার পেট্রোগ্রাড শহরে (বর্তমান লেনিনগ্রাড) শ্রমিক নারীরা অত্যাচারী জারের বিরুদ্ধে সভা ও মিছিল করে নারীদের দাবী-দাওয়ার আওয়াজ তোলেন। ১৯২১ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী-নারীদের সভায় লেনিন বলেছিলেন: আজ শ্রমজীবী নারী দিবসে পৃথিবীর সর্বত্র শ্রমিক মেয়েদের অসংখ্য মিটিং-এ সোভিয়েত-রাশিয়াকে অভিনন্দিত করা হবে, কারণ সোভিয়েত রাশিয়া শুরু করেছে এক অভূতপূর্ব কঠিন ও কষ্টসাধ্য কিন্তু মহান এবং প্রকৃত মুক্তির কাজ। শ্রমিক জনগণ ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে, দুনিয়ার সর্বত্রই বরফ গলছে। সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে পুরুষ ও নারী শ্রমিকের মুক্তি এগিয়ে চলেছে দুর্নিবার গতিতে। এই লক্ষ্যপথে আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ পুরুষ ও নারী শ্রমিক, পুরুষ ও নারী কৃষক। তাই দুনিয়ার ধনিকদের কবল থেকে শ্রমিকদের মুক্তি সংগ্রামের জয় অনিবার্য।"

৮ মার্চ শ্রমজীবী আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় দিন এবং বৈপ্লবিক তাৎপর্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন।

রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী আজ প্রশ্ন হচ্ছে নারীজাতির কি মুক্তি হয়েছে, সমানাধিকার কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শান্তি ও সংহতি কি রক্ষিত হয়েছে? হয়নি, হতে পারে না। সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে কখনই নারীজাতির পূর্ণ মুক্তি আসতে পারে না। সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় নারীজাতির পূর্ণ মুক্তি অথবা সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা অলীক কল্পনা।

মাত্র। কতকগুলো আইন পাশ করে নারীমুক্তি ঘটানো যায় না। এদেশেও নারীর সমানাধিকারের জন্য বহু আইন পাশ হয়েছে কিন্তু শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে নারীজাতির মুক্তি লাভ ঘটেনি। প্রতি বছর বেশ কিছু সংখ্যক মেয়ে পণ ও যৌতুক প্রথার বলি হয়। শহরে-গ্রামে-গঞ্জে বহু মেয়েকে নিরক্ষর অথবা স্বল্প শিক্ষিত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরাধীন হয়ে পরিবারে দাসীসম ব্যবহার পেয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকতে হয়।

সমাজের অর্ধেক সংখ্যক নারী। নারীজাতি যদি বঞ্চিত, শোষিত ও লাঞ্ছিত হয় তাহলে শান্তি, সম্প্রীতি, সংহতি কি করে অক্ষুণ্ণ থাকবে? সব কিছুই তো সমাজ-ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই পারে নারীজাতির মুক্তি দিতে, নারীকে পুরুষের সমান অধিকারে, সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং শান্তি ও সংহতি স্থাপন করতে। বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ নারীর পূর্ণমুক্তি ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে ক্ষেতমজুরদের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ হচ্ছেন মহিলা। কিন্তু পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে মহিলা শ্রমিকদের মজুরি কম। এই অসমতার জন্যে দায়ী 'পেশাগত বিচ্ছিন্নতা।' আর এর মূলে রয়েছে পরিপূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব। অনেক আইন বিধি তৈরি হওয়া সত্ত্বেও মেয়েরা সুযোগ থেকে বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছেন। এরও কারণ এঁদের বেশির ভাগই নিযুক্ত থাকেন ক্ষেত-খামারে, গৃহস্থালীর কাজকর্ম বা পারিবারিক কোন উদ্যোগের ক্ষেত্রে। সুদীর্ঘকাল ধরে কৃষিকাজে মেয়েদের অংশ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

নারী কৃষি-শ্রমিকরা ধানের বীজ তোলা, ধান রোয়া, আগাছা তোলা, ধান কাটা, বাঁধা, ঝাড়াই-মাড়াই ইত্যাদি কাজগুলো করেন, এদের মধ্যে বেশির ভাগ মায়েরা কোলের ছোট শিশুদের শুইয়ে রেখে কাজ করে থাকেন। তখন শিশু-সন্তানদের পাহারা দেয় ৪।৫ বছরের শিশুরা। তাদের অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু তারা ন্যায্য প্রাপ্তিতে বঞ্চিত। গ্রামে-গঞ্জে ঘরে বসে বহু মেয়ে হাঁস-মুরগী-ছাগল-শুয়োর ইত্যাদি প্রতিপালনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, সেইসঙ্গে বাধ্যতামূলক গৃহস্থালী খাটুনি, শোষণ-বঞ্চনা তো আছেই। কোন কোন মহিলা গুগলি, ছোট মাছ, শাক-পাতা বিক্রি করে খাবার সংস্থান করে। চরম দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার সঙ্গে লড়াই করে পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকতে হয়। ফলে অকাল বার্ধক্য, অপুষ্টিজনিত পঙ্গুত্ব এদের অনেকেরই অবশ্যসঙ্গী, শ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত

মূল্যপ্রাপ্তি থেকে এরা বঞ্চিত। শিশুরা রিকশাজ হচ্ছে ও অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে।

পরাধীন ভারতবর্ষে যেখানে প্রায় ৩০,০০০ নারী কর্মী কাজ করতেন, বর্তমানে সেখানে আনুমানিক ৩০০০ নারীকর্মী আছেন। চা বাগানে, কফি ও রবার বাগানে মহিলাকর্মী প্রচুর আছেন। কিন্তু সেখানে শ্রমিকদের প্রতিরক্ষা ও কল্যাণকর আইন অনুসরণের জন্য মালিকপক্ষ ক্রমশঃ মহিলাকর্মী ছাঁটাই করেছেন। কয়লাখনিতেও মহিলাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। মাটিকাটা, বাড়ি তৈরী ও নলকূপ তৈরীর কাজে যে সব মহিলারা কাজ করেন, সুরকি ভাঙেন ও আরও নানাবিধ হাড়ভাঙা খাটুনি খাটেন উদয়াস্ত, জীবনের শেষভাগে শরীরের শক্তি কমে আসবার পর তাদের তো জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কি আছে? পরিশ্রমের বিনিময়েও উপযুক্ত মূল্য পেল না, আর যখন, পরিশ্রম করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন তখন অনাহার হল জীবনের সম্বল। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ' ঘোষণার পরেই দেখা গেল রিজ হোটেলের ৩২ জন মহিলা কর্মী ছাঁটাই হলেন মালিকপক্ষের খেয়াল খুশিমত।

'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ' ঘোষণা হওয়ার এক দশক অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরেও এই সমাজ-কাঠামোর চিরাচরিত প্রথানুযায়ী শ্রমজীবী মেয়ে, ক্ষেত-মজুর মেয়ে এবং সর্বস্তরের খেটে-খাওয়া মেয়েদের ওপর অত্যাচার চলে নির্বিচারে। মজুরি বণ্টনে অসমতা রয়েছে। এই সমাজে নারীদের মত প্রকাশের, ব্যক্তিত্ব প্রকাশের স্বাধীনতা নেই, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, রান্নাঘরের চার দেওয়ালের ভেতরে উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন, চাকুরিজীবী মহিলাদের খাটুনি আরও বাড়ে।

এই বৎসরের আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নারী দশকের শেষ বৎসর হল চলতি বৎসর—১৯৮৫ সাল। দ্বিতীয়ত সারা বিশ্বব্যাপী ফ্যাসীবাদের পরাজয়ের ৪০তম বর্ষ এই বৎসরে উদযাপিত হচ্ছে। পটভূমিকায় সংগ্রামী নারী সমাজের নারী দিবস পালনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নারীর সমানাধিকার অর্জন, জাতীয় সংহতি ও বিশ্বশান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমস্ত সংগ্রামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে গণ আন্দোলন সংগঠিত করা, বিশেষত বন্ধ কলকারখানা খোলার দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করা। গ্রাম বাংলার বৃহৎ সংখ্যক নিরক্ষর শ্রমিক কৃষিজীবী মহিলাদের মধ্যে আন্দোলনের প্রসার ঘটানো দরকার। সরকারি বেসরকারি কর্মী মহিলাদেরও একত্রিত হতে হবে।

শোষণ মুক্তির সংগ্রামে সর্বস্তরের মহিলাদের সংগঠিত করতে হবে। শোষণ-মুক্তির সংগ্রামই বিশ্বশান্তির সংগ্রামকে, নারী মুক্তির সংগ্রামকে মজবুত করে তুলতে পারে।

মহিলা সংগঠনগুলোকে উপলব্ধি করতে হবে যে, সমানাধিকার ও শোষণ মুক্তির জন্য ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবী মহিলাদের সংগঠিত সংগ্রাম ও আন্দোলন অপরিহার্য এবং সামাজিক সংস্কার ও বিধিনিয়মের বিরুদ্ধে মানসিকতা গঠনই নারী মুক্তির প্রাথমিক ধাপ।

রাশিয়ায় বিপ্লবের পরেই শ্রমজীবী নারীদের শুধু অধিকার দিলেই চলবে না, তার যথোপযুক্ত ব্যবহারের কথা ভেবে স্তালিন বলেছিলেন: "আজ যখন শ্রমিক কৃষকদের হাতে ক্ষমতা চলে এসেছে, তখন শ্রমজীবী নারীদের রাজনৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।" (স্তালিন: নভেম্বর ১৯২৩: শ্রমজীবী ও কৃষক মহিলাদের সম্মেলনের ৫ম বার্ষিকী অনুষ্ঠান)

সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই নারীর পূর্ণমুক্তি ঘটতে পারে, আর সেই জন্যই প্রয়োজন সংগ্রামী পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত ও সংগঠিত গণ আন্দোলন। দেশের কঠিন পরিস্থিতিতেও বৈপ্লবিক চিন্তায় ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী সংগ্রামী নারী সমাজজীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। শ্রমজীবী নারী দিবস দীর্ঘজীবী হউক।

"সেদিন সুদূর নয়
যে দিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়।"

জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-চক্রান্তের বিরুদ্ধে নারী সমাজ

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-চক্রান্ত আজ বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের মনে এক ভয়াবহ আতঙ্কের বীজ ছড়িয়েছে—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হুঙ্কার ছাড়ছে এক মিনিটের মধ্যে জীবনস্পন্দন স্তব্ধ করে দেবার, অস্ত্র প্রতিযোগিতায় এক ধরনের উন্মাদনা চালাচ্ছে বেপরোয়াভাবে, জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে দেবার উদ্ভট ভয়াবহ উল্লাস পেয়ে বসেছে, বহুকালের গড়ে-ওঠা মানবসভ্যতাকে ভেঙে চুরমার করে দেবার মত হিংস্র মানসিকতার ভয়ালরূপ বিশ্ববাসীকে গ্রাস করে ফেলতে চাইছে, আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই যেন আজ আতঙ্কিত—বিশ্বের সমগ্র শান্তিপ্রিয় মানুষ মুক্তি-পথের সন্ধানে ব্যস্ত। তাই লক্ষ লক্ষ নরনারী-শিশু নেমে এসেছেন পথে-প্রান্তরে, রাজপথে, অলিতে-গলিতে—দৃপ্ত প্রতিবাদে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, সমস্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়ে উঠেছেন, 'যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই', যেন দৃপ্তভঙ্গিমায় বজ্রকঠিন স্বরে বলতে চাইছেন—'আজ আগিয়ে যাওয়ার দিন সাথী আজ আগিয়ে যাওয়ার দিন।' একদিকে যখন সাম্রাজ্যলোলুপ শাসকচক্র ধ্বংসের দামামা বাজিয়ে চলেছে, অপরদিকে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষ যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে লড়াইয়ের ময়দানে মিলিত হয়েছেন, আকাশে ওড়ানো হচ্ছে শান্তির দূত পায়রা, ছোট ছোট শিশুরা বেলুন ওড়াচ্ছে আকাশে-বাতাসে।

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে জীবনযুদ্ধের প্রতিটি স্তরে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে, শক্তিশালী গোষ্ঠীর আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে বহু সময়েই প্রত্যক্ষভাবে সম্ভব না হলেও পরোক্ষভাবে নারীজাতির দুঃসাহসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সন্ন্যাসীবিদ্রোহ, পলাশীর গণবিদ্রোহ, ঢাকায় কুঠী আক্রমণ, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়ার কৃষক সংগ্রাম, কোচবিহারের যুদ্ধ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন—সমস্ত রকম বীরত্বপূর্ণ ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে বীর নারীদের কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয়। সামাজিক বন্ধন, দাসত্ব, সংস্কার প্রায় সব সময়ই মেয়েদের

সক্রিয় অংশগ্রহণে অন্তরায় হয়েছে কিন্তু পর্দার আড়ালে থেকেও মেয়েরা অনেক দুঃসাহসিক দায়িত্ব পালন করেছে।

১৯১৭ সালের ৮ মার্চ মহিলা শ্রমিক জারবিরোধী সভা-মিছিলে যোগদান করেছে। ১৯৩৬ সালে স্পেনে লা পাশিওনারার নেতৃত্বে ৮০ হাজার মহিলার ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর বিরোধী সভা-মিছিল শহরকে কাঁপিয়ে তুলেছে। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর বিপ্লব দিবসে স্পেনের গৃহযুদ্ধের একটি অবিস্মরণীয় দিনের চিত্র পাওয়া যায় লা পাশিওনারার আত্মজীবনী থেকে। এক জায়গায় আছে, "মেয়েরা পুরুষদের বলছে—'ওরা এসে পড়ল, আমরা অপেক্ষা করছি কেন?'"

আরেক জায়গায় আছে,—"অদম্য আবেগে উচ্ছ্বসিত মাদ্রিদের নরনারী সাশ্রুনয়নে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের যোদ্ধাদের জড়িয়ে ধরল।" ১৯৫০ সালের ৮ মার্চ ৩ লক্ষ নারী পুনরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে চ্যান্সেলার আদিনুরের শাস্তি দাবি করেন।

ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার-এর মত বহু বীর নারীর জীবন বিসর্জিত হয়েছে যাঁদের নাম হয়তো আজ আর ইতিহাসের পাতাতেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। জন্মগতসূত্রে বিদেশিনী হয়েও ভগিনী নিবেদিতা ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভারতবাসীর মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন শুধু নয় পরোক্ষভাবে তাঁর ক্ষমতানুযায়ী ও সাধ্যানুযায়ী মদত যুগিয়েছেন, কখনও কখনও রীতিমত দুঃসাহসিক ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। একদা যুগান্তর পত্রিকার অফিসে বসে থাকাকালীন একজন জাতীয়তাবাদীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন,—"দেশের ক্লীবত্ব ঘুচাবার জন্য হিংসা আর বিপ্লবকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করাই এখন কর্তব্য। আয়র্ল্যাণ্ড তাই করেছিল।"

২৪ বৎসর একটানা রাজনৈতিক বন্দীজীবন যাপন করে বীরাঙ্গনা লোলিতা লেব্রন (Lolita Labron)। বার্ণাডো অহিমিনস এবং স্যালভেডোর এলেন্দির দেশে রাজনৈতিক বন্দীদের শতকরা ২০ জন মহিলা, প্যারাগুয়ের অত্যাচারী আলফ্রেড স্ট্রোয়েসনার রাজত্বে প্রচুর সংখ্যক মহিলা রাজবন্দী। তাদের কেউ কেউ শিশুসন্তানসহ বন্দীজীবন যাপন করেছেন। দক্ষিণ লাটিন আমেরিকায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সচেতন সংগঠিত মহিলা সমাজ পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন।

১৯৪১-৪২ সালে ফরাসী ও জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের মহিলা গেরিলাবাহিনী দুঃসাহসিক রণকৌশলের নজির রেখেছে। ভিয়েতনামে শ্রমিক-কৃষক মেয়েরা বিপ্লবের কাজে অংশ গ্রহণ করেছে।

১৯৪৫-এ আগস্ট বিপ্লবের পর জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল ভিয়েতনামে। শুরু থেকেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আলোকেই জেনেছিল নারী জাতির মধ্যে সংগ্রামী চেতনা জাগিয়ে তুলতে পারলে মুক্তি সংগ্রামের পথ সহজ হবে। ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম যে মেয়েটি জীবন সঁপে দিয়েছিল তার নাম হচ্ছে নগুয়েন থি মিন খাই।

হো চি মিনের আহ্বানে নর-নারী সকলে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছে, ১৯৪৮ সালে ভিয়েৎনাম মহিলা সমিতি সগর্বে ঘোষণা করেছে: "ফরাসী উপনিবেশবাদীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য সমগ্র জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করার মধ্যে দিয়েই ভিয়েতনামের নারীরা জাতীয় স্বাধীনতা ও তাদের নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সুরক্ষিত করতে এবং নাগরিক হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, মাতা হিসেবে তাদের কর্তব্য সুসম্পন্ন করার জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।" সংগ্রাম চলাকালীন মেয়েরা উৎপাদনের কাজে, জমি চাষ করে ফসল তোলার কাজে বিরাট দায়িত্ব পালন করেছে। শত্রু অধিকৃত অঞ্চল থেকে ফসল কেটে এনেছে, শত্রুর বুলেট উপেক্ষা করে তাদের নানাভাবে হেনস্থা করে।

হাং ডাং-এর লেখা 'ভিয়েতনামের মা' কবিতাটি থেকে ভিয়েতনামের নারীরা তাদের দেশকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য শিশুসন্তানদেরও কিভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকেন—সেটা অনুধাবন করে আশ্চর্য হতে হয়। কবি হাং ডাং বলছেন:

"ভিয়েতনামের মা হওয়া—
সে তো সহজ কথা নয়।
অন্য দেশে তোমরা যখন শিশুদের
শেখাও ফুল তুলতে
আমাদের দেশে শেখাতে হয় তাদের
কেমন করে যেতে হয় ট্রেঞ্চের ভেতর।
অন্য দেশে মায়েরা যখন শিশুদের বোঝায়
কোন্‌টা পাখির ডাক
আমরা তাদের বুঝতে শেখাই
কোন্‌টা বি-৫২ এর গর্জন, আর কোনটাই বা
'ফ্যানটম' জেট বিমানের
... ...।"

(অনুবাদ: কনক মুখোপাধ্যায়)

ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধার ডেপুটি কম্যাণ্ডার মাদাম থী দিন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাদাম নগুয়েন থি বিন-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭২ সালের ২রা অক্টোবর কোলকাতায় সংবর্ধিত ভিয়েতনামের প্রতিনিধি লেমিন তাঁর ভাষণে বলেছেন,—"অনেক জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের ইউনিটের মধ্যে শতকরা ৬০ জনই নারী; দক্ষিণ ভিয়েতনামের গ্রাম্য কমিটিগুলির মধ্যে ৮০ জন চেয়ারম্যান নারী এবং সম্পাদক হলেন ৪ জন। মার্কিনীরা ভিয়েতনামের নারীদের উপর বর্বর অত্যাচার করছে, নারী ও শিশুদের হত্যা করছে, আর তার ফলে আরও বেশী বেশী সংখ্যক নারী সংগ্রামের মধ্যে এগিয়ে আসছেন···।"

ভিয়েতনামের যুদ্ধে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছে, যোদ্ধাদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করেছে মেয়েরা। ভিয়েতনামের যুদ্ধের একটি কাহিনী লিখছেন শ্রীমতী কাম হাই। তিনি এক জায়গায় লিখছেন,—"এটা (বোমা) তাদেরকে (শত্রুপক্ষকে) ভয় দেখাবার জন্য ছোঁড়া হয়েছিল, যদি তাদের মধ্যে কেহ সাহস করে নিকটে আসে আমি তার শিরে আমার বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত করবো, তারা বুঝতে পারবে কি মেয়ে তৈরি করেছে মহিমান্বিত বিপ্লব।" ভিয়েতনামের আর একজন বিপ্লবী মহিলা বলছেন—"আমি কিছু মনে করব না যদি আমাদের সহযাত্রী গ্রামবাসীরা আমাকে ছেড়ে চলে না যান। আপনারা একটি শত্রুবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে এগিয়ে এসেছিলেন, এমতাবস্থায় আমি কেন আপনাদের সাহায্যে হস্ত প্রসারিত করব না?" ভিয়েতনামের বিপ্লবী মহিলারা তাঁদের শিশু সন্তানদেরকে শত্রুদের বিমান-বিধ্বস্ত করার কৌশলটাই খেলার মাধ্যমে শিখিয়ে দিতেন। বন্দিনী নারীযোদ্ধা নগুয়েন থি মিন থাই কারার দেওয়ালে রক্তের অক্ষরে লিখেছেন,—

"তরবারি আমার সন্তান—
বন্দুক আমার স্বামী।"

ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে নারীসমাজের বিপ্লবী ভূমিকা অবিস্মরণীয়, শুধু তাই নয়, নারীসমাজের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া যে কোন বিপ্লবই সার্থক হতে পারে না এটা তার জাজ্বল্য প্রমাণ।

মুক্তিযুদ্ধের জন্য মহিলা সমিতি গঠিত হল—নারীবাহিনী শ্রমিক-কৃষক ও সমস্ত গণসংগঠনগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে নেমে পড়লো পিতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য। গঠিত হল বিপ্লবী নারীবাহিনী—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামী নারীসমাজ যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য,

ঘরের মায়া সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মুক্তি-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো—বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন মহীয়ান দিক সংযোজিত হল—যা যুগ যুগ ব্যাপী সমগ্র বিশ্ব জুড়ে সমস্ত শোষিত-নিপীড়িত জনগণ, নারীসমাজ, পরাধীন দেশের জনগণের নিকট একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, সমগ্র নারীসমাজের গর্বের বস্তু, দেশকে প্রকৃত অর্থে শৃঙ্খলমুক্ত করার উপায় নির্দেশিত হল।

১৯৫২ সালে উত্তর ভিয়েতনামের গেরিলা-বাহিনীতে মেয়েদের সংখ্যা ছিল ৮,৪০,০০০ আর দক্ষিণ ভিয়েতনামে মেয়েদের সংখ্যা ছিল ১,৪০,০০০, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন কৃষক মেয়ে লেফটেনেন্ট নগুয়েন থি বিয়েন। মাত্র ২০ বছরের মেয়ে ফরাসী ক্যাপ্টেনকে বন্দী করে। বয়স্কা মহিলারা যুদ্ধরত ছেলেমেয়েদের খাবার সরবরাহ করেছেন, তাদের সন্তানদের লালন-পালন করেছেন।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বর্বর অত্যাচার চলতে থাকলে নারীসমাজ ঘোষণা করেছে,—"দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তির জন্য মহিলা সমিতি।" ১৯৬০ সালের ১৭ ডিসেম্বর বিক্ষোভ মিছিলে ১৬ বছরের তরুণী ক্রয়ভ থাই বে-কে গুলি করে হত্যা করে, তারপর ১৮ বছরের তরুণী নগুৎে থি বীও একইভাবে আক্রমণে আহত হল কিন্তু মিছিল থেমে থাকেনি—এগিয়ে চলেছে। মুক্তিফৌজের সংগ্রামে মেয়েরা অংশগ্রহণ করেছে এবং সামরিক যোগ্যতার জন্য তা থী কিউ বীরাঙ্গনার সম্মান পেয়েছেন। হো চি মিন বলেছেন,—"উত্তরে ও দক্ষিণে আমাদের মায়েদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ—কারণ তারা বংশপরম্পরায় আমাদের দেশে বহু বীরের জন্ম দিয়েছেন ও তাদের লালন-পালন করেছেন।" ভিয়েতনামের নারীসমাজ প্রেরণা যোগায় বাঙালী নারীদেরকেও। তরুণী মন্দিরা ঘোষাল বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বলে,—

'তখন বাংলার মেয়ে আমি
ঐ পঞ্চদশী ভিয়েতনামী কিশোরী
হওয়ার স্বপ্ন দেখি।'

এবং বাঙালী মহিলা কবি ইরা সরকার বললেন,—

"ভিয়েতনাম
যুদ্ধ আমার ভেতরে
যুদ্ধ আমার বাইরে
আমিও করছি যুদ্ধ

শত্রুর মোকাবিলা করতে
বাবুদের পোড়া দাগ ভুলতে
যুদ্ধেই হব বুদ্ধ
ভেতর বাইরে যুদ্ধ আমার।”

মার্কিন আক্রমণের মোকাবিলায় দক্ষিণ ভিয়েতনামের নারীদের বৈশিষ্ট্য হল বীরত্ব, নির্ভীকতা, বিশ্বস্ততা ও দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা। ১৯৬৬ সালের রাজনৈতিক সংগ্রামে ১২ কোটি নারী যোগদান করেছে। সাউথ ভিয়েতনাম উইমেন ফেস টু ফেস উইথ ইউ. এস. এ্যাগ্রেশন (South Vietnam Women face to face with U. S. Aggression) পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে, একটি মেয়ে তিনটি নারীর একটি দলকে নেতৃত্ব দিয়ে সারাদিন একটি মার্কিন সৈন্যদলকে যুদ্ধে নিযুক্ত রেখেছিল। একজন মহিলা সব থেকে নিষ্ঠুর একশত পুলিশকে সায়গনের বুকের ওপর নিশ্চিহ্ন করেছিল। ৬টি সন্তানের জননী নগুয়েন থি উটকে এবং টা থি কিউকে মুক্তিযোদ্ধার সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে। মেয়েরা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ২ কোটি হেক্টেয়ার জমি চাষ করে খাদ্য সরবরাহ করেছে।

১৯৪৫ সালে “এ্যাটম বোমা বে-আইনী কর”—এই আবেদনে বিশ্ব নারী সংঘের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ইতালীর নারীরা ৩০ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। ইরানের নারীরা স্টকহোম আবেদনে ৫ লক্ষ ও পঞ্চশক্তি শান্তি-চুক্তিতে ২০ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। ভারতসহ বিশ্বের দেশে দেশে যুদ্ধবিরোধী শান্তি আন্দোলনে বিশ্ব নারী-সংঘের উদ্যোগে নারীরা এগিয়ে আসেন। এইভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তির জন্য বিশ্ব নারীসংঘ বহুমুখী কাজ করে। ১৯৪৯ সালে পিকিং সহরে সারা এশিয়ার নারীদের একটি সম্মেলন হয় এবং এখানে এশিয়ার নারীরা শান্তি রক্ষার আন্দোলন করবার সংকল্প গ্রহণ করেন।

শ্রীমতী মঞ্জরী গুপ্তের লেখা ‘সোভিয়েত রাশিয়ায় দশ দিন’ প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, সোভিয়েত উইমেন্স কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীমতী ভ্যালেনটিনা ফেডেলোভা যে প্রতিবেদন পেশ করেন, তাতে উল্লিখিত আছে,—“ফ্যাসিস্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হবার মূল্য আমাদের দিতে হয়েছে ২০ মিলিয়ন নর-নারীর প্রাণের বিনিময়ে। ১,৭১০টি শহর আর ৭০,০০০ গ্রামের চিহ্ন তারা মুছে ফেলেছে। এখানে পুরুষের সাথে নারীরাও যুদ্ধের দায় সমানে বহন করেছে। ১,৭৪৫,০০০ অর্ডার মেডেলে সম্মানিত হয়েছেন. ৯১ জন বীর

নারীর সম্মান পেয়েছেন। ফ্যাসিস্টবিরোধী নারী সমিতি দুনিয়ার নারী সমাজের কাছে যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য কাজ করতে আবেদন জানিয়েছে।"

সোভিয়েত নারী সমাজ শান্তির সপক্ষে তাদের করণীয় কর্তব্য স্মরণ করে চলে, শ্রীমতী ভ্যালেনটিনা ১৯৮২ সালে নিরস্ত্রীকরণের জন্য যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাতে প্রতিনিধিত্ব করেন।

গণতান্ত্রিক চীনের অবৈতনিক চেয়ারম্যান, উইমেন্স ফেডারেশন অব চায়নার আজীবন অবৈতনিক চেয়ারম্যান ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যা মাদাম সুঙ চিঙ লিঙ-এর নামও উল্লেখ করা যেতে পারে যিনি চীনের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন, চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

এল সালভাদোর ও তুরস্কে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ্য প্ররোচনা এবং সবরকম মদতে পুষ্ট হয়ে দুটি দেশের সামরিক জুন্টা সরকার দেশের মুক্তিকামী মানুষের উপর যে গণহত্যা চালিয়েছে তার বলি হয়েছে এক বছরে ১৫ হাজার মানুষ, ১ লক্ষ মানুষ বিনা বিচারে বন্দী হয়েছে—হাজার হাজার মানুষকে ফাঁসি-কাঠে ঝোলানো হয়েছে, নারীসমাজও এই জঘন্য হত্যালীলার হাত থেকে বাদ পড়েনি, আর প্রতিবাদী ভূমিকাতেও মেয়েদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

ওয়াশিংটন, টোকিও, জাপান ও উন্নয়নশীল দেশের জনগণ আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশে যোগদান করছেন, নারী-সমাজও সেখানে সমানভাবে অংশগ্রহণ করছেন। পশ্চিমী দুনিয়া সহ সর্বত্রই আজ নারীসমাজ যুদ্ধবিরোধী ভূমিকায় উত্তাল। মস্কোতে যে যুদ্ধবিরোধী সমাবেশ হয় সেখানে হাজার হাজার মহিলা শান্তির সপক্ষে সোচ্চার হয়েছেন। বর্তমানে বিশ্বশান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য নারীসমাজ ও শিশুরা আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে, '৮২ সালে লণ্ডনে যে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে যে বিশাল সমাবেশ হয়েছে লক্ষ লক্ষ মহিলারা শিশুসহ সেই মিছিলে-সমাবেশে যোগ দিয়েছেন। হাইড পার্ক থেকে যে বিশাল মিছিল প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের বাসভবনের সামনে যায়, সেই মিছিলের সামনের সারিতে কালো পোশাকধারী মহিলারা রয়েছেন হিরোসিমা ও নাগাসাকির প্রতীক হিসেবে, সামনে বাচ্চাদের দুটি খালি গাড়ি—তার গায়ে লেখা ছিল,—"হিরোসিমা আর নাগাসাকিতে আণবিক বোমায় যে অসংখ্য শিশু মারা গিয়েছিল তাদের স্মৃতি বহন করছে এই গাড়ি দুটি।" সোভিয়েত রাশিয়ায় যে নিরস্ত্রীকরণ সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়েছে

তার সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার ছিল শান্তির রেলগাড়ি, গাড়ির সামনের কামরাগুলোতে নারী ও শিশু ও শ্রমজীবী মানুষ। ফ্রাঙ্কফুর্টে '৮২ সালে ৮ ও ১০ সেপ্টেম্বর আই. জি. মেটাল ইউনিয়নের নারী সম্মেলনে ৩ লক্ষ ১০ হাজার নারী সভ্যার ২১৬ জন প্রতিনিধি শান্তির সপক্ষে প্রচারাভিযানে ৩০ লক্ষাধিক সই সংগ্রহ করেন। ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, গ্রীণল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড এবং পশ্চিম জার্মানীর ৫ লক্ষ নারীর সই জাতিসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদকের কাছে যুক্ত আবেদন জানিয়েছেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি গ্রীণহ্যামে মার্কিন যুদ্ধ ঘাঁটি ঘিরে নয় মাইল দীর্ঘ মানব-শৃঙ্খল তৈরি করা হয়েছে, হাজার হাজার মেয়েরা সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সেখানে প্রতিবাদ জানায়। বিশ্ব নারীসংঘের পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদিকা তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন,—"এই সুন্দর পৃথিবীকে ধ্বংস করতে আমরা কিছুতেই দেব না। নারীগণ জীবন সৃষ্টি করেন—তাঁরা জীবন রক্ষা করতেও জানেন। মানুষ অস্ত্র সৃষ্টি করেছে মানুষকে রক্ষা করার জন্য, ঐ অস্ত্র মানুষকেই ধ্বংস করতে হবে।" বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম উপলক্ষে মুক্তিসংগ্রামীদের উদ্দেশে মহিলা নেত্রী পঙ্কজ আচার্য লিখেছেন,—"বিশ্বের স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী জনগণের সঙ্গে ভারতের জনগণ এই ঘৃণ্য বিচার প্রহসনের তীব্র প্রতিবাদ করছে।" সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ সরকারের নেতৃত্বে অত্যাচার ও হত্যালীলার যে উন্মাদনা চলছে দীর্ঘদিন ধরে তারই প্রতিবাদে বনানী বিশ্বাস লিখলেন,—"শহীদদের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। এই সংগ্রামে তারা জয়লাভ করবেই—এই আত্মত্যাগ কখনও ব্যর্থ হবার নয়।" আসাম থেকে শ্রীমতী চেনীমাই শইকিয়া তাঁর ছন্দবদ্ধ কথায় বললেন,—

"আমি দগ্ধ করব তাদের সমস্ত চক্রান্ত
ঘরে ঘরে পৌছে দেব মহাশান্তির পতাকা
সর্বহারার আদর্শ।"

শ্রীমতী সুনীতা দাসের লেখনী কবিতার ছন্দে ঝলসে উঠল :

"প্রতিঘাত আনার জন্য
একমাত্র হাতিয়ার সত্য।
যুদ্ধ নয় শান্তি চাই!
স্বপ্নের প্রাসাদ গড়ে তোল
মুক্তিকামী আমার ভাইয়েরা।"

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে শ্রীমতী মাধুরী দাশগুপ্তের লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এবং শ্রীমতী কমল সেনগুপ্তের শান্তির সপক্ষে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ দুটি অত্যন্ত মূল্যবান শুধু নয় সমগ্র নারীসমাজকে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে সহায়কও বটে।

শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত তাঁর কবিতায় বললেন,—

"আণবিক মারণাস্ত্র-পরীক্ষা
নিয়মের গতিপথে আনে বিশৃঙ্খলা!
বিষাক্ত দেয়াল কর চূর্ণ,
পাশবিকতার দম্ভকে কর স্তব্ধ।"

১৯৮২ সালের ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক মহিলা সংগঠন যুদ্ধবিরোধী দিবস হিসেবে পালন করেছে। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির আহ্বানে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ও অন্যান্য মহিলা সংগঠন যৌথভাবে যুদ্ধবিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায় বললেন,—"এই পরিস্থিতিতে ভারতের সমস্ত যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী জনগণের সঙ্গে গণতান্ত্রিক নারীসমাজও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে এগিয়ে আসবে।" শ্রীমতী কৃষ্ণকলি ভট্টাচার্যের কণ্ঠে শোনা গেল,—

"………সাম্রাজ্যবাদ
বারবার মাথা হেঁট করে
ঘরে ফিরে যায়।"

১৯৮২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে ৫ লক্ষ মানুষের যে মহামিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে গণ-অ্যাসোসিয়েশন, মহিলা আইনজীবী সম্প্রদায়, মহিলাশিক্ষিকা-অধ্যাপিকা, ছাত্রী, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, মহিলা ডাক্তার, নার্স, শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-সংস্কৃতি কর্মী, মহিলা সরকারি কর্মচারী এবং বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের মহিলা কর্মী হাজারে হাজারে যোগদান করেছেন। দিল্লীতে নারী শান্তিকামীদের সমাবেশ ও বিক্ষোভ উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী উৎপলা গোস্বামীর কণ্ঠে শোনা যায়,—

"আর নয়—আর নয়
ওদের শক্তি, ভ্রুকুটিকে
আমরা করি না ভয়
করি না ভয়।
রুখবো ওদের ধ্বংসের লীলা
আমাদের লক্ষ্য স্থির।"

'৮২ সালের অগাষ্ট মাসে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি সাম্রাজ্যবাদ সপ্তাহের প্রথম দিনে কলকাতার মার্কিন প্রচার দপ্তরের অভিমুখে দৃপ্ত মিছিলে হাজার হাজার মহিলা যোগদান করেছেন, সমবেতস্বরে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলেছেন, "ইসরাইল লেবানন থেকে হাত ওঠাও।"

যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে সম্প্রতি যে শান্তি মিছিল সেটি স্টকহোম, মিনস্ক, মস্কো, কিয়েভ, উজগোরদ, ব্রাতিস্লাভা, বুদাপেস্ট, ভিয়েনারের পথে পথে চলেছে, তাতে শতকরা ৭০ ভাগ নারী অংশগ্রহণ করেছেন। মহিলারা বজ্রকণ্ঠে দাবি জানান পারমাণবিক অস্ত্র বন্ধ করতে হবে এবং নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির দাবি জানান।

শত্রুকে চিনে নেবার ক্ষমতা অর্জনে, সামাজিক অগ্রগতির কথা চিন্তা করে শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত নারীসমাজের ভূমিকা এবং শান্তির সপক্ষে ও জাতীয় মুক্তির প্রয়োজনে ইতিবাচক দিকগুলো স্মরণে রাখার মত শুধু নয় চিরকালের নারীসমাজের নিকট প্রেরণাদায়কও বটে।

পণপ্রথা

যুগ যুগ ধরে নারীজাতি সমাজের নিকট, পরিবারের নিকট, আপজনের নিকট তার নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে আসছে বিভিন্ন ভাবে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় এটাই একটা স্বাভাবিক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, নারী পায়নি শিক্ষার আলো অর্থাৎ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেনি,—যার ফলে সমাজচেতনতাবোধ জাগেনি, সেখানে যে নারীর ভাগ্যাকাশ কালো মেঘে ঘনীভূত হতে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? অন্যদিকে বলা চলে সামন্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অধিকাংশ পুরুষই চায় নারীকে বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ব'লে প্রতিষ্ঠিত করতে, কেউ বা দাসী বা ভোগ্যপণ্য হিসেবে, কেউ আবার দেবী হিসেবে ;—উদ্দেশ্য উভয় গোষ্ঠীরই এক— নারীকে হেয় করা,-নারীর কোন কিছুতে অধিকার নেই সেটা প্রতিপন্ন করা। যে দেশের সমাজ-কাঠামোতে নারীকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে ভগবানের অভিশাপ অথবা সৃষ্টির দায়ভার হিসেবে, সেখানে নারীকে শোষণ ও ভোগ্যপণ্যের বলি হ'তে হবে স্বাভাবিক-ভাবেই, এবং হচ্ছেও তাই।

নগর-শহর গ্রাম ও সকল ধর্মাবলম্বীদের দৃষ্টিকোণেই নারী পুরুষের তুলনায় কম বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন আর এই প্রথার শেকড় এত গভীরে যে সমাজে পণপ্রথার প্রবেশ অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক গতিতেই,—শুধুমাত্র প্রয়োজনানুযায়ী কৌশল অবলম্বন করা হয় ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে। অথচ আউগুস্ট বেবেল তাঁর 'নারী : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে'-এর পর্যালোচনায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন, নারী পুরুষের তুলনায় মোটেই কম বুদ্ধিসম্পন্ন নয়, আর তা' যদি নাই হয় তাহলে নারীকে সমাজের সুখ-সুবিধা-অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখার কি যুক্তি থাকতে পারে? তাছাড়া আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসা বিদ্যা, সংস্কৃতি চর্চা, জেলা শাসকের ভূমিকা, সমাজ জীবন ও প্রশাসন ব্যবস্থা সর্ব বিষয়েই বহুল সংখ্যক মহিলা প্রতিযোগিতামূলক ভূমিকাতেও পারদর্শিতার ও দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন এবং বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

পণ বা যৌতুকের মাপকাঠিতে যদি বিবাহ ব্যাপারটি সম্পন্ন হয় ও কন্যার

পিতা-মাতা দায়ভার মুক্ত হন তা'হলে দাম্পত্যজীবনে ফাটল দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ পুরুষ মনে করে তার বাজার দর আছেই, কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতা কেন কন্যাকে তার ঘাড়ে সারাজীবনের মত চাপাবার আগে দাবি না মিটিয়ে চাপাবেন কেন ? আজকের একটি পুঁথিগত বিদ্যা মুখস্থ-করা একটি শিক্ষিত ছেলেকে মন্তব্য করতে শোনা যায়,—"সুন্দরী মেয়ে না হ'লে তো বিয়েই করব না,—আর নগদে এবং যৌতুকে মিলিয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা না পেলে পরিবারে আমার সম্মান থাকবে না। তাছাড়া সারাজীবন আমাকে ওর ব্যয়ভার বহন করতে হবে,—সেটা তো অন্ততঃ কিছুটা পোষানো চাই।" সহস্র সহস্র ছেলেরই ঐরকম মানসিকতা; দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের কোন কোন অশিক্ষিত সমাজে দেখা গেছে পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষকে পণ দিয়ে তবে কন্যাকে গ্রহণ করতে হয়েছে, কিন্তু সেখানেও অশিক্ষিতা গ্রাম্য-বালিকার সুখ হয়নি, টাকা দিয়ে কিনে নববধূকে ঘরে নিয়ে আসার পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির যথারীতি অত্যাচার শুরু হয়ে যায়,—স্বামীও তার থেকে বাদ নয়। পিতার চোখে জল, বধূকে পেদোক্তি করতে শোনা যায়,—"এত টাকা নিলে বাবা/তবু দিলে বিয়ে/এখন কেন কাঁদ বাবা/গামছা মুখে দিয়ে ?" প্রকৃতপক্ষে, অর্থের প্রতি জঘন্য লালসা ও দাসত্বসুলভ মনোবৃত্তি দ্বারা সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলা কখনই সম্ভব নয়।

প্রাক্ ইসলামিক যুগে এবং ইসলামের প্রারম্ভে অন্ধকার যুগ বা আইয়ামে জাহেলিয়া বলে অত্যন্ত দুর্দিন ছিল,—আরবের অবস্থা তখন মহাসঙ্কটজনক,—পুতুল পূজা, মদ্যপান এবং নারীর প্রতি উগ্র লালসা ইত্যাদিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত—যার চরম ফলশ্রুতি হল নারীর ওপর অত্যাচার, অবিচার। সমাজে নারীজন্ম যেন পাপের বোঝা স্বরূপ। কন্যাকে পাত্রস্থ করা হতো অঢেল ধন-সম্পদের বিনিময়ে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থারও কিছু অদল-বদল হয় বটে, তবে যতদূর অনুমান করা যায় সেই থেকেই পণ বা যৌতুক দেবার প্রথা চলে আসছে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে, তুলনামূলকভাবে হিন্দু মেয়েদের ক্ষেত্রে পণ বা যৌতুকের দর কষাকষি বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে কিন্তু হাল আমলে মুসলমান সমাজে পণপ্রথার প্রকটতা অধিকতর মাত্রায়। বাংলাদেশের রসুলুল্লাহ সাহেব ঐ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,—"যদি বিয়ে করে দাম্পত্যজীবনে সুখই না পাওয়া গেল, তবে তার চাইতে কুমারী জীবন যাপন করা অনেক ভাল, নিজের যোগ্যতা বিচার করার মত ক্ষমতা থাকা উচিত প্রত্যেকটি মানুষের। তাতে নিজেকে বাঁচান যায় আর সেই সাথে রক্ষা করা যায় একটা জাতিকে।"

কোন এক কালে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল,—তখন পণ বা যৌতুকের প্রচলন ছিল না। নারীর ছিল প্রবল আধিপত্য—অবশ্য তার স্থায়িত্ব ছিল স্বল্পকালই। ক্রমশঃ গোষ্ঠীপ্রধান, গ্রামপ্রধানদের হাতে সমাজ-শাসনের চাবি-কাঠি চলে যায়,—শাসন ও শোষণ দুইই এল পুরুষের হাতে,—পুরুষ তার আধিপত্য কায়েম করার জন্য, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতা ভোগ করার জন্য নিজেকে ভগবানের আশীর্বাদ এবং নারীকে অভিশাপ ব'লে প্রতিষ্ঠা করতে লাগলো। পুরুষ কর্তৃক রচিত মুখস্থ শাস্ত্রের বুলিকে হাতিয়ার করে,—যে সকল কপচানো বুলি শেখার সুযোগ থেকে কলাকৌশল করে নারীকে বঞ্চিত রাখা হ'ত, আর এই বদ্ধমূল সংস্কারের মূলে প্রধান প্রধান ভূমিকায় এলো পুরোহিত, শাস্ত্রবিদ ও পুঁথি মুখস্থ করা বুদ্ধিজীবীর দল। ক্রমশঃ নারী ক্রীতদাসীর পর্যায়ভুক্ত হতে থাকলো,—বিয়ের আগে পিতা মাতার ও ভ্রাতার অধীন, বিয়ের পর স্বামী-পুত্রের অধীন হয়ে থাকতে হবে,—শাস্ত্রও এই ছকেই রচিত হ'ল—শুরু হল নীতি-উপদেশ দেওয়া,—যে নারী এর বিরোধিতা করবে সে নারী সমাজের কলঙ্ক, স্বভাবতই পিতৃকুল-শ্বশুরকুল ও সমাজ—সর্বত্রই স অপাংক্তেয় হবে সমাজ-শাসনের দোর্দণ্ড প্রতাপে নারী শাস্ত্রীয় প্রথাতেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে বাধ্য হলো,—এই বাধ্যতাকে ধীরে ধীরে পুণ্যার্জন মনে করে সুখী হ'তে চেষ্টা করতে লাগলো,—তাতেও অধিকাংশের কপালেই সুখ জুটলো না। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত মহিলাদের খুব বেশি রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতাও নেই,—দৃঢ়মূল দুর্দান্ত শাসনব্যবস্থার যাঁতাকলে নারীর মেরুদণ্ড দুর্বল হতে লাগলো,—সহ্য ক্ষমতার কষ্টিপাথরেই সতীত্বকে ঝালাই করে নেওয়ার রেওয়াজ, আস্তে আস্তে নারী হলো ভোগ্যপণ্য ও ভোগ্যদ্রব্য, বিবাহে শুরু হলো কেনাবেচার পালা, পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথার প্রচলন চলতে লাগলো জোর কদমে। বিবাহ ব্যাপারটি পুরোপুরি ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিতে দাঁড়িয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে নারী যে পণপ্রথার বিরুদ্ধে লড়বে বা অনন্যোপায় হয়ে কুমারীত্বকে বরণ করবে,—সেটা কিসের ওপর দাঁড়িয়ে? দাঁড়িয়ে লড়বার প্ল্যাট-ফরমটা তো মজবুত হওয়া দরকার, পায়ের তলায় যদি মাটি না থাকে লড়বার ক্ষমতা আসবে কোথা থেকে? পায়ের তলার মাটিকে শক্ত করতে হলে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অপরিহার্য, আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন নারীদের আবশ্যিক শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা, যে শিক্ষা শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিপড়া ডিগ্রি নয়,—সমাজ সচেতন করে গড়ে তোলার একটি বিশেষ দিক্। দীর্ঘকালের

সংস্কারের গণ্ডিতে আবদ্ধ, শোষিত, উৎপীড়িত, শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে বঞ্চিত নারীদের এগিয়ে আসা মোটেই সহজসাধ্য নয়, সেখানে সচেতন পুরুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সেই পুরুষ মানুষটি পিতা স্বামী-ভ্রাতা-বন্ধু-সহযোদ্ধা যেই হোন না কেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত সত্য যে বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে নারী পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়, আর সেই সত্যটাকে পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য পুরুষ ও নারীর ঐকান্তিকভাবে উদ্যোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নারীদের যদি কুসংস্কার থেকে মুক্তি আসে স্বাভাবিক কারণেই পণ প্রথারও বিলোপ ঘটবে। পণপ্রথা ভুঁইফোঁড় কিছু নয়,— কুসংস্কারের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

পুরনো হিন্দু আইনে রয়েছে বিয়ে করাটা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। পাত্র-পাত্রীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ভাললাগা মন্দলাগার কোন প্রশ্ন নেই, পিতা-মাতার নির্দেশ ও সমাজের নির্দেশে এই অবশ্য কর্তব্যটি পালন করতে গিয়ে বহু জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে, জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে, জীবনের শুরুতেই হয়তো বা সমস্ত পালা সাঙ্গ করে নববধূকে পৃথিবীর মায়া কাটাতে হয়েছে। উভয়পক্ষের অভিভাবকের পণ নিয়ে কন্যার রূপ নিয়ে বংশকৌলীন্যকে কেন্দ্র করে যে দর-কষাকষি হয়, তারই ফলশ্রুতি এমন নিষ্ঠুর পরিণতিকে আবাহন করে। পাত্রী-পক্ষও যতটা সম্ভব পণ ও যৌতুক দিতে বাধ্য হন কন্যার জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে। হিন্দুশাস্ত্রের বিধি হল মেয়েদের পরনির্ভরশীল হয়ে জীবন কাটাতে হবে, আর এর দ্বারাই পুণ্যিলাভ হবে। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত নারীরা শাস্ত্রকার ও পুরুষের মুখের কথা শুনে সেই সংস্কারকেই মনে-প্রাণে আঁকড়ে থাকে। কলকাতা হাইকোর্টেও সুপ্রীমকোর্টের এডভোকেট অরুণা মুখোপাধ্যায় তাঁর 'নারীর স্বাধিকার' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন"···এ-দেশের মা-বোনেরা বড় বেশি উদাসীন, তাঁরা নিজেদের সম্বন্ধে কিছু জানেন না, জানতে চান না, জানবার সুযোগও পান না। জীবনটাকে যেন বন্দী করে রাখতেই তাঁরা অভ্যস্ত। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তার সেই বন্দীদশা থেকে মুক্ত হবার পথ যদি খুলে দিতে পারি তবে তাই হবে আজকের মেয়েদের বড় পাওনা।" মেয়েদের বহু বাধার সম্মুখীন আজ হতে হচ্ছে, তবুও আর দেরী না করে পণ-প্রথার বিষময় দিকগুলোর বিরুদ্ধে এখনই সমবেতভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে।

হিন্দু মিতাক্ষর আইনের বিধি হল (বঙ্গদেশ ছাড়া অন্যত্র) মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বেঁচে থাকলে মেয়েরা পৈতৃক সম্পত্তি পাবে না। স্ত্রীর অবর্তমানে অবিবাহিত

মেয়েরা অগ্রাধিকার, তারপর সহায় সম্বলহীন মেয়েরা, তারপর পাবে বিবাহিত ও সম্পন্ন মেয়েরা, দায়ভাগ আইনে পুত্রের অগ্রাধিকার, তারপর স্ত্রী, তারপর অবিবাহিত মেয়ে পুত্র সন্তানবতী মেয়ে পাবে, যা নাকি বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য। স্মৃতিকার মনু, স্মৃতিকার বিষ্ণু, স্মৃতিকার কাত্যায়ন, স্মৃতিকার ময়ুখ,—এই পণ ও যৌতুককে স্ত্রীধন বলে উল্লেখ করেছেন।—পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় থেকে নববধূর ভাগ্যে যা যা জুটলো তার বিভিন্ন নামকরণ করে স্ত্রীধন বলেছেন, উক্ত আইন বা শাস্ত্রে যাই রচিত হোক না কেন সব কিছুরই মূল কথা—নারী সমাজের বোঝা, কাজেই স্ত্রীকে গ্রহণ করে যেনতেন প্রকারেণ স্ত্রীর সারা-জীবনের দায়ভার কোনরকমে পুষিয়ে নেওয়া।

দেশ স্বাধীন হল মেয়েদের অধিকারের কথা চিন্তা করে নতুন সংবিধানের ভিত্তিতে আইন রচিত হল—হিন্দু বিবাহ আইন, হিন্দু সম্পত্তি উত্তরাধিকার আইন। আইনে অবশ্য পিতা উইল করে কন্যাকে অধিকার থেকে বঞ্চিতও করতে পারেন আর এই অধিকার মেয়েদের ক্ষেত্রে সম্ভবত প্রয়োগ করা হল এই ভেবে যে এবার হয়তো মেয়েরা সমাজে কিছুটা প্রতিষ্ঠা পাবে ফলতঃ পণপ্রথা স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু পণপ্রথা পুরোপুরিই চলছে শুধু তার রকমফের মাত্র। কারণ মেয়েরা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে কার্যত মুক্তি পায়নি,—ধরেই নেওয়া হল সম্পত্তি রক্ষা করার ক্ষমতা মেয়েদের নেই কাজেই আইন জীবনে কার্যকরী না হয়ে পুঁথিতেই আটক রইল।

১৯২৮ সালে পণপ্রথা বিরোধী আইনও তৈরি হল। Dowry Prohibition Act-এ বলা হল বিয়ের শর্তাধীনে দিলে তবে তা পণ বা যৌতুক বলে হবে নচেৎ উপহার হিসেবে দেওয়া নেওয়া চলতে পারে আইনে আরও বলা হল যৌতুক নিলে ছয়মাস পর্যন্ত জেল বা ৫০০০ টাকা জরিমানা- দুইই হতে পারে। কাজেই আর অসুবিধে রইলো না কিছুই—বিবাহে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিকে পোষণ করে অভিজাত পরিবার ও ধনীর পরিবারে চলতে থাকে উপহার এর নামে যৌতুকের আড়ম্বর—মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলিও অন্ধ অনুকরণ করতে থাকে। আইনের দ্বারস্থ না হয়ে পণ প্রথাও চলছে পুরোদমে। কিন্তু দানসামগ্রীর ব্যাপারটা যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন আর্থিক ক্ষমতা তো আর অপরিমিত নয়,—তাই কখনও কন্যাপক্ষের নাভিশ্বাস ওঠে—পণ পুরো মেটাবার আগেই হয়তো বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয় নিতান্তই হিসেব-নিকেশের মধ্যে দিয়ে, পুরো পণের দাবি না মেটা পর্যন্ত নববধূর ওপর অকথ্য অত্যাচার চলে। যদি

পণের বাকি অংশটুকু কন্যাপক্ষ না দিতে পারেন তবে তার বলি হয় নববধূটি, অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় অথবা বিপথগামিনী হয়। ১৯২৪ এ আইনের Amendnentই হয়েছিল, বাস্তবে কিছুই কার্যকরী হয়নি।

পণ বা যৌতুকের মাপকাঠিতে নববধূর শ্বশুরালয়ে কেমন স্থান হওয়া উচিত তা' নির্ণয় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে নারীত্বের মর্যাদার কথা ভাবলে বলা যায় যে, বধূর কপালে সুখ জোটে না এক ফোঁটাও, কৃপাপ্রার্থী হয়েই জীবন কাটাতে হয়, অভিভাবকরা ভাবে ঐটুকু হলেই হলো, আবার কি! পাত্রের পিতা-মাতার গৌরব হলো কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার থেকে অঢেল যৌতুক পেয়েছেন, দশজনের কাছে তিনি প্রতিষ্ঠিত, তার পুত্রের কদর দেখিয়ে, পাত্রটি চিরজীবনের দাসীও পেলেন, ভোগ লালসার উপায়ও চরিতার্থ হল, সন্তান উৎপাদন করে বংশ রক্ষা করা গেল, সর্বোপরি সারাজীবনের মত যতটা সম্ভব আখেরও গুছিয়ে নেওয়া গেল

পণ বা যৌতুকের মাপকাঠিতে বিবাহ ব্যাপারটি সম্পন্ন হলে দাম্পত্য জীবনে ফারাক অবশ্যম্ভাবী, পতিতা বা বেশ্যাবৃত্তির মূলেও পণপ্রথা অনেকটাই দায়ী। বিত্তহীন ঘরের মেয়েরা বহুক্ষেত্রেই পিতামাতার গলগ্রহ। পণ দিতে না পারায় সংসার করা ভাগ্যে ঘটে উঠলো না,—জীবিকার উপায় হিসেবে হয়তো বেশ্যাবৃত্তির পথ বেছে নেয়, কখনও পুরুষের বর্বরোচিত অত্যাচারে ঐ পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়, আর কখনও স্বামীর সংসারে সুখী না হওয়ায় এই পথকে সম্বল করে বেঁচে থাকে। তাই মেয়েদের বিনাখরচে আবশ্যিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ ও শিক্ষান্তে চাকুরি এবং পুরুষদের সমান মজুরী লাভ ইত্যাদির ব্যবস্থা কার্যকরী হলে তবেই পণ প্রথার শোষণ থেকে মুক্তি আসতে পারে। নারীদের ঐভাবে সচেতন ও সজাগ হতে হবে।

১৯২৯ সালের ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক নারী দশক উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রে নারীর অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা হয় ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়, নারীদের সামাজিক ও আইনগত অধিকার সম্পর্কে আলোচনা হয় ও তার ওপর রিপোর্ট পেশ করেন মহিলা আইনজীবী শ্রীমতী মঞ্জরী গুপ্ত। রিপোর্টে পণপ্রথাসহ নারীদের সামাজিক ও আইনগত অধিকারের কথা সুপারিশ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে উক্ত আইনগুলি গ্রামাঞ্চলে অধিকতর প্রচারের জন্য ও কার্যকরী করার জন্য রেডিও, টেলিভিশন,

ম্যাজিক লণ্ঠন, তথ্যচিত্র ও অধিকার সম্বলিত পুস্তিকা ইত্যাদিকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগীর। শ্রীমতী খাস্তগীর তাঁর ভাষণদানকালে বলেন যে, নারীদের আইনগত অধিকার ও পণপ্রথা সম্পর্কিত আইন ইত্যাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুঁথিতেই আটক থাকে। গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিতা নারীসমাজ এ গুলোর খবর জানেও না, জানাবার কোন সুযোগও করে দেওয়া হয়নি, যার ফলে আইনের সুযোগ গ্রহণে তারা বঞ্চিত, তাই গ্রামাঞ্চলে আইনগত অধিকারগুলোর বহুল প্রচারের প্রয়োজন। নারীর সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এতদ্বিষয়ক সুপারিশ কেন্দ্রের অনুমোদনের অপেক্ষায়। একদা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে কলকাতা শিশির মঞ্চে অনুষ্ঠিত পণপ্রথা নিষেধ সম্পর্কিত আইনের আলোচনা সভায় সুফিয়া খাতুন 'পণ প্রথার উচ্ছেদ' সম্পর্কে একটি কবিতায় বলেন,—

"নর-পশুতে কতটা বিভেদ এই সমাজের কাছে
অর্থ নেশায় পশুর সামিল সে মানুষ কি আর আছে ?
জগৎ সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন করে চার দেওয়ালের মাঝে
নারীকে বিলাস সামগ্রী ভেবে রাখিবে বাঁদীর কাজে ?
ভেঙে দেবো আমি আজ যত আছে সেই নিষেধের দ্বার
নারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কারো নেই অধিকার।

শুধুমাত্র পাত্র-পাত্রীরই সম্প্রীতিসূচক বিবাহ বন্ধন ও আইনকে হাতিয়ার করতে পারলেই পণ প্রথার বিলোপ সাধন সম্ভব, নারীদের সমাজসচেতনতাবোধ ও আইনকে কার্যকরী করা এই দুটো কর্মসূচি গ্রহণেই পণপ্রথার বিষময় ক্রিয়া থেকে সমাজকে বাঁচানো সম্ভব। এ প্রসঙ্গে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের সুমিত্রার মুখের "... যে সমাজে কেবলমাত্র পুত্রার্থেই ভার্যাগ্রহণের বিধি আছে, নারী হয়ে তাকে ত' আমি শ্রদ্ধা করতে পারিনে।" কথাগুলো প্রতিটি মেয়ের স্মরণ রাখা আজ অবশ্য প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্যে নারীর স্বরূপ

"Art can not be seperated from social force in origin, in effect and in its very nature." —Luka'cs.

ভারতবর্ষের শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আবর্তন-বিবর্তন হয়েছে শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে। বিশেষ একটি শ্রেণী বা প্রতিভূ এই কাঠামোর চালক,—আর তার চালিকা-শক্তি নিয়োজিত বিশেষ শ্রেণীস্বার্থের জন্য, আর শ্রেণীদ্বন্দ্বও কখনও রাজনৈতিক কখনও অর্থনৈতিক কখনও ধর্মসংস্কারকে কেন্দ্র করে। তবে সব কয়'টি মূলত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

সমাজের অর্ধেক সংখ্যক হচ্ছে নারী, ভারতের সমাজ-কাঠামোতে বহু বহু কাল ধরে নারী সমাজে শোষিত নির্যাতিত, শুধু যুগের পরিবর্তনে তার রকম ফের হয়েছে মাত্র। ধর্মীয় কারণে, অর্থনৈতিক কারণে এবং সামাজিক বিধি-নিষেধে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলির বলি হয়েছে নারী জাতি, সমাজের হেয় ও দুর্বলশ্রেণী হিসেবেই তার সামাজিক অস্তিত্ব। স্বাভাবিকভাবেই নিপীড়িত নারী সমাজের ব্যবস্থা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে বহু কাল ধরে। সাহিত্য-শিল্প যেহেতু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না, স্বভাবতই তার প্রতিফলন ঘটেছে নানাভাবে শিল্পে-সাহিত্যে।

বাংলা সাহিত্যকে নিয়ে আলোচনার পূর্বে একটু পিছনের দিকে তাকানো দরকার।

মহাকবি কালিদাস-ভবভূতি-ভাস এদের কাব্য-সম্ভারেও লক্ষণীয় হল, রাজা-মহারাজা, অভিজাত সম্প্রদায়ের কথোপকথন সংস্কৃতে, আর নারী ও ভৃত্যের মুখে ধরা হয়েছে প্রাকৃত ভাষা। কালিদাসের তো পুরুষপ্রধান সমাজেই অবস্থান, কাজেই বৈষম্য বা অসাম্য তাঁদের সৃষ্টিতেই ফুটে উঠেছে অত্যন্ত স্বাভাবিক গতিতেই।

দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে চর্যাপদের যুগে আমরা দেখেছি তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় মেয়েরা সমাজের চোখে পুরুষের তুলনায় অনেকটাই হেয়। জীমূতবাহন স্পষ্টই বলেছেন, ব্রাহ্মণ যদি নিজ স্ত্রী ছাড়া অপর রমণী অথবা নিম্নবর্ণের স্ত্রীর সঙ্গে যৌন লালসা চরিতার্থ করতে মশগুল হন তাহলে সামান্য মনস্তাপেই সেই দোষ খণ্ডিত হয়। নৈতিক কোন অপরাধে তিনি অপরাধী বলে বিবেচিত হন না। এরূপ ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত অজস্র। মেয়েরা সা·া এক অসু-

শাসনে আবদ্ধ, কাজেই পুরুষের ব্যভিচারের কলঙ্কের ভাগীদার হোত মেয়েরাই। জীমূতবাহনের টীকাকার কৃষ্ণের রচনায় যা পাওয়া যায় তা হ'ল, নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোককে বিয়ে করা অপেক্ষা অন্যের সঙ্গে বিবাহিতা নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ব্যভিচারে মত্ত থাকা ব্রাহ্মণের পক্ষে কম দোষের। কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের একটি হাস্যাস্পদ দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হ'ল:

"নাস্মাকং জননী তথোজ্জ্বলাকুলা সচ্ছোত্রিয়ানাং পুন—
র্ব্যূঢ়া কাচন কন্যকা খলুময়া তেনাস্মি তাতোধিকঃ।
অস্মচ্ছ্যালক-ভাগিনেয় দুহিতা মিথ্যাভিশপ্তা যত—
স্তত সম্পর্ক বশন্ময়া স্বগৃহিণী প্রেয়স্যপি প্রোজ্ঝিতা॥"

অর্থাৎ আমার জননী তেমন সংকুল থেকে আসেননি। আমি কিন্তু সৎ গোত্রীয় বংশের এক কন্যাকে বিবাহ করেছি। তাতে আমি বাবাকে টেক্কা দিয়েছি। আমার শালার ভাগিনেয়ের কন্যার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা হওয়ায় সেই সম্পর্কের জন্য প্রেয়সী হলেও গৃহিণীকে আমি ত্যাগ করেছি।

এই শ্লোক থেকে একটা জিনিষ পরিষ্কার, সেটা হল জননী বা প্রেয়সী যিনিই হোন না কেন তার ওপরে খবরদারির অধিকারটা পুরুষেরই। 'বাবাকে টেক্কা দেবার মধ্যে দিয়ে 'জননীর' প্রতি অবজ্ঞা ফুটে উঠেছে, আর স্ত্রী সদ্বংশীয়া হলেও প্রয়োজনে তাকে ত্যাগ করার অধিকার স্বামীর অর্থাৎ পুরুষের রয়েছে। পুরুষের যেন এটা জন্মগত অধিকার,—এই মর্মে আরও বহু বহু শ্লোক আছে।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনেও নারীজাতির গঞ্জনা-লাঞ্ছনা ভোগের চিত্রটি রাধার ব্যাকুলতার মধ্যেই ফুটে ওঠে। সেখানেও কিন্তু রাধিকাই সমাজের চোখে কলঙ্কিনী। কৃষ্ণকে সেই কলঙ্কের বোঝা সইতে হয় না। শাশুড়ি, ননদাও প্রতি কথায় দোষ ধরে, গোপিনীরা কলঙ্ক দেয়, স্বামীও শক্তিশালী। রাধা নিজেকে বড় অভাগিনী ভাবে, তাই তার আকুল আর্তি,—

"বড়ায়ি গো!
কত দুঃখ কহিব কাঁহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞ নারী বড় অভাগিনী॥
নন্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পো আল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞ বিকাসিলোঁ।
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ॥

সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নঞিঁর সঙ্গে আছে ॥”

মধ্যযুগীয় সাহিত্যে চণ্ডীদাসের পদাবলী কীর্তনেও দেখা যায় নারী তার দাসত্বকে মেনে নিয়েছে। স্বামী হচ্ছেন ‘প্রভু’, আর স্ত্রী হলেন ‘দাসী’—এটাই সমাজে স্বীকৃত। এতেই উভয় পক্ষের গৌরবও বটে এবং স্ত্রীর ধারণা অনুযায়ী এতেই পুণ্যলাভ ও সতীত্ব। রাধা-কৃষ্ণের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে বলে :

“বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥”

মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের মধ্যে ‘দৌলত কাজী’, মিয়া সাধনের ‘মৈনা কা সত্’ কাব্য থেকেই ‘সতী ময়না’ বা ‘লোর চন্দ্রানী’র উপাদান সংগৃহীত। লোর ও চন্দ্রানীর প্রেমের আখ্যান ও লোরের প্রথমা পত্নী ময়নার সতীত্ব কাহিনী ও স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হবার পর তাঁর করুণ বিলাপ বর্ণনাই এই আখ্যানটির বিষয়বস্তু। লোরক সতী ময়নাকে ত্যাগ করে চন্দ্রানীকে নিয়ে পালিয়ে যান এবং বিবাহ করে রাজত্ব লাভ করেন। দৌলত কাজী সমাজে যে পুরুষই পূজনীয় এবং সুখ ভোগের অধিকারী—সেটা ময়নার সতীত্ব, স্বামী-ভক্তি, পুরুষের লালসার সামনেও অবিচল নিষ্ঠা—ইত্যাদির মাধ্যমে খুব চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্য অনেকটা পরিমাণেই দেবলীলা বিষয়ক, দেব-দেবীর কৃপার ওপরে নির্ভরশীল। যখন হিন্দু কবিরা দেব-দেবী বিষয়ক কাহিনী রচনায় মশগুল, মুসলমান কবিরা তখনই নর-নারীর রোম্যাণ্টিক প্রেম, বিরহ-মিলনের কথা নিয়ে আখ্যান রচনা করেছেন, যার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সামাজিক অবস্থাটা জানতে পারার সুযোগ ঘটে।

মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যুগে নারী নির্যাতনের চিত্র তেমন উল্লেখ-

যোগ্যভাবে কিছু নেই। বেহুলার স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার মধ্যে দিয়ে স্বামী ভক্তি ব্যাপারটাই ফুটে উঠেছে। ফুল্লরার বারমাস্যা বা সুশীলার বারমাস্যায় তাদের বারোমাসের দুঃখের দিনগুলোর করুণ চিত্র পাওয়া যায়।

ময়মনসিংহ গীতিকা মূলত নর-নারীর রোম্যান্টিক প্রেম বিষয়ক, স্বভাবতই সেখানে শোষণের চিত্র তেমন প্রকট কিছু নেই। ময়মনসিংহ গীতিকা, বাস্তানীর গান, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ইত্যাদি পালাগুলোতে মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, কঙ্ক ও লীলা, মদিনা, কেনারাম, ভেলুয়া সুন্দরী-র চরিত্রগুলোর মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজে মেয়েদের অবস্থানটা কি তা বোঝা যায়।

প্রাচীন লোকসংস্কৃতিকে যদি সাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে সমাজ ও সাহিত্যের মূল শেকড় গ্রথিত রয়েছে লোকসাহিত্যের মধ্যে। সেই অর্থে লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতি সমাজের দর্পণ। দেশ-কাল-পরিবার ও সমাজের ছবি বা প্রকৃতরূপ লোকসাহিত্যের ছড়ায়, গানে বিধৃত হয়ে আছে ছন্দময় বাণীতে বা সুরেলা কণ্ঠে। পাণ্ডিত্যের কচকচানি, জ্ঞানদানের অথবা তাত্ত্বিক অলঙ্করণের কোন সুযোগ এখানে নেই, তাই নির্ভেজাল ছবি প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে, যাকে কালের দর্পণও বলা চলে। আর এই প্রাচীন লোকসাহিত্যে বিরাট স্থান জুড়ে রয়েছে ব্যথিত, নির্যাতিত নারীর হাহুতাশ। নারী জন্ম-গ্রহণই যেন এক অভিশাপ, পরিবার, সমাজ তথা দেশের ভারবোঝা। সমস্ত রকম বঞ্চনা-যন্ত্রণার পাহাড় মাথায় নিয়ে যেন সে সর্বংসহা। বাল্যবিবাহ ও অকাল বৈধব্য নামক অভিশাপের জ্বালা মেয়েদের ভোগ করতে হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত, সংস্কারের বেড়াজালে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে মেয়েদের জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকার চিত্র অর্থাৎ দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণার বিভিন্ন দিক ও কৌশল লৌকিক ছড়া ও গানে প্রাণবন্ত হয়ে এক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে রয়েছে।

অর্থের বিনিময়ে শিশু কন্যাকে বহু দূরে পাত্রস্থ করা হল, বালিকা কন্যা শ্বশুর বাড়ির ভয়ে ভীত হয়ে অভিযুগের সুরে বলে :

"এত টাকা নিলে বাবা দূরে দিলে বিয়ে,
এখন কেন কাঁদ বাবা গামছা মুখে দিয়ে,
আমরা যাব পরের ঘরে পরঅধীন হয়ে,
পরের বেটী মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে ;
দুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা বেয়ে"

বাল্যবিবাহের পরিণাম হল,—বালিকা কন্যার ভাগ্যে জুটেছে বুড়ো বর, অকালবৈধ্যব্য। তাই তার খেদোক্তি :

"চোখ খাওগো বাপ-মা, চোখ খাওগো খুড়ো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক খেগো বুড়ো॥
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে, বুড়ো মরে কেশে।
নেড়ে চেড়ে চেয়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে॥"

নাথ সাহিত্যেও ময়নামতী গোপীচন্দ্রের কাহিনীতেও ময়নামতীকে পুত্রের সংসারে পুত্রবধূদের প্ররোচনায় সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। সেখানে পুত্রও মাতৃচরিত্রে কলঙ্কলেপন করতে পিছপা হয়নি। সমাজে পুরুষের আধিপত্যের কি নিষ্ঠুরতম দিক, এমনকি পুরুষশাসিত সমাজে যে মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু হয় তারও পরিচয় এখানেই আছে, যার মূলে রয়েছে মেয়েদের অর্থনৈতিক পরাধীনতা। ময়নামতীর বিরুদ্ধে অসতীত্বের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল পুত্রবধূরাই।

খ

কেরী সাহেবের 'কথোপকথন' (১৮০১) নামক গদ্যগ্রন্থে তৎকালীন সমাজে অধিকাংশ পুরুষ বহু বিবাহিত হওয়ার ফলে মেয়েদের সতীন নিয়ে ঘর করার অন্তর্জ্বালা ও দীর্ঘশ্বাসের ছবি চিত্রিত হয়েছে :

"১মা—ওলো, তোর ভাতার কারে কেমন ভালবাসে তাহা বল শুনি।

২য়া—আহা, তাহার কথা ক. কেন? এখন আর আমাদের কি আদর আছে? নূতনের দিকে মন ব্যতিরেকে পুরাণের দিকে কে চাহে?

১মা—তাহা হউক। তুই সকলের বড়, তোর ছালাপিলা হইয়াছে।

২য়া—কালিকে ভাই দুপুরবেলা কচকচি লাগালে মাঝা বিটি তাহা কি বলিব।

১মা—কি জন্য কচকচি হইল?

২য়া—দূর কর ভাই, তাহা কহিলে আর কি হবে, লোকে শুনিলে মন্দ বলিবে। আমার বাড়ীভরা শত্রু, এইজন্য ভয় করি।"

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের গদ্যরচনা থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মেয়েদের ঘরকন্না করার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের আধিপত্যের প্রতি যে একপ্রকার বিতৃষ্ণার উদ্রেক হতো তার চিত্রও পাওয়া যায়। আনুমানিক ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে লেখা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকায়' আছে : "ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল, 'তবে কি আজি খাওয়া হবেনা, ক্ষুধায় মরিব? তৎপত্নী কহিল, 'মরুক কানে, আজি

কি পিঠা না খাইলেই নয়? দেখি—দেখি হাঁড়ি কুঁড়ি খুদ কুঁড়া যদি কিছু থাকে।' ইহা কহিয়া ঘর হইতে খুদকুঁড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল, 'শীলটা ভাল বটে, নোড়াটা যা ইচ্ছা তা। এতে কি চিকণ বাটা হয়? মরুক, যেমন হউক, বাটিত।"

রবীন্দ্রনাথ রামমোহন সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, "কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা, কী সমাজ, কী ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই।" সমাজ সংস্কারের দিক থেকে রামমোহন রায়ের বিরাট অবদান হচ্ছে, সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার সংগ্রামী ভূমিকা। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে একই সঙ্গে চিতায় তুলে আগুনে পুড়িয়ে মারার মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা—তার বিরুদ্ধে রামমোহনের বিষোদ্গার অবিস্মরণীয়। তাঁর 'সহমবণবিষয়ক প্রবর্তক নিবর্ত্তক সম্বাদ' ও 'সহমরণ বিষয়ক' গ্রন্থ দু'খানি সাহিত্য ও ইতিহাসের ভাণ্ডারে মূল্যবান দলিল। সহ-মরণের বিরুদ্ধে ও পুরুষশাসিত সমাজেব ও সংস্কারের জালে আবদ্ধ ও পিষ্ট দুঃখিনী মেয়েদের কথা ভেবে তিনি লিখলেন:

"...যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্যনিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহাদিগকে সেই সেই পতি হস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানাছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণবধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ ক'রতে পারিবেন না। দুঃখ এই যে, এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয়না যাহাতে বন্ধন-পূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়। ইতি সমাপ্ত ১৭৪১ শক ১৬ই অগ্রহায়ণ।"

— সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব মেয়েদের বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য, বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য এবং স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার লাভের জন্য আমরণ সংগ্রাম করেছেন। সমাজের যন্ত্রণাকাতর মেয়েদের শৃঙ্খলিত অবস্থার কথা ভেবে বিদ্যাসাগরের হৃদয় বেদনার্ত হোত, তাই সংস্কারের জালে আবদ্ধ মেয়েদের মুক্তির জন্য তাঁর বিরাট কর্মকাণ্ড যার মূলে ছিল তাঁর একাগ্রতা ও আপোষহীন চরিত্র ও সংগ্রাম। এতদ্বিষয়ক তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য দু'খানি গ্রন্থ হলো—'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (দুইখণ্ড) এবং 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া

উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (দুই খণ্ড)। গ্রন্থ দু'খানিতে এই বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা যুক্তি সহকারে শুধু যে লিপিবদ্ধ আছে তাই নয়, নারীজীবনের নির্মম চিত্রও তাতে আছে। 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' গ্রন্থে তিনি বিধবা-বিবাহের সপক্ষে যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন এবং বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের সংস্কারাচ্ছন্ন যুক্তিকে কখনও খণ্ডন করেছেন, কখনও করুণা করেছেন, কখনও মানবজাতির উদ্দেশে আকুল আবেদন জানিয়ে বলেছেন,—

"হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলাজাতি জন্ম-গ্রহণ না করে।"

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল'-এ ধনীর আদরে লালিত বাবু সমাজের চিত্রও যেমন আছে অপর দিকে অভাবী পুরুষের নারীর ওপর অন্যায় ভাবে অধিকার ফলাবার নির্মম চিত্রও আছে। যেমন:

"তোমার বাপকে বললাম তিনি ত ফাঁকি দিলেন—তোমার হাতের গহনা খুলিয়া দাও। আমি বললাম মাকে জিজ্ঞেস করি—মা যা বলবেন তাই করবো। এই কথা শুনিবামাত্রে আমার বালাগাছাটা জোর করে খুলে নিলেন। আমি একটু হাত রগড়ারগড়ি করেছিনু, আমাকে একটা লাথি মারিয়া চলিয়া গেলেন—তাতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিনু, তারপর মা আসিয়া আমাকে অনেকক্ষণ বাতাস করাতে আমার চেতনা হয়।"

জগদীশ গুপ্ত জীবনকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন, আপাত সত্য-সুন্দরের অন্তরালে যে অশুভ রূপ রয়েছে যা অত্যন্ত পীড়াদায়ক, বেদনাদায়ক তাকে তিনি সচেতন সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন। ভালবাসা-মর্যাদা থেকে বঞ্চিত স্ত্রীর মন ঘৃণায় জ্বলে ওঠে, কখনও উদাসীন হয়ে পড়ে স্বামীর শুধু জৈব সত্তার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেখে, তাই— "সন্তান গর্ভে আসিতেই স্বামীর সঙ্গে যে একাত্মতার নিবিড়তম অচ্ছেদ্য বন্ধন অনুভব করিয়া তাহার অন্তর প্লাবিত করিয়া অনন্ত সুন্দর সুখের ঢেউ বহিতেছিল, সেই বন্ধন-বোধটা হঠাৎ দুর্বল হইয়া তাহাকে যেন দুস্তর শূন্যের মাঝে বৃন্তচ্যুত নিরালম্ব করিয়া দিলেন। সে বেদনার সীমা নেই।

(—'চন্দ্রসূর্য যতোদিন' গল্প)

রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটকে দেখা যায় বৈধব্য

জীবনের দীর্ঘশ্বাস এবং বিধবার পুনর্বিবাহ করে সংসার করার উদগ্র কামনা ও বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা। নাটকের ফুলকুমারী বলে,—"আমি ও পাড়ায় শুনলেম রাড়ের বে নাকি চলবে। তার উত্তরে যশোদা (সবিষাদে)—'আর ভাই হবে হবেই শুনছি, হয় কৈ? আমি থাক্তে আর হবে?' শান্তিপুরের তাঁতীরা কাপড় বুনতে বুনতে বলে: 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।"

উনবিংশ শতাব্দীতে দেশে নারীশিক্ষা ব্যাপারটাকে অনেকেই সহজভাবে নিতে পারেননি। বহুজন তো খোলাখুলি ভাবেই তার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অনেকেরই মনেই একটা গেল গেল রব উঠেছিল। সমাজের অনুশাসন হয়তো এবার ভেঙ্গে পড়বে—এই ভেবে কেউ কেউ আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন, কেউ বা হয়তো ভেবেছেন মেয়েদের কিছুক্ষণের জন্য পুজোর ঘর, রান্নার ঘর থেকে বেরিয়ে আসা মানেই অমঙ্গল অনিবার্য। আবার কেউ কেউ ভীত হয়েছেন এইজন্য যে, মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে উঠলে স্বভাবতই সচেতন হয়ে উঠবে, তাতে গতানুগতিকতায় অথবা একাধিপত্যে কিছুটা ছেদ পড়বে। কবি ঈশ্বর গুপ্তও নারীশিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি কৌতুক করে বিদ্রূপের সঙ্গে বলছেন,—

"আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল ব্রতধর্ম কর্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
তখন এ বি শিখে বিবি সেজে বিলিতী বোল কবেই কবে।"

উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন মহিলা কবির কবিতাতেও নববধূর দুঃসহ পারিবারিক জীবন, অকালে বৈধব্য যন্ত্রণা, সাংসারিক জীবনে মেয়েদের মর্মন্তুদ কাহিনী ফুটে উঠেছে। যেমন কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, স্বর্ণকুমারী দেবী, ষোড়শী বালা দাসী, জ্ঞানেন্দ্র মোহিনী দত্ত ও লজ্জাবতী বসু।

বঙ্কিমের উপন্যাসে মেয়েরা সকলেই প্রায় অভিজ্ঞ শ্রেণীর, রূপসী এবং ঐশ্বর্যশালী। মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবারের সামাজিক বন্ধন, বিধি-নিষেধ, অভাবের জ্বালা-যন্ত্রণা অথবা পারিবারিক খুঁটিনাটি ঘটনা অনুপস্থিত। কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরাণী, দুর্গেশনন্দিনী, ইন্দিরা, রজনী আরও অনেকেই—কেউই নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত ঘরের নয়। তবে মেয়েরা যে সমাজে ভোগের সামগ্রী অথবা দেব-দেবী, তান্ত্রিক সাধকের নিকট পুজার উপহার, প্রসাদ অথবা বলি কিংবা অর্ঘ্য সেটা পরিষ্কার। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে ষষ্ঠ খণ্ডে কাপালিক

বলছে— "আমি এক স্বপ্ন দেখিলাম। যেন ভবানী আসিয়া কহিতেছেন—'রে দুরাচার, তোরই চিত্তশুদ্ধি হেতু আমার পূজায় এ বিঘ্ন জন্মিয়াছে। তুই এ পর্যন্ত ইন্দ্রিয় লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে আমার পূজা করিস নাই…… আমি তোর নিকট আর কখনও পূজা গ্রহণ করিব না।"

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোতে মেয়েরা নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই উদাসীন থাকে, যার ফলে সব মেয়েরা নিজ নিজ অস্তিত্বকে অসহায় মনে করে শুধু তাই নয়, আর একটি অসহায় মেয়েকে দেখার মধ্যে দিয়ে নারী জীবনের চরিতার্থতা ও তাৎপর্য খোঁজে। মেয়েরা বুঝে অভ্যস্ত হয় যে—পুরুষের সুখ-দুঃখকে কেন্দ্র করে এবং তাদের সুখ ভোগের উপাদান হিসেবে নিজেদের উৎসর্গ করার মধ্যেই পরম তৃপ্তি, সতীত্ব ও দেবত্ব লাভ। তাই বালিকা বিধবার আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সূর্যমুখীর মতো মেয়েদের কাছে হাস্যাস্পদ। তাই সূর্যমুখী বলে—"আর একটি হাসির কথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা-বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে যদি পণ্ডিত তবে মূর্খ কে?

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই এমন কতগুলো বিধিনিষেধের গণ্ডি নির্দিষ্ট ছিল যে, সেখানেও মেয়েদের গতি-বিধি মোটামুটি সীমিত বা পরিমিতই ছিল। মেয়েদের স্থান অন্দর মহলে, দিনের বেলায় মেয়েরা স্বামীর মুখদর্শন করার সুযোগ পেতেন না অর্থাৎ নিন্দনীয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ব্যাপারে অভিমত দিয়েছেন, "পাঠক স্মরণ রাখিবেন, আমরা এখনকার লজ্জাহীনা নব্যাদিগের কথা লিখিতেছিনা। আমাদের গল্পের তারিখ একশত বৎসর পূর্বে। চল্লিশ বৎসর পূর্বেও যুবতীরা কখনও স্বামী সন্দর্শন পাইতেন না।"

রমেশচন্দ্র দত্ত-এর 'সংসারে' এবং 'সমাজে' উপন্যাস দু'খানিতে বিধবা বিবাহ অসবর্ণ বিবাহের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছে। তাঁর 'মাধবীকঙ্কণে' হেমলতা বলছে—'আমি জনমে জনমে স্বামীর চিরদাসী থাকিব'—স্বামীর দাসত্ব গ্রহণেই নারীজীবনের পরম সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। একজন উদার দরদী শিল্পীর পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

রমেশচন্দ্র সেনের 'যৌবন' গল্পে বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে যুবতী বধূর ঘর-সংসার করার মধ্যে যে পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে এবং যুবতী স্ত্রীর অন্তর্জ্বালা লেখক দরদের সঙ্গে তুলে ধরেছেন—'স্বামীর হাতে প্রদত্তা সুভদ্রা তখন গম্বুর হাতের মধ্যে একটু একটু কাঁপিতেছে।'

এরকম কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাই সামাজিক সংস্কার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে অসহায় মেয়েকে বৃদ্ধ পাত্রের হাতে সঁপেছেন, আর মেয়েটি সারা জীবন ধরে শোষণ-লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে চলে।

ত্রৈলোকনাথ মুখোপাধ্যায় সমাজের কুৎসিত দিকগুলো অর্থাৎ পুরুষের বহু বিবাহের আকাঙ্ক্ষা, ফলে ঘরে সতীনদের ঈর্ষা, মেয়েদের অশুভ আচরণ, মেয়েদের দৃষ্টিকটু ব্যাপারগুলোর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন বেশ কৌতুকভরে। দিগম্বর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে চলেছেন। তাহার ঠিক পশ্চাতে একধারে বিন্দী ও অন্যধারে গলাভাঙ্গা দিগম্বরী, বিন্দীর হাতে একটি ছাতি দিগম্বরীর হাতে একাখনি ঝাঁটা……

……ছোট্‌টুর হাতে গহনার বাক্স, আর কিষ্টার হাতে দিগম্বর বাবুর পোষাক রাখিবার কার্পেটের ব্যাগ।"

উনবিংশ শতকে নারীমুক্তি আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল কিন্তু নারীর সমান অধিকার ও সমমর্যাদার ব্যাপারটি তেমন আমল পায়নি। রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরাণীর হাট'-এর বিভা চরিত্র যেন তারই প্রতিমূর্তি। অধিকার বঞ্চিত বিভার মধ্যে যেন ঠাকুর বাড়ির পর্দানশীনতা ও বেদনাহত মেয়েদের জীবনকেই প্রতিনিধিত্ব করছে।

এই সমাজের বুকে মেয়েদের জীবনে পণপ্রথা, কৌলিন্য প্রথা, পুরুষের বহু বিবাহ, বৈধব্যের কঠিন আচার ইত্যাদি অভিশাপরূপে জন্ম নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নারীজীবনের ঐরূপ শৃঙ্খলিত, নিষ্পেষিত জীবন প্রত্যক্ষ করে আকুল হয়েছেন, পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন। কবির মনে হয়েছে এই সমাজের কি রহস্য! একই পিতা, 'কখনও দেনার ঘরে কখনও পাওনার ঘরে।' কখনও তিনি ছেলের শ্বশুরের কাছ থেকে আদায় করতে ব্যস্ত জোর জুলুম করে, এমন কি তাকে নিঃসম্বল না করা পর্যন্ত, আবার তিনিই মেয়ের শ্বশুরের পদানত—সেখানে তিনি কন্যাদায়গ্রস্ত। সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য আর মেয়ের জীবনে সামান্য সুখ দেখার আশায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার শেষ সম্বলটুকু দিয়েও কত কাকুতি-মিনতি! —এটাই বাঙালী নারী জীবনের নির্মম পরিহাস। 'দেনাপাওনা'র নিরুপমা চরিত্র সমাজের অন্ধ কুসংস্কারের বলি হয়েছে। 'অপরিচিতা'র কল্যাণীর বিদ্রোহ পরিবার, সমাজ এবং অচল-অনড় সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র'—এই ছোট গল্পগুলোতে নারীরা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে, নারীজাতির অবমাননার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে।

রবীন্দ্রনাথ নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যকেই মূল্য দিয়েছেন বেশি তার অধিকার ঘোষণার মধ্যে দিয়ে। তাঁর বিনোদিনী চরিত্র দৃপ্ততার সঙ্গে ঘোষণা করে,—

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার,
কেন নাহি দিবে অধিকার।'

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই ঠাকুর বাড়ির অন্তঃপুরের মেয়েদের একটা চাপা বেদনা লক্ষ্য করতেন। যদিও ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাই সেইকালে শিক্ষা-সংস্কৃতির আলো পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি। এমনকি মেয়েদের শিক্ষা-গান-বাজনায় পারদর্শী করে তোলার চেষ্টা হত। কিন্তু ঠাকুর বাড়ির মেয়েদের তৎকালীন সমাজের অন্যান্য মেয়েদের মতই বিয়ে হতো খুবই অল্প বয়সে। তৎকালীন কলকাতার চিত্রও তিনি এঁকেছেন তার 'ছেলেবেলা'র মধ্যে। তিনি লিখছেন: আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়।...

মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজা-বন্ধ পালকির হাঁপ-ধরানো অন্ধকার গাড়ি চড়তে ছিল ভারী লজ্জা।

......ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ তেমনি বাইরে বেরোবার পালকিতেও।"

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যাঁতাকলে মেয়েরা সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে কিরকম অসহায়ভাবে শিশুকাল থেকে আমরণ নিষ্পেষিত হয়, অবহেলিত হওয়ার চিত্র তাঁর বিপুল রচনা-সম্ভারে অজস্র রচনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কবির অন্তর্বেদনা সংবেদনশীল লেখনীর মাধ্যমে যেন প্রাণ পেয়েছে। মেয়েদের পারিবারিক জীবনের দাসত্বের কথা ভেবে ক্ষোভের সঙ্গে গৃহবধূ বিশুর উদ্দেশে লিখলেন,—"বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা/রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা।" মেয়েদের জীবনের এমন এক ঘেয়ে নির্মম অবহেলিত অবস্থা কবি তাঁর কলমের মুখে তুলে ধরলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য জগতে আশপাশের গ্রাম বাংলার মেয়েদের এনে ভীড় জমালেন। তাঁদের জীবনের কামনা-বাসনা, ভাললাগা, মন্দলাগা কিভাবে জীবনের শুরুতেই নির্মূল করে দেওয়া হয়, যার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাকেও কাছে পাবার উপায় নেই—এমননি এক পাহাড়প্রমাণ ব্যথা-বেদনা নিয়েই হয়তো অকালেই ধরাধাম থেকে বিদায় নিতে হয়। এ'প্রসঙ্গে পলাতকা কাব্য গ্রন্থের 'মুক্তি', 'ফাঁকি', 'নিষ্কৃতি,' 'মায়ের সম্মান', 'কালো মেয়ে,' 'চিরদিনের দাগা', 'ছিন্নপত্র' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাঙালি ঘরের কালো মেয়ে

নন্দরানী ঐ বিশ্বের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ সমস্ত কিছু থেকে চিরবঞ্চিত ; দুঃখকষ্টের ভারবোঝা বুকে নিয়ে সে বড় একা, বড় অসহায় ! তার অবস্থা হল,—

'মরচে পড়া গরাদে ঐ ভাঙা জানলাখানি,
পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরাণী
ঐ খানেতে বসে থাকে একা,
শুকনো নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে
নৌকোখানি ঠেকা ।'

কৌলীণ্যের গর্বে, সামাজিক প্রতিষ্ঠার লোভে বাপ কন্যাকে বুড়ো বরের কাছে বিয়ে দিতে প্রস্তুত কিন্তু,

"মা কেঁদে কয়, মঞ্জুলি মোর ওই তো কচি মেয়ে—
ওরই সঙ্গে বিয়ে দেবে, বয়সে ওর চেয়ে
পাঁচগুণো সে বড়ো—" (নিষ্কৃতি)

নারী-জীবনের অবমাননাকর মর্মান্তিক অবস্থা দেখে রবীন্দ্রনাথ যে মর্মযন্ত্রণা উপলব্ধি করতেন কখনও তা বিদ্রোহের আকার নিয়েছে কখনও তার থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে বাল্য বিধবাকে বিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতির পথ খুঁজতেন তাই কবির অঙ্কিত মঞ্জুলিকাকে সামাজিক অত্যাচার-অবহেলা থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য "পুলিন তাকে বিয়ে করে/গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চলে।"

অভিজাত পরিবারের বৌ মৃণাল পনেরো বছর সংসার করার পর হৃদয়ঙ্গম করেছে পরিবারে বা সমাজে মেয়েদের অস্তিত্বের কোন মূল্য নেই, কোন মর্যাদা নেই, নিতান্তই কলের পুতুল বা খেলার পুতুল। তাই মৃণালের মুখে খেদোক্তি : "সংসারের মাঝখানে মেয়ে মানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই··· ··।"

মৃণালের উক্তির মধ্যে রয়েছে একদিকে নিষ্কৃতি ও মুক্তির আস্বাদ পাবার আকাঙ্ক্ষা, অপর দিকে রয়েছে সামাজিক বিধিনিষেধ ও সংসারের বিরুদ্ধে নারী জাতির অবমাননার বিরুদ্ধে জেহাদ এবং আত্মস্বাতন্ত্র্যের দাবি ঘোষণা।

গোরা উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অসহায় রূপ পরিস্ফুট হয়েছে হরিমোহিনী এবং তার মেয়ে মনোরমার মধ্যে। পরেশবাবুর মেয়েরা একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করার পরই অভিভাবকদের গোচরে ব্যাপারটা যখন এল, তখনই মেয়েদের বাড়ির ছাতে ওঠা পর্যন্ত বন্ধ হল। এই

চিত্রের মধ্যে মেয়েদের পর্দানসীন করে রাখা ও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখাটাই ছিল সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের আভিজাত্য ও কুলগৌরব অর্থাৎ এক প্রকার বিকৃত সনাতনী চিন্তাভাবনার প্রতি অটুট নিষ্ঠা ও বিশ্বাস—যার বলি নারী সমাজ। অশিক্ষা নামক অভিশাপের পাহাড়ের তলায় চাপা পড়ে থাকা নারী জীবনের কথা ভেবে গোরা উপন্যাসের ললিতা "মেয়েদের স্কুল গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে, সুচরিতার কাছে সে প্রস্তাব রেখে বলে,—মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই কি নিজের মনখানাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে আছাড় খেতে থাকব। পৃথিবীর কোন কাজেই লাগব না।" এই কথা শোনার পর "ললিতার কথাটার মধ্যে যে বেদনা ছিল সুচরিতার বুকের মধ্যে গিয়া তাহা বাজিয়া উঠিল।" নারী জীবনের এই অন্তর্বেদনাকে রবীন্দ্রনাথ অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন।

'চোখের বালি'র আশা তৎকালীন সামাজিক প্রথা অনুযায়ী শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত নয়, স্বামীর বন্ধুর সঙ্গেও তার কথা বলার কোন অধিকার ছিল না।

সেকালে সমাজে নারীরা প্রায় পুরোপুরি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা নিষেধ কঠিনভাবে, সংস্কারের কঠিন আবর্তে নারীজীবন দুঃসহ, তাদের শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা। তুলনামূলকভাবে ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েরা তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত ও শিক্ষার আলোও কিছুটা তারা পেয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ যখনই নারীর দুর্বিসহ জীবনের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন, তখনই তাঁর উপন্যাসে গল্পে প্রধান নারীচরিত্র ব্রাহ্ম সমাজ থেকে আহৃত। 'নৌকাডুবি'র হেমনলিনীর চরিত্রাঙ্কণে রবীন্দ্রনাথের ঐ একই চিন্তার প্রতিফলন।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলো প্রধানত ঐশ্বর্যশালী, অভিজাত ও কুলীন বংশের। স্বভাবতই জীবন যন্ত্রণা, শোষণ-নিপীড়ন ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর অথবা সমাজের অধিকসংখ্যক নিপীড়িত মানুষের মত নয়, শোষণের কৌশল স্থূল নয় অধিকতর সূক্ষ্ম। যেহেতু এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-কাঠামোতেই তাদের অবস্থান, কাজেই এই কাঠামোর যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হয়েছে সকলকেই—রকমফের মাত্র।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কৌলীন্য প্রথার বলি হয়েছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নারী যুগ যুগ ধরে। একটি শিশু ব্রাহ্মণ কন্যাকে হয়তো তুলে দেওয়া হল পঞ্চাশ ষাট-সত্তর বছরের কুলীন ব্রাহ্মণের হাতে। শ্বশুরালয়ে আসার পর থেকেই শিশু

বধূর ভাগ্যে জুটলো শুধু অনাদর অবহেলা আর দাসত্ব, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"ফুলের মালা গাছি/বিকাতে আসিয়াছি/পরখ করে সবে/করে না স্নেহ।" তারপর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বৈধব্য জীবনের ভার বয়ে চলতে হল পরিবার ও সমাজের নিকট বোঝা হয়ে। শরৎচন্দ্র 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে এই কৌলীন্য প্রথার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে বলছে—"মেয়ে মানুষের বিয়ে করা ছাড়া আর কোন কাজ আছে কিনা আমি সেইটে জানতেই বাবার সঙ্গে যাচ্ছি।"

'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসের জ্ঞানদা যেন নারীজীবনের দুঃখ-জ্বালা যন্ত্রণার এক বিরাট প্রতিমূর্তি। উপন্যাসটিতে রয়েছে মূল্যহীন নারীজীবনের ভাগ্যবিড়ম্বনার কাহিনী। সমাজে তার স্বামী নির্বাচনের অধিকার নেই অথচ তার বিবাহ ঘটানোও সম্ভব হলনা—কিন্তু সমাজের দৃষ্টিতে সে অচ্ছ্যুৎ, অশুচি,—পরিবারে সে মানুষের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত।

অনূঢ়া জ্ঞানদার রূপ নেই, তাকে পাত্রস্থ করা যাচ্ছেনা, পরিবার, সমাজ এমনকি ঘরে সব থেকে যিনি বা যারা আপনজন তাদের কাছেও লাঞ্ছিত। কাকার ভাতের থালা হাতে করে নিয়ে এলে জ্যাঠিমা চীৎকার করে উঠে ভর্ৎসনা করে বললেন,—"মানা করে দিয়েছি না ভাত বেড়ে নিয়ে যেতে? তোর হাতে পুরুষ মানুষ খেতে পারে না? মেয়েকে পাত্রস্থ করতে না পেরে জ্বালা যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে মা বললেন,—"পোড়ারমুখী, গুরুজনের কথা শুনবিনে যদি তোর মরণ হয় না কেন?" নির্দোষী অসহায় জ্ঞানদার চোখ ফেটে জল বেরুলো—এর বেশিতো তার কিছু করার নেই, "মুখ তুলিয়া প্রতিবাদ করিতে সে বোধকরি জানিতই না।"

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-শিল্পে বালবিধবা একটা বিরাট সমস্যা। আর এই সমস্যার মূলে রয়েছে বাল্যবিবাহ। এক বৃদ্ধের সঙ্গে বালিকাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা হল, যার ফলশ্রুতি হচ্ছে সংস্কারের জালে বালিকাটি জীবনের অধিকাংশ সময়টাই বৈধব্য নামক অভিশাপের যন্ত্রণায় দগ্ধ, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত। তাই লক্ষ্মী একদিন হয়েছিল পিয়ারী বাঈজী। গ্রামবাসী মাত্রেই বিপদে নিরুদিদিকে কাছে পেয়েছে কিন্তু তার ভালবাসা নামক হৃদয়দৌর্বল্য কোন স্বীকৃতি তো দূরের কথা, সমাজের নিকট তিনি অচ্ছুৎ হলেন। বড়দিদির ভালবাসা সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের সামাজিক-স্বীকৃতি পাবার কোন প্রশ্নই ওঠেনা, যে সমাজে জমিদার ও ধনিক শ্রেণী সমাজের প্রতিভূ। পুরোহিতের নির্দেশনামা ও শাস্ত্রের বাগাড়ম্বরের ওপর গোটা সমাজ ব্যবস্থা চলছে, উচিত-অনুচিতের মানদণ্ড

নির্ধারক হলেন পুরুষজাতি, ধনিকশ্রেণী—স্বভাবতই সেই সমাজের বলি হলেন নারীসমাজ ও নিম্নশ্রেণীর মানুষ, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের এই হল রীতি। কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতা মনে করেন 'কন্যা' মানেই তার দায়। এই দায় থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পাত্রপক্ষের নিকট, পুরোহিতের নিকট, সমাজের নিকট মাথা হেঁট করেন, শাস্ত্রবিধির কাছে আত্মসমর্পণ করেন। উপযাচক হয়ে হিত করার নামে মিথ্যা জাল তৈরি করে সেই জালে মেয়েদের আবদ্ধ করে তাদের উদ্ভট তৃপ্তি লাভ বা পুণ্যি লাভের চিন্তাকে বিদ্রূপ করে শরৎচন্দ্র তাঁর 'স্বরাজ সাধনায় নারী'-তে বললেন, "আমি বাজে ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে কিছুতেই তাদের হিত করতে যাইনে। আমি বলিনে, বাছা, তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এ করতে নেই, বলতে নেই, ওখানে যেতে নেই—তুমি তোমার ভাল বোঝনা—এস আমি তোমার হিতের জন্যে তোমার মুখে পর্দা এবং পায়ে দড়ি বেঁধে রাখি।"

সামন্ততান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারীতো পুরুষের হাতের যন্ত্র। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত নয়, সংস্কারের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, তারতো পুরুষের মনোরঞ্জন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। পিতার বিত্ত, কৌলীন্য, রূপ ও সতীত্ব—এরই নিরিখে নারীর মূল্যায়ণ হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। শরৎচন্দ্র তাঁর 'নারীর মূল্য'-তে লিখলেন, "নারীত্বের মূল্য কি? অর্থাৎ কি পরিমাণে তিনি সেবাপরায়ণা, স্নেহশীলা, সতী এবং দুঃখ-কষ্টে মৌনা। অর্থাৎ তাহাকে লইয়া কি পরিমাণে মানুষের সুখ ও সুবিধা ঘটিবে। এবং কি পরিমাণে তিনি রূপসী! অর্থাৎ পুরুষের লালসা ও প্রবৃত্তিকে কতটা পরিমাণে তিনি নিবদ্ধ ও তৃপ্ত রাখিতে পারিবেন। দাম কষিবার এছাড়া যে আর কোন পথ নাই, সে কথা আমি পৃথিবীর ইতিহাস খুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি।"

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসগুলোর চরিত্রচিত্রণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীকে কেন্দ্র করে। তিনি উভয় শ্রেণীর মানুষের কাছের জন, আপনজন। তাই তাদেরই সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ক্ষয়িষ্ণু সমাজে নিষ্পেষিত মেয়েদের প্রতি গভীর সহানুভূতি তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলোকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। শুধু গল্প-উপন্যাস নয়, তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যেও শৃঙ্খলিত নারীজাতি একটা বিরাট স্থান অধিকার করে আছে এবং সমগ্র জীবন ধরে তাঁকে ভাবিয়েছে।

কবি নজরুল অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন, উদাসীর উন্মন মন, বিধবার ব্যথা, হতাশীর হাহুতাশ এবং ব্যথিত নারীর অন্তরের ব্যথা, প্রিয় লাঞ্ছিত নারীর হৃদয়

যন্ত্রণাকে অনুভব করলেন 'বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস, দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করলেন : -

"সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাক, নারীরা আছিল দাসী।"

শৃঙ্খলিত নারীসমাজকে সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে এগিয়ে আসতে হবে। তাই তিনি আহ্বান জানালেন,--

"যে ঘোমটা তোমায় করিয়াছে ভীরু, ওড়াও সে আবরণ।
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন, যেথা যত আভরণ।"

পরবর্তীকাল থেকে বর্তমান অবধি আরও বহু লেখকের কলমেই বাঙালীর ঘরের মেয়েদের মর্মান্তিক চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রায় হাজার বছরের সাহিত্যের মধ্যেই নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানের চিত্র পাওয়া যায়। সমাজের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্নভাবে তার পরিবর্তন ঘটেছে,—বঞ্চনার ও অমর্যাদার কৌশলও কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে বা হচ্ছে তাও উপলব্ধি করা যায়। বঞ্চনা-লাঞ্ছনার মূল কারণ তো গ্রথিত রয়েছে অর্থনীতির গহ্বরে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যার নেই সে তো পরমুখাপেক্ষী,—পুরুষের আয়ের ওপরই তো স্ত্রী জাতি নির্ভরশীল। আয়ের অধিকারী যেহেতু পুরুষ, স্বাভাবিকভাবেই তার বুদ্ধিই পরিবারে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত। স্বভাবতই বিদ্যা অর্জনের অধিকারীও পুরুষই, যুগ যুগ ধরে এটা এমনই স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। মেয়েরাও এই ভেবেই অভ্যস্ত হল যে, পুরুষের বিদ্যা-বুদ্ধিই বেশি। ক্রমে নারী তার অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন হতে থাকল, নিজেকে নিয়োজিত করল পুরুষের তথা পরিবারের সদস্যদের মনোরঞ্জনের জন্য। যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা আর চোখের জলকেই জীবনের সম্বল ধরে 'নয়ে কালাতিপাত করা আর কি! নারীজাতিকে 'সর্বংসহা' বলে ধরে নেওয়া হল। নারীজাতির এই কষ্টকর ও বিড়ম্বিত জীবন সচেতন লেখক-শিল্পীদের মনকে নাড়া দিয়েছে। তাই এরূপ অনাচারের প্রতি তাদের কেউবা শুধু বাস্তব ছবি আঁকলেন। কেউবা নারীকে 'দেবী সতী', 'লক্ষ্মী' রূপে কল্পনা করে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন ও সান্ত্বনা পেতে চাইলেন, কেউ বা উত্তরণের পথ খুঁজলেন। আর কেউবা মুক্তিপথের সন্ধান দিলেন। এভাবেই বাস্তব চিত্র সাহিত্যিকের কলমে লিপিবদ্ধ রয়েছে যার ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট।

নারীর সামাজিক অবস্থান ঃ শোষণ-নিপীড়নের নানা কৌশল

জীবনযাত্রার প্রয়োজনেই সমাজ-ব্যবস্থারও পালা বদল ঘটে, আর এই পালা বদলের মধ্যে দিয়েই ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত, বিধি-নিষেধ সব কিছুরই মানদণ্ড নির্ধারিত হয় এবং যার মূল সূত্র গ্রথিত থাকে অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে। শ্রম ও অর্থনৈতিক দিকটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অবশ্যই যদি সেই শ্রমের বিনিময়ে আর্থিক প্রয়োজন বা চাহিদা মেটে। দাসপ্রথা, সামন্তপ্রথা বা ধনতান্ত্রিক সমাজে যে-কোন প্রকারের শ্রমের মূল্য নেই। উক্ত সমাজ-ব্যবস্থায় মেয়েরা যে সারা জীবন ধরে সংসারের ঘানি টেনে চলে তাদের শ্রমের কোন মূল্য বা মর্যাদা দেওয়া হয়নি। সমাজে নারীজাতি তো দাসীসম, 'পুরুষ দাস ছিল নাকো/নারীরা আছিল দাসী' এই সমাজ-কাঠামোর গর্ভেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের জন্ম।

উল্লেখযোগ্য যে, আদিম যুগে পুরুষ ও নারীর মধ্যে মর্যাদা বা অধিকারের দিক থেকে কোন বৈষম্য ছিল না, সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সমান অংশ গ্রহণ করেছে। একদা সমাজে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রচলন ছিল অর্থাৎ সন্তানের ক্ষেত্রে মায়ের পরিচয়েই তখন পরিচিত হতে হত পশু-পালনের যুগেই পুরুষের প্রাধান্যের সূত্রপাত। নারীজাতির পরাজয়ের শুরু। ক্রমশঃ পুরুষ জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। নারী হতে থাকে পুরুষের ক্রীতদাসী আর শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র, পুরুষের ভোগ্যবস্তু। এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'জননী-বিধি'র উচ্ছেদ সাধনের মধ্যে দিয়েই নারী জাতির ঐতিহাসিক পরাজয় ঘটে। এঙ্গেলসের Origin of Family, Ch. II-তে আছে "The overthrow mother right was the world historical defeat of the female sex. The man took command in the home also; the woman was degraded and reduced to servitude, she became the slave of his lust and a mere instrument for the production of children."

ক্রমশ সমাজেরও পট পরিবর্তন ঘটতে থাকল। আদিম সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার পরের ধাপ হলো দাস সমাজ-ব্যবস্থা, তারপর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ও ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। তারই ভেতর থেকে স্বাভাবিক কতকগুলো

কারণেই জন্ম নিল শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থা। দাস সমাজ-ব্যবস্থায় মেয়েদের যে ক্রীতদাসী জীবনের শুরু হয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক সমাজেও তার থেকে উন্নত মানের বলে মেয়েরা বিবেচিত হয়নি শুধু তার রকমফের হয়েছে মাত্র। ধর্মীয় কুসংস্কারও তার সঙ্গে অচল অনড় জগদ্দল পাথরের মতো জড়িয়ে আছে। উক্ত সমাজ-ব্যবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে মেয়েদের বিড়ম্বিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত জীবন এবং তাদের সামাজিক অবস্থান ও অস্তিত্বের মূল্য কিরকম কতটুকু নিরূপিত হয়ে আসছে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা থেকে তারই কতকগুলো চিত্র তুলে ধরা হল :

১) সিন্ধু সভ্যতার সীল মোহরে দেখা যায় একটি সীলের বাঁদিকে দণ্ডায়মান পুরুষের এক হাতে একটি অস্ত্র, অন্য হাত কোমরে। সামনে আলুলায়িত কেশে উপবিষ্ট এক নারী। এই সীল মোহর প্রসঙ্গে একজন গবেষক মহেঞ্জোদারোর লিপির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, এটি হচ্ছে 'সপ্ত ভূ হরি' অর্থাৎ পৃথিবী নারী।

২) গ্রীক পুরাণে আছে একিলিসের বাগদত্তা পলিক সেনাকে প্রেতাত্মার দাবি অনুযায়ী একিলিসের সমাধির ওপর বলি দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যেই এই নারী বলি।

৩) লোক্রিস থেকে একদল কুমারী মেয়েকে এথেনার মন্দিরে পৌরহিত্য করার জন্য সেবাদাসী হিসাবে পাঠানো হয়েছিল, পরে তাদের পুড়িয়ে সেই ছাই পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রের জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। গবেষক ডঃ ফানেল মনে করেন, এটি এক ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

৪) এথেন্সের জনগণ দুর্ভিক্ষের সময়ে দৈববাণীর আদেশ অনুযায়ী গেরিস্টান সাইক্লপস-এর সমাধির ওপর হেলিস্থাসের কন্যাদের বলি দিত।

৫) মহামূল্য রত্নলাভের আশায় উপস্থিত ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে সকলেই একে একে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণে সচেষ্ট হতে লাগলেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যও অনুরূপভাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি জানিয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। ঋষিকন্যা গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন-বাণে জর্জরিত করে তুললেন। গার্গী প্রশ্ন করলেন,—'কোন্ সত্তা দ্বারা আকাশ জড়িয়ে আছে?' যাজ্ঞবল্ক্য ক্রোধান্ধ

হয়ে উত্তর দিলেন,-'অনাদি অনন্ত অক্ষয় পুরুষের সঙ্গে আকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।' এবং হুঙ্কার ছেড়ে বললেন 'বন্ধ কর তোমার প্রশ্নের তূণ; অন্যথায় মুণ্ডপাত ঘটবে।' গার্গী পরাজিত হলেন, পরাজিত হল সমগ্র ভারতীয় নারী সমাজ। ঋষির আচরণেও প্রমাণিত হল, নারী তার স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের চেষ্টা করলে ঋষির অভিশাপে মুণ্ডপাত ঘটবে।

৬) শ্রী দিবাকরণ তাঁর From birth to death, the stigma of caste বইতে লিখেছেন:

Like men, the women folk belonging to the scheduled castes and scheduled tribes are subjected to the worst exploitation. The moneylender who lends money to a poor harijan at an exhorbitant rate of interest forces him later to sell his wife or a minor daughter to a brothel-owner to repay the time-barred debt. Thus minor girls are compelled to take to prostitution to free their aged parents from years of bonded slavery."

৭) বিশ্বামিত্র-শিষ্য গালব গুরু-দক্ষিণা হিসেবে আটশত চন্দ্র-শুভ্র ঘোড়ার দাবি মেটাতে অপারগ হওয়ায় তরুণী কন্যা মাধবীকে আটশত ঘোড়া পাবার উপায় হিসেবে ব্যবহার করলেন, অর্থাৎ পিতার দাতা নামকে অকলঙ্ক রাখার জন্য পিতার ইচ্ছায় বহু রাজা-ঋষির সঙ্গদান করে, এবং গালব ছয়শত ঘোড়া পেয়ে গুরু-দক্ষিণা দেয়। তারপর কিন্তু গুরু-দক্ষিণার আর দু'শত ঘোড়া বাকি। তখন পিতা গালব গুরুকে অনুরোধ করেন যে, বাকি দুশো ঘোড়া দিতে তিনি অপারগ। এবার যেন মাধবীর গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করে গালবকে মুক্তি দেন। বিশ্বামিত্র রাজি হলেন, পুত্র সন্তান প্রসব করল মাধবী। তারপর মাধবীকে গালবের হাতে বিশ্বামিত্র তুলে দিলেন। তারপর পুরুষ জাতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মাধবী সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করল।

৮) রেড ইণ্ডিয়ান সভ্যতায় একটি বলির বস্তু কুমারী মেয়ে।

৯) লাগোস অঞ্চলে অধিক পরিমাণ ফসলের আশায় মার্চ মাসে একটি কুমারী কন্যাকে ভেড়া, ছাগল, ভুট্টা, কলা ও মেটে আলুর সঙ্গে গেঁথে শূলবিদ্ধ করে দেওয়া হত।

১০) শ্বেত নীল নদের তীরে শিল্লুকদের রাজা যদি কখনো রাণীদের দৈহিক কামনা তৃপ্ত করতে অসমর্থ হতেন তখন একটি নতুন কুঁড়েঘর তৈরি করে রাজাকে সাদা কাপড়ে আপাদমস্তক ঢেকে একটি কিশোরীর কোলে শুইয়ে জানলা-দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত। নিষ্পাপ কিশোরীকে অনাহারে জল-বাতাস শূন্য অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করতে হত।

১১) পাঞ্জাবের কাংড়া পার্বত্য এলাকায় পুরুষের কোর্টে দলিল রেজেস্ট্রী করে নিজের স্ত্রীকে অপরের হাতে বিক্রি করত।

১২) কেলটিক পুরোহিত ড্রুইডরা দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কুমারী বলি দিতেন।

১৩) প্রতি বছর যথাসময়ে নীল নদের জল যাতে বাড়তে পারে সেজন্য একটি কুমারী কন্যাকে নীল নদের জলে ডুবিয়ে দেওয়া হত।

১৪) বর্ষণ-এর দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য একটি মেয়েকে গাছের মগডালে বেঁধে চাবকে মেরে ফেলা হত এবং তারপরে শকুনের উদ্দেশে ফেলে রেখে যাওয়া হত।

১৫। মহামারী বা প্লেগের প্রাদুর্ভাব হলে 'চিপোয়া'রা মনে করে এটা তাদের পাপের ফল। মড়ক বা প্লেগের কবল থেকে মুক্তির জন্য তারা একটি সুন্দরী মেয়েকে জলে ডুবিয়ে মারত।

১৬) উনবিংশ শতাব্দীতে 'কিলোউয়া'র দেবী পেলীর কাছে একটি কুমারী কন্যাকে উৎসর্গ করা হত। উৎসর্গের পদ্ধতি হল আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে মেয়েটিকে ভেতরের ফুটন্ত লাভা সরোবরের মধ্যে ফেলে দেওয়া হত।

১৭) জাপানী গল্পে পাওয়া যায় প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি কুমারী কন্যাকে সাপ ও বানর দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হত।

১৮) ফ্রেজার-এর 'স্কেপবোট' গ্রন্থে আছে, দেশে অসমতা দূরীকরণের জন্যে নিগ্রোদের দেশের একটি মেয়েকে মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে

খাওয়া হত এবং পরে তাকে জলে ডুবিয়ে মারা হত। উদ্দেশ্য হল দেশের পাপকে ঝেড়ে পরিষ্কার করে দেওয়া।

১৯) ফ্রেজার-এর 'গোল্ডেন বাও' গ্রন্থে আছে শরৎকালে একটি কুমারী মেয়েকে ভুট্টার ছড়া, কুমড়ো, লঙ্কা ইত্যাদি বিভিন্ন দানাশস্য দিয়ে সাজানো মন্দিরে অধিষ্ঠান করানো হত, মন্দিরের ভেতর-বাইর নানারঙের ফুল ও উপহারে সাজানো—কুমারী মেয়েটি অর্থাৎ ভুট্টাদেবীর সামনে নৈবেদ্য, নানা উপচার রাখা আছে, পুরোহিত পূজো করলো উপবাসী অধিষ্ঠিতা মেয়েটিকে। সাত দিনের উপবাসী ভক্তেরা দেবীকে নিজেদের ফুটো-করা কানের রক্ত উপহার দেয় কুমারী দেবীর সামনে পুরোহিত ধূপারতি করল,—তারপর একসময়ে পুরোহিত ধাক্কা দিয়ে চিৎ করে শুইয়ে কুমারী দেবীর গলা কেটে দেয়। সেই রক্ত ছড়িয়ে দেওয়া হত শস্য ও ফসলের ওপর। পুরুত মেয়েটির চামড়া ছাড়িয়ে সেই চামড়া গায়ে জড়িয়ে নৃত্য করত।

২০) পাওনিদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে বসন্তোৎসবের সময়ে ১৪/১৫ বছরের একটি মেয়েকে বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়ে আনা হত, প্রতিটি বাড়ি থেকে তার হাতে একটা লাঠি আর একটু লেই তুলে দেওয়া হত আদর-যত্ন সহকারে। পরে মেয়েটিকে কালো আর সাদা রঙে সাজিয়ে একটা ফ্রেমে আটকে নিয়ে অল্প আগুনের আঁচে ঝলসে নেওয়া হত এবং তীরবিদ্ধ করা হত। প্রধান পুরোহিত ঝলসানো ও তীরবিদ্ধ মেয়েটির হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল, অন্যরাও নরম মাংসের টুকরো ভাগ করে খেয়ে নিত। এক ফোঁটা রক্ত নিঙড়ে বের করে শস্য-ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিত।

২১) জানা যায় যে, কুমারী মেয়ের হাড়-মাংস পিষে লেই করে ভুট্টা ও আলু বীজের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হত—ফলন ভাল হবে এই আশায়।

২২) ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে নিজের স্ত্রীকে তার কাছে গচ্ছিত রাখত এবং মহাজন খুশি মত অন্য পুরুষদের হাতেও তাকে দিয়ে দিত ভোগ করার জন্য। সুদসহ টাকা ফেরৎ পেলে তখন স্ত্রীকে স্বামীর কাছে ফেরৎ দিত।

২৩) মহাভারতের যুগে দ্রৌপদী ছিলেন পঞ্চপাণ্ডবের অধিকারে। কুন্তীর ঔরসে বিভিন্ন দেবতার পুত্র লাভের কাহিনীও উল্লেখযোগ্য।

২৪) চর্যাপদের বিভিন্ন পদে আছে যে, তন্ত্রসাধনায় নারীই প্রজ্ঞা এবং নর উপায়ের প্রতিরূপ, তাই কুলচূড়ামণিতন্ত্রের মতে নিজ কন্যা, জ্যেষ্ঠা বা অনুজা ভাগিনী, মাতুলানী, মাতা বা বিমাতা যে কেউই সাধন-সঙ্গিনী হতে পারে।

মাতরং ভগিনীঞ্চৈব দুহিতাং বান্ধবীস্তথা।
ব্রাহ্মনীং ক্ষত্রিয়ানীঞ্চৈব বৈশ্যাং শূদ্রিনীস্তথা॥
নটীং রজকীং ডোম্বীং চ চণ্ডালিনীং তথা।
প্রজ্ঞোপায় বিধানেন পুজয়েৎ তত্ত্ব বৎসলঃ।

২৫ (ক) প্রাচীন রুশ দেশে বালিকা কন্যা স্নেহ-মমতাহীন শ্বশুর বাড়ির নামে ভীত হয়ে বলছে,—

দিস্‌নে পিতা অন্নদাতা
দিস্‌নে তোর দখ্‌নে হাত
আমার দুষ্ট শত্রুটারে, ও নাকি শ্বশুর মোর
তোকে ধাপ্পা দিচ্ছে ঘোর।

বিয়ের পর পরই প্রেম-ভালবাসা বঞ্চিত বালিকা বধূর খেদোক্তি :

"আমার মালা ঢেউয়ে দোলে
জেনো বর্বর আমার শপথ ছলে
জেনো ও ভুলে গেছে
জেনো ওর প্রেম ফুরিয়ে গেছে।"

(খ) শেক্সপীয়ারের ওথেলো-র এমিলিয়ার সমাজের কাছে প্রশ্ন :

"Let husbands know
Their wives have sense like them they
See and smell
And have their palates both for sweet & sour
As husbands have, what is it that they do
When they change us for others ? Is it sport ?
I think it is,………"

২৬) কালিদাস যেহেতু শ্রেণীভিত্তিক সমাজের বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণ সেই হেতু তাঁর কাব্যচর্চা, নাটক বা সংস্কৃতি চর্চার মধ্যেও স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিফলন রয়েছে পুরোপুরি। তাই তাঁর রচিত কাব্য-নাটকের প্রেমরসে ও শৃঙ্গাররসেও পুরুষেরই প্রাধান্য অধিকতর প্রতিষ্ঠিত। ভবভূতি বা ভাসের ক্ষেত্রেও একই কথাই প্রযোজ্য। কালিদাসের 'রঘুবংশে' অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ সীতার বিলাপ অংশে সীতা বলছেন,—"কী আর বলব! আমার গর্ভে তোমারই সন্তান, তাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য—এই বাধাটুকু না থাকলে তোমার সঙ্গে চির-বিচ্ছেদের পরে এই নিষ্ফল দুর্ভাগ্য জীবনে আর মায়া করতাম না।

তাই আমি সন্তান প্রসবের পরে উর্ধে সূর্যের প্রতি দৃষ্টি-নিবদ্ধ রেখে তপস্যা করব—যাতে জন্মান্তরে আমি তোমাকেই আবার স্বামীরূপে পাই কিন্তু কোনো বিচ্ছেদ যেন না ঘটে।"

২৭) ভর্তৃহরি: ধনের লোভে নারীরা হাসে, কাঁদে, পুরুষের বিশ্বাস জন্মায়, কিন্তু নিজেরা পুরুষকে বিশ্বাস করে না, তাই কুলশীলবান পুরুষের পক্ষে নারীমাত্রই শ্মশানপুষ্পের ন্যায় বর্জনীয়।" —দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা—কালিদাস

২৮) "He that hath wife and children hath given hostages to future; for they are impediments to great enterprises, either of virtue or of mischief."

—(1561-1626) Francis Bacon

২৯) The bourgeois sees in his wife a mere instrument of production." —Communist Manifesto.

৩০) "The proletariat cannot achieve complete freedom, unless it achieves complete freedom for women."

—Lenin, Feb. 21, 1921

৩১) "......for under capitalism, the female half of the human race suffer under a double yoke. The working women and peasant women are oppressed by capital, but in addition to that, even in the most democratic Bourgeois Republics they are firstly in an inferior position, because the law denies them equality with men, and secondly, and this is most important, they are, 'in domestic slavery, they are 'domestic slave."

—Lenin, International Womens, Day, 1918.

৩২) ১৮৩৩, জুনের শেষ সপ্তাহে লণ্ডনের দৈনিক পত্রিকায় "অতিরিক্ত খাটুনির ফলে মৃত্যু" শীর্ষক একটি উত্তেজনাপূর্ণ খবর বের হয়। খবরটি হল—মহিলাদের পোষাক তৈরির দোকানে কর্মরত একটি বিশ বৎসরের তরুণী, মেরী আনে ওয়াকলির মৃত্যু ঘটেছে। মেয়েটি কাজ করত একটি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পোষাক তৈরির দোকানে, দোকানের মালিক এক অভিজাত মহিলা এলিস।

৩৩) এখনো প্রায়ই দেখা যায় যে, ইংলণ্ডে খালে নৌকো টেনে নিয়ে যাবার জন্যে ঘোড়ার বদলে নারীদের নিয়োগ করা হয়। কারণ ঘোড়া পুষতে বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে একটা ন্যূনতম খরচ লাগবেই, আর অতিরিক্ত জনসংখ্যার মধ্যে থেকে নারীদের একাজে নিয়োগ করলে যে কত যৎ সামান্য খরচে চলে যায় তা ধারণাই করা যায় না।

—কার্লমার্কস, ক্যাপিটাল : ১ম খণ্ড

৩৪) যতই মানুষের হাতের জোরের বদলে বাষ্পশক্তি ও জলশক্তির ব্যবহার করা যাবে, ততই পুরুষদের বদলে আরো কম পয়সায় নারী ও শিশুদের এসব কাজে নিয়োগ করলে খরচও কম পড়বে আর কাজও ভাল হবে। সুতরাং এই সব শাখায় পুরুষদের স্থলে নারী ও শিশুদের নিয়োগ করা হয়।

সুতাকলগুলিতে তাই কেবল মাত্র নারী ও বালিকা শ্রমিকদের দেখা যায়।

৩৫) "এইচ ডব্লু তিনটি সন্তানের জননী। সে প্রতি সোমবারে ভোর পাঁচটায় কাজে বেরিয়ে যায়, আর শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে। তখন তার ছেলেমেয়েদের জন্য এত খাটতে হয় যে রাত তিনটের আগে সে শুতে পারে না। খাটতে খাটতে একেবারে গলদঘর্ম হয়ে যায়।"

—এঙ্গেলস : কনডিশন অব দি ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংলড : ১৮৪৪
(অনুঃ কনক মুখোপাধ্যায়)

৩৬) ক্যাথলিক চার্চের বিবাহ-বিচ্ছেদের নিয়ম খুব কড়াকড়ি। শুধু পোপের হাতেই তার ক্ষমতা আছে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর হাতে বিক্রিত

হয়ে যায়। তখন তার স্বামীর প্রতি ঘৃণা-অভক্তির শত কারণ থাকলেও তাকে তার স্বামীর আলিঙ্গন সহ্য করতেই হবে।

৩৭। স্ত্রী হল অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন, আর স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে তার কোনো মর্যাদাও থাকে না। তা সত্ত্বেও যে বহু সংখ্যক নারী বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করে থাকে তার থেকেই বোঝা যায় যে নারীদের বিবাহিত জীবন কতদূর দুর্বিসহ হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফরাসীতে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদনকারীদের মধ্যে শতকরা ৮৮ জনই ছিল নারী। প্রতি বৎসরই যে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তার থেকেই অবস্থার গুরুত্ব বোঝা যাবে। ১৮৭৮ সালে অস্ট্রিয়ার জজ ফ্রাঙ্কফার্টর জাইটুং পত্রিকার একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন: "ব্যভিচারের কাজটা হল জানালার কাচ ভাঙার মতই একটা সাধারণ জিনিস, একথা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়।"

—নারী: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে—আগস্ট বেবেল

(অনু: কনক মুখোপাধ্যায়)

৩৮) ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বরের শেষের দিকে কলমার-এ সুতাকল ও তার আনুষঙ্গিক কারখানায় ৮১০৯ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল। তার মধ্যে নারী ৩৫০৯ জন, পুরুষ ৩৪১৬ জন ও শিশু ১১৮৪ জন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সুতাকলে ৪,৭৯,৫১৫ জন শ্রমিকের মধ্যে ২৫,৮,৬৬৭ জন বা শতকরা ৫৪ ভাগ ছিল নারী। ৩৮,৫৫৮ জন বা শতকরা ৮ জন এবং ১৮,৬৬,৯০০ বা শতকরা ১৪ জন ছিল ১৩ বছরের কম বয়সের ছেলে-মেয়ে, আর কেবলমাত্র ১১,৫৯৪ জন বা শতকরা ২৪ জন পুরুষ শ্রমিক।

(নারী অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে—আগস্ট বেবেল

(অনু: কনক মুখোপাধ্যায়)

আজকের দিনেও শোষণের চিত্র বহু আছে শুধু কৌশল পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন,

৩৯) ১৯৮০ সালের ১৬ মার্চ মুরিয়া উপজাতিদের মধ্যে একজন ব্যক্তি তার সন্তান-সম্ভবা স্ত্রীকে প্রসবের আগেই পুড়িয়ে মেরেছিল। পুড়িয়ে মারার কারণ হল, নার্সরা বলেছিল স্ত্রীর পেটে যমজ সন্তান এবং তাদের একটি মৃত। মুরিয়ারা

জানতে পেরে বললো, পেটের মৃত বাচ্চাটি তো মরে ভূত হয়ে গেছে এবং সে তার বাবাকে মেরে ফেলবে, কাজেই প্রসবের আগেই বৌকে পুড়িয়ে মারলে ভূতও মরে যাবে। সেই মত পূর্বোক্ত মুরিয়া স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ অর্ধে দাঁড়িয়েও শোষণের অবসান হয়নি। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোতে শোষণ নিপীড়ন পুরোদমে চলছে শুধু তার রকমফের হয়েছে মাত্র। যেমন, পণপ্রথা, যৌতুক প্রথা, অল্প মজুরিতে নারী শ্রমিক, সন্ত মুসলিম নারী বিল ইত্যাদি।

তথ্য সংগ্রহের জন্য যে সকল পুস্তকের সাহায্য নিতে হয়েছে :

১) কুমারী বলি—ডঃ দীনেন্দ্রকুমার সরকার

২) ভারতীয় নারী : পুরাণে ও সমাজে (অরিত্র মাসিক পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ : অষ্টম, নবম ও দশম সংখ্যা)—ডঃ দীনেন্দ্রকুমার সরকার

৩) কালিদাস সমগ্র—সম্পাদনা : জ্যোতিভূষণ চাকী

৪) Origin of Family—এঙ্গেলস

৫) চর্যাপদ—

৬) Othelo—Shakespere

৭) Francis Bacon

৮) Communist Manifesto

৯) International Womens' Day, 1918—Lenin

১০) ক্যাপিটাল (১ম খণ্ড)—কার্লমার্কস

১১) এঙ্গেল : কনডিশন অব দি ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্ড, ১৮৪৪ (অনুবাদ : কনক মুখোপাধ্যায়)

১২) নারী : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে—আগস্ট বেবেল (অনু: কনক মুখোপাধ্যায়)

১৩) প্রাচীন রুশের সাহিত্য ও সমাজ চিন্তা—অসিত চক্রবর্তী

১৪) মার্কসবাদের আলোকে—কনক মুখোপাধ্যায়।